নারায়ণ সান্যাল

কিশোর অমনিবাস



কিশোর অম্‌নিবাস

৩৮০

নারায়ণ সান্যাল

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৮৭
আগস্ট ১৯৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৩৮৯
আগস্ট ১৯৮২
তৃতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৯২
এপ্রিল ১৯৮৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

লেখক কর্তৃক অলংকৃত

মুদ্রক
কৃষ্ণ বোস
অঙ্কুর
৪৪ বি সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

Acc. No.- 14629

কুড়ি টাকা

কৈফিয়ত

তিল কুড়িয়ে তিলের পাহাড় হতে পারে, তাল হয় না—এ কথাটা সমীরকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। সমীর—মানে শ্রীসমীরকুমার নাথ, এ বইয়ের প্রকাশক ; সে এসেছিল আমার লেখা একটি কিশোর রচনার সঙ্কলন-প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে। তাছাড়া বললাম—আমার ক্ষেত্রে তিলের পাহাড়ও হবে না, এক মুঠো তিল হয়-কি-না-হয় ; কারণ কিশোর বয়সীদের জন্য আমি অতি সামান্যই রচনা করেছি। কিন্তু সমীর নাছোড়বান্দা শুধু নয়, করিৎকর্মা—শুধু প্রস্তাবটাই আনে নি, সঙ্গে করে এনেছে কাঁহা কাঁহা প্রকাশিত আমার রচনার ছাপা ফাইল কপি ! তখন হিসাব কষে দেখি, এ পঁচিশ বছর ধরে ছোটদের জন্য বড় কমও লিখিনি ! বরং সমস্যা হল—কোন লেখাটা বাদ দিই, কোনটাকে রাখি।

'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে ছড়া রচনার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন, সহজের প্রধান লক্ষণই এই।" কথাটা মোটামুটিভাবে কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ও একটা আলাদা জাতের সাহিত্য, তার জন্য আলাদাভাবে হাত পাকাতে হয়। ঘটনাচক্রে সেটা আমার ঘটে ওঠেনি। মাঝে মাঝে ছোটদের জন্য লিখবার চেষ্টা করেছি—মূল প্রেরণা আমার পুত্রকন্যারা ! তারা যখন নূতন যুক্তাক্ষর শেখার উত্তেজনায় আমার লেখা 'অশ্লীলতার দায়ে' অথবা 'লাল ত্রিকোণ' উপন্যাস পড়বার চেষ্টা করত, আর তাদের মা বইগুলি সরিয়ে নিত, তখন তারাই এসে অনুযোগ করত—ওদের জন্য কিছু লিখি না কেন ? সেই খেয়ালেই 'শার্লক হেবো' রচনা করি।

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যখন সেই সৌখীন মজদুরী-প্রসূত রচনার প্রসঙ্গ উঠে পড়ল তখন একটু বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম। 'শার্লক হেবো' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে যে ভূমিকাটা লিখেছিলাম, সেটা পড়লেই বুঝতে পারবেন কী বলতে চাইছি :

"শার্লক হেবো'-কাহিনীর ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু উৎসর্গ-পত্রের একটা কৈফিয়ত অপরিহার্য। অত বড় একজন সাহিত্যিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এমন নগণ্য একখানা বই কেন আমি উৎসর্গ করলাম :

বছর চার-পাঁচ আগেকার কথা। মনোজদার বাড়িতে ওঁকে প্রথম দেখি। ফটো দেখা ছিল, তাই দেখেই ওঁকে চিনেছি। মনোজদা তাঁকে বললেন—একে চেন ? বলে আমার নামটা ওঁকে জানালেন।

সুদর্শন ভদ্রলোক তাঁর স্বভাবজাত মিষ্টি হাসি হেসে বলেছিলেন, চাক্ষুষ দেখা ছিল না, লেখায় চিনি। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য আমাকে পড়াতে হয়। ভাল মন্দ সবরকম লেখাই তাই নেড়ে-চেড়ে দেখি।

ভাল মন্দ! আমি তখন কাঠগড়ার আসামীর মত বিচারকের দিকে তাকিয়ে সন্দেহের দোলায় দুলছি। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলেন—ছোট গল্প লেখা হয় না কেন?

লক্ষ্য করলাম, অগ্রজ সাহিত্যিক প্রথম পরিচয়ের বাধা অতিক্রম করে তখনও 'তুমি'-র নৈকট্যে আসতে পারেননি। বললাম—আসে না।

বলেন, ভাল! যা স্বেচ্ছায় আসে না তাকে ধরে বেঁধে আনতে নেই। আপনার কোন্ লেখাটি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে জানেন?

এবার আর 'আপনি-তুমি' এড়াতে পারেননি। আমি কিন্তু এতই উত্তেজিত যে, অগ্রজ সাহিত্যিককে সৌজন্য জানিয়ে বলতে পারিনি—আমাকে আবার আপনি কেন?

উনি এক নিশ্বাসে বলে বসলেন—আপনার 'শার্লক হেবো'। শুকতারায় পড়েছিলাম।

আমি স্তম্ভিত! উনি কি ব্যঙ্গ করলেন? দেশবরেণ্য বাঙলা-সাহিত্যের অধ্যাপকের আড়ালে কি কৌতুকপ্রিয় 'সুনন্দ' উঁকি দিল হঠাৎ? থান-ইঁটের মাপে লেখা অনেকগুলি স্বরচিত গ্রন্থের কথা মনে আসায় আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বুঝিবা:

বাড়ি ফিরে পুরাতন ফাইল-কপি ঘেঁটে দেখি 'শুকতারা'য় আমার লেখা 'শার্লক হেবো' নামে খানকতক ছোট গল্প সত্যিই বেরিয়েছিল। বছর পনের আগে, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা।···

ইচ্ছা ছিল ছাপা বইটা তাঁর হাতে দিয়ে আর একবার প্রশ্ন করব, সেদিন কথাটা কে বলেছিলেন—অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, না কৌতুকপ্রিয় সুনন্দ! সে আশা আমার পূর্ণ হল না—১৪.৩.১৯৭২।"

'ভূতায়ন' রচনাটির প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার নিজের কিশোর বয়সের একটি ঘটনা:

তখন আমার বয়স বছর চোদ্দ। ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস টেন-এ ওঠার বার্ষিক পরীক্ষায় বাঙলা প্রশ্নপত্রে একটি প্রশ্ন ছিল, "প্রভাতবাবুর 'মাস্টার মশাই' গল্পটি তোমার কেন ভালো লাগে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।"

উত্তরে আমি লিখেছিলাম, "প্রশ্নকর্তা আমাকে নিরতিশয় বিড়ম্বনায় ফেলিয়াছেন! প্রভাতবাবুর 'মাস্টার মশাই' গল্পটি আমার আদৌ ভালো লাগে নাই! সুতরাং 'কেন ভালো লাগে' কী লিখিব? বরং লিখি, 'কেন গল্পটি আমার ভালো লাগে নাই'।"

ছেলেবেলা থেকেই আমি কিছু Precocious। তাই উত্তরপত্রে প্রভাতবাবুর কঠোর সমালোচনা করেছিলাম। প্রতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য : প্রভাতবাবু সত্যের পরাজয় আর অসত্যের জয় দেখিয়েছেন! সরল শিক্ষকটি 'I don't know'-র নির্ভুল অনুবাদ করা সত্ত্বেও বিড়ম্বিত হলেন ; আর প্রবঞ্চক নায়ককে গ্রামবাসী মাথায় তুলে নাচতে লাগল! বেশ মনে আছে, প্রশ্নোত্তরের শেষাংশে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও এক হাত নিয়েছিলাম! বলেছিলাম, তাঁদের উচিত ছিল প্রভাতবাবুর 'আদরিণী' অথবা 'মাতৃহীন' গল্পটি ঐ 'মাস্টার মশায়ের' পরিবর্তে ম্যাট্রিক সিলেক্শানে সঙ্কলিত করা।

ঐ প্রশ্নে নম্বর কি পেয়েছিলাম আজ আর তা মনে নেই ; তবে বাঙলা মাস্টার মশাইয়ের কাছে ধমক খেতে হয়েছিল। আর তিনি আমাকে মোলায়েম করে 'Precocious" বলেননি, তাঁর বাঙলা তর্জমা করেই বলেছিলেন : এঁচড়ে পাকা!

বাঙলা মাস্টার মশাই ৺ক্ষিতীনবাবু আজ নেই ; কিন্তু তাঁর সেই ধমকের প্রতিবাদেই বোধকরি চল্লিশ বছর পরে আমার কলম থেকে বার হয়েছে ঐ 'ভূতায়ন' অথবা জোঁস ওয়েন্সের কাহিনী!

ঈশপের অনুকরণে কিশোর রচনায় একটি করে প্রচ্ছন্ন 'মর‍্যাল' রাখার বাতিক আমাকে পেয়ে বসেছিল ; আর হয়তো সে জন্যই ও পথে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি।

রথযাত্রা, ১৯৮০

নারায়ণ সান্যাল

সূচীপত্র



গুরুবিদায় পর্ব

শার্লক হেবোর পরিচয় দিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হল বলে আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করছে। কিন্তু উপায় কী ? এখনও যে হেবো যথেষ্ট বড় হয়নি। তাই তোমরা তাকে চেন না কেউ। বছর-দশেক পরে যে হেবোর সামনে অটোগ্রাফ খাতাখানা মেলে ধরে তোমাদের সবাইকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হবে— সেই হেবোরই পরিচয় দিতে হচ্ছে আজ তোমাদের কাছে।

হেবো জন্ম-ডিটেক্‌টিভ। বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোম্‌স্‌। হেবোকে না চিনলেও শার্লক হোম্‌স্‌কে নিশ্চয় চেন তোমরা। স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-কুল-তিলক শার্লক হোম্‌সের কাহিনী দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে। হেবোর কাকা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখেন, তাছাড়া ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু পুলিসের একজন বড় অফিসার। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে চোর ডাকাতের কথা শুনে শুনে তাদের ধরনধারণ ভালই জানা ছিল হেবোর। এ ছাড়া ওর মেজদা লাইব্রেরী থেকে লুকিয়ে ডিটেক্‌টিভ বই নিয়ে এসে বাবা-মা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে পড়ার টেবিলেই উপক্রমণিকা আড়াল দিয়ে

গোগ্রাসে গিলত। বড়রা কেউ টের পেতেন না, এমনভাবে লুকিয়ে রাখত সে বইগুলো ঃ কখনও পুরানো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে, কখনও আলমারির পিছনে, কখনও বা রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে, আচারের শিশিগুলোর পিছনে। হেবো আবার মেজদার নজর এড়িয়ে সেগুলি যথারীতি হস্তগত করত, আর একের পর এক শেষ করে ফেলত। অসংখ্য গোয়েন্দা-গল্প পড়ে পড়ে চোর ধরা ব্যাপারটা তার কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গেছে। মাথাটা হেবোর এমনিতেই বেশ সাফা। হেডমাস্টার মশাই বলেন, মন দিয়ে পড়লে ও নিশ্চয়ই ক্লাসে ফার্স্ট হত। কিন্তু হেবোকে গোয়েন্দাগিরির ভূতে পেয়েছে—পাশ করার জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু সম্পর্ক সে বজায় রেখেছে পড়ার বইয়ের সঙ্গে। বাকি সময় সে মেতে থাকে তার গোয়েন্দাগিরির মালমশলা নিয়ে। ডিটেক্টিভ-সুলভ সবকয়টি গুণই আছে তার ঃ তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ, ইনটুইশান, সাহস আর ধৈর্য। এ কাজের যাবতীয় সরঞ্জাম সে একে একে সংগ্রহ করেছে। নোটবই, ডায়রি, মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে উদ্ধার-করা একটা ছেঁড়া মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল চশমার পুরু একটা লেন্স। নোটবইতে সময়ে অসময়ে হেবো অনেক কিছু টুকে রাখে। কোন্ সমস্যার ক্লু কখন কোথায় দরকার হবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? মেজদা ওর চেয়ে দু বছরের বড়—শার্লক হেবো নামটা সেই দিয়েছে ঠাট্টা করে; পদে পদে সে চায় হেবোকে অপদস্থ করতে। নোটবইয়ের কথা উঠলে মেজদা বলে—হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।'

হেবো রাগ করে না। বিজ্ঞের মত হাসে শুধু।

মেজদা না মানলেও, হেবো যে সত্যিকারের একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা, তার প্রমাণ সে দিয়েছিল। পর-পর দু-তিনটি রহস্যের কিনারা সে করে ফেলেছিল তার কিশোর বয়সের বুদ্ধিতে। তোমরা হয়ত খবর রাখ, নয় তো রাখ না। তা তোমরা না জানলেও হেবোর বাড়ির এবং পাড়ার লোকেরা মেনে নিয়েছিল, হেবো একটি হবু গোয়েন্দা। পলাশপুরে হেবোর দাদু একবার রীতিমত এক ষড়যন্ত্রের রহস্যজালে মারা পড়তে বসেছিলেন; ব্যাপারটা এতই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত হেবোর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু একজন প্রফেশনাল গোয়েন্দাকে নিয়োগ করেছিলেন। হেবো তাঁকে প্রবীরকাকু বলে ডাকত। হেবো আর তার প্রবীরকাকু

মিলে সে রহস্যের কিনারা করেছিল। মোট কথা সেই থেকে প্রবীরবাবু হেবোকে মোটামুটি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, যদিও হেবো মাত্র পনের বছরের কিশোর,—ক্লাশ টেন-এ পড়ে।

পলাশপুরের রহস্যটা সমাধান হওয়ার পর কোথায় হেবোর বাবা খুশি হবেন তা নয়, তিনি কড়া হুকুম জারি করেছিলেন—গোয়েন্দাগিরি হেবোকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে, যতদিন না সে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে। বাধ্য হয়ে হেবো তার গোয়েন্দাগিরির সাজ-সরঞ্জাম তুলে রেখে পড়াশুনায় মন দিয়েছিল।

কিন্তু ভবিষ্যতে যাকে শার্লক হোমসের মত বড় গোয়েন্দা হতে হবে, তার কপালে শুধু পড়া মুখস্ত করার ব্যাপারটা কেন লিখবেন ভগবান? মাসকতক পরে আবার একদিন হেবোকে ডেকে পাঠালেন তার কাকা। হেবো ভেবেছিল, আবার বুঝি এক প্রস্থ উপদেশ বর্ষিত হবে তার উপর। উপায় নেই, এখন মাঝে-মাঝেই তাকে ডেকে কাকা নানান উপদেশ দেন—খোঁজ খবর নেন, সে গোয়েন্দাগিরি ছেড়েছে কি না। বই বন্ধ করে হেবো এসে হাজিরা দেয় কাকার ঘরে। কাকা সস্নেহে ডেকে বলেন—'আয় বোস।'

সুরটা যেন অন্য রকম লাগছে? মুখ তুলে হেবো দেখতে পায়—ঘরে বসে আছেন কাকা, কাকীমা আর সেই পলাশপুরের প্রবীরকাকু। প্রবীরকাকু বলেন, 'কেমন আছ হেবো?'

হেবো হাসে, জবাব দেয় না।

কাকা বলেন, 'তোকে একটি জরুরী কাজে ডেকেছি হেবো। মানে আমরা একটা বিপদে পড়েছি। কী করব স্থির করে উঠতে পারছি না। তোর তো এসব বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খোলে, তাই—'

হঠাৎ থেমে পড়েন কাকাবাবু। হেবো মনে মনে উৎফুল্ল হলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করে না।

প্রবীরবাবু আলোচনার সুত্রটা তুলে নিয়ে বলতে থাকেন, 'সত্যি করে বলতে কি, তোমার কাকিমা এ কাজে আমার সাহায্য চেয়েছেন। ব্যাপারটা জটিল; কিন্তু আমি বলেছি, আমার সহকারী হিসাবে যদি শ্রীমান শার্লক হেবো কাজ করে তবেই এ দায়িত্বটা নিতে পারি।'

হেবো একটু অবাক হয়ে বলে, 'কাকিমা? তোমার বিপদ?' প্রবীরকাকু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, 'না, বিপদটা ঠিক তোমার কাকিমার নয়—তাঁর ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর। ব্যাপারটা এই—'

আদ্যোপান্ত ঘটনাটা হেবো মন দিয়ে শোনে।

হেবোর কাকিমারা দুই বোন। কাকিমার ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের একজন নামকরা উকিল সুধাকান্তবাবুর একমাত্র ছেলে নির্মলেন্দুর সঙ্গে। সুধাকান্তের আর সন্তানাদি নেই। স্ত্রীও দীর্ঘদিন গত। কৃষ্ণনগরের রায়পাড়ায় মস্ত বড় বাড়ি। যথেষ্ট রোজগার করেছেন জীবনে। এখন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। সত্তরের ওপর বয়স। ছেলে নির্মলেন্দুই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শেষ দিকে তন্ত্র-সাধনার দিকে ঝোঁকটা হয়েছে বৃদ্ধের। শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, পুজো-অর্চনাতেই দিন কাটে। নির্মলেন্দুর সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে হয়েছিল বছর-পাঁচেক আগে। নির্মলেন্দু ছিল দক্ষিণ রেলওয়ের একজন অফিসার। ফলে বিয়ের পর থেকেই মঞ্জুলা বরাবর স্বামীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এখানে ওখানে ঘুরেছে। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি। ছুটিছাটায় নির্মলেন্দু যখন বাড়ি এসেছে তখন মঞ্জুলাও এসেছে, এবং সুধাকান্তের সেবা যত্নের কোন ত্রুটি করেনি। বিয়ের মাস-খানেক আগেই নির্মলেন্দু চাকুরিতে ঢুকেছিল, আর বিয়ের মাস-দুয়েক পরেই সে বদলি হয়ে যায় মাদ্রাজে। ফলে মঞ্জুলার পক্ষে শ্বশুরের ঘর করাটা ঘটেনি। এখন মজা হচ্ছে এই যে, সুধাকান্তবাবুর ধারণা হল, এই অপয়া বউয়ের জন্যই নির্মলেন্দু তার বাপকে ত্যাগ করে গেল। এ ধারণার পিছনে কোন যুক্তি নেই। সুধাকান্তবাবু একজন নাম করা উকিল ছিলেন, যুক্তির উপর নির্ভর করে কত বড় বড় কেস জিতেছেন তিনি; অথচ এখন একেবারে বিনা যুক্তিতে ছেলেমানুষের মত তিনি অভিমান করে রইলেন পুত্রবধূর উপর। বেচারি মঞ্জুলা এ অভিমান ভাঙাবার নানান চেষ্টা করেছে। স্বামীকে ছেড়ে কৃষ্ণনগরে শ্বশুরের কাছে এসে থাকতে চেয়েছে; কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। সুধাকান্ত তো পুত্রবধূর সেবার জন্য কাতর নন, তিনি চাইছেন পুত্রের সান্নিধ্য। অথচ সে বেচারা চাকরি ছেড়ে বারে বারে এতদূর আসেই বা কী করে? শেষ পর্যন্ত নির্মলেন্দু বলেছিল, 'বাবা, আপনিই কেন আমার ওখানে গিয়ে থাকবেন চলুন না মাদ্রাজ!' কিন্তু তাতেও সুধাকান্ত রাজি নন। দেশ ঘর ছেড়ে

অত দূরে এই বয়সে তিনি যাবেন না। ফলে পিতা, পুত্র আর পুত্রবধূর মধ্যে একটা মন-কষাকষির সূত্রপাত হল।

হেবো বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু এর মধ্যে কাকিমার বিপদটা কোথায়?' প্রবীরবাবু বলেন, 'বলছি, সবটা শোন আগে।'

ঘটনার গতিটা কোন দিকে মোড় নিয়েছে এবার তিনি তা বুঝিয়ে দেন।

মাসচারেক আগে হঠাৎ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় নির্মলেন্দু মারা গেছেন। এ আঘাতে সুধাকান্ত একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। অথচ তাঁর মাথা খারাপের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। মানসিক স্থৈর্য তাঁর ঠিকই বজায় আছে। তবে, সমস্ত দুনিয়ার উপর তাঁর একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। সুধাকান্তের অর্থের অভাব ছিল না—যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেছেন তিনি সারা জীবনে। তবু সেই টাকা রোজগারের অছিলাতেই ছেলে যে বাপকে ত্যাগ করে গিয়েছিল এটা তিনি ভুলতে পারেননি। ছেলে নেই—টাকার উপরেই মর্মান্তিক চটে গেছেন তিনি। তাঁর ধারণা হয়েছে অর্থই সকল অনর্থের মূল। আর চটে গেছেন তাঁর পুত্রবধূর উপর। আগে থেকেই অবশ্য চটে ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সেটা মর্মান্তিক আকার ধারণ করেছে।

মঞ্জুলার একটি সন্তান হয়েছিল ইতিমধ্যে। বছর-খানেকের ছেলেটিকে নিয়ে সে এসে আশ্রয় চাইল শ্বশুরের ভিটায়। আশ্রয় তিনি দিলেন, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও করতে তিনি রাজি; কিন্তু না পুত্রবধূ না তার অবোধ শিশুসন্তান—কাউকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন না।

দ্বিতল বাড়ি। উপর তলায় তিনখানি ঘর। একটি ঘরে থাকেন সুধাকান্তবাবু, দ্বিতীয় ঘরটি তালাবন্ধ থাকে। সেটায় ছাত্রজীবনে নির্মলেন্দু থাকত। কখনও সখনও দেশে এলে সস্ত্রীক এই ঘরেই উঠত সে। তৃতীয় ঘরখানিতে বর্তমানে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। মন্ত্রদীক্ষা দিতে তিনি এসেছিলেন একদিন, আর ফিরে যাওয়া হয়নি। একতলায় রান্না, ভাঁড়ার, বৈঠকখানা ছাড়াও আর একটি বাড়তি ঘর ছিল। সেটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল মঞ্জুলাকে। ঘরটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। এমন একখানা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়ার সঙ্গত কারণ দেখিয়েছিলেন গুরুদেব। সুধাকান্ত নাকি পুত্রবধূর বৈধব্যের বেশটা সহ্য করতে পারেন না। না পারাই স্বাভাবিক। মাত্র পাঁচ বছর আগে যাকে আদর করে নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়ির লক্ষ্মী করে,

সে-ই যদি আজ সাদা থান পরে তাঁর সামনে ঘুরে বেড়ায় তাহলে তাঁর কষ্ট হয় বইকি। মঞ্জুলাও তাই মেনে নিল এই দুর্ভাগ্যকে। একতলার ঐ অন্ধ কুটুরিতেই আশ্রয় নিল সে শিশুসন্তানটিকে নিয়ে। বাড়িতে দারোয়ান, ঠাকুর আর পুরনো আমলের ঝি মোক্ষদামাসি আছে। তারাই সব কাজকর্ম সারে। গুরুদেব প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন, এ বেশে যেন মঞ্জুলা তার শ্বশুরের সামনে না যায়।

প্রথমটায় লজ্জায় সঙ্কোচে আর হতাশায় মাথা নিচু করে এ আদেশ মেনে নিয়েছিল মঞ্জুলা। সুধাকান্তের পুত্রবিয়োগের জন্য যেন সে-ই দায়ী। সত্যই তো, এ বেশে সে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর সামনে? কিন্তু দু-দশদিন পরে তার খেয়াল হল—কিন্তু এ তো হতে পারে না! এই বেশ বদলাবার কোন সম্ভাবনা যখন নেই তখন সে কি চিরকালই ঐ অন্ধ কুটুরিতে পড়ে থাকবে নাকি? শ্বশুরের সেবাযত্ন করবে না?

গুরুদেব কঠিন হয়ে বললেন, 'না! এতদিন যদি পুত্রবধূর সেবাযত্ন ছাড়াই চলে গিয়ে থাকে তবে আর কটা দিনও চলবে!'

বাধ্য হয়ে এই অপমানকর জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিল মঞ্জুলা। নির্বান্ধব পুরীর একতলার ঐ অন্ধকার ঘরে ইঁদুর আর আরশোলা তাড়িয়ে পড়ে ছিল কোনক্রমে। সদ্য-বিধবার যেন নূতন কোন কষ্টের বোধই ছিল না। তবু তার মনে একটি আশার বীজ সে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিল—একদিন না একদিন সুধাকান্ত তাকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নেবেন। কতদিন আর অভিমান করে থাকতে পারবেন তিনি? সুধাকান্ত কি কোনদিনই বুঝবেন না—যে-দুঃখের আগুনে তিনি জ্বলে পুড়ে মরছেন সেই একই আগুনে জ্বলছে এ বাড়ির আর একটি উপেক্ষিতা নারী? তাকে না হলেও অন্তত নির্মলেন্দুর সন্তানটিকে, ফুলের মত সুন্দর বংশের শেষ প্রদীপটিকে একদিন তিনি তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব হাহা-করা বুকে টেনে নেবেনই। খোকন নূতন হাঁটতে শিখেছে। টলমল করে সারা বাড়ি টলে টলে বেড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায় দ্বিতলে।

কিন্তু তা হবার নয়। গুরুদেব আর তাঁর চেলাটি পালা করে পাহারা দেয় সুধাকান্তের ঘরের সামনে। ওঁদের ভয়ে খোকনকে উপরে নিয়ে যেতে পারে না কেউ। ক্রমে মঞ্জুলার আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে, আর সে অনুভব করেছে যে শ্বশুরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথে একমাত্র বাধা হচ্ছেন ঐ গুরুদেবটি।

কিন্তু কেন ? মঞ্জুলা কোন কারণ খুঁজে পায়নি।

মঞ্জুলার বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভাই নেই তার। বাবা গত হয়েছেন। মা আছেন মালদায়—জমিজমা থেকে কোনক্রমে দিন চলে যায় তাঁর। একই দিদি—তিনিই হেবোর কাকিমা। হেবোর কাকা অবশ্য মঞ্জুলাকে তাদের বাড়িতে এনে রাখতে পারতেন ; কিন্তু তাহলে শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তি কিছুই সে পাবে না। ছেলেটিকেও তো মানুষ করে তুলতে হবে।

মঞ্জুলার চিঠি পেয়ে হেবোর কাকা আর কাকিমা কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুধাকান্তবাবু তাঁদের কোন আমলই দেননি। প্রথমত তিনি দেখাই করতে চাননি, বলে পাঠিয়েছিলেন—'আপনারা বৌমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি নিচের তলায় আছেন।' কিন্তু হেবোর কাকা নাছোড়বান্দা হয়ে দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। সুধাকান্তবাবু ভালভাবে ওঁদের সঙ্গে কথাই বলেননি। তবু নকুলবাবুর মধ্যস্থতায় মোটামুটি সাক্ষাৎটা হয়েছে।

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'নকুলবাবুটি কে ?'

হেবোর কাকিমা বলেন, 'নকুলবাবু হচ্ছেন তায়ইমশায়ের পুরানো মুহুরি। বলতে গেলে ওঁদের সংসারেরই একজন। তাঁরও সত্তরের কাছাকাছি বয়স। তিনি নির্মলেন্দুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। নির্মলেন্দুকে তিনিও খুব ভালবাসতেন। সেই নির্বান্ধব পুরীতে ঐ নকুলচন্দ্রই মঞ্জুলার একমাত্র ভরসা। খোকনের মধ্যে তিনি নির্মলকে যেন নূতন করে আবিষ্কার করেছেন।'

হেবো বলে, 'যাই হোক, তারপর ?'

হেবোর কাকা বলেন, 'আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমরা জানি না সুধাকান্ত-বাবু কোন উইল করে রেখেছেন কি না। করলেও হয়ত তিনি নির্মলের নামে সব-কিছু লিখে দিয়ে গেছেন।'

বাধা দিয়ে হেবো আবার বলে, 'আমি আইনের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। যদি তাই করে থাকেন, তাহলে নির্মলবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী-পুত্রই কি সে সম্পত্তি পাবে না ?'

'হ্যাঁ, তাই পাবে।' বলেন প্রবীরবাবু, 'কিন্তু তোমার কাকা আশঙ্কা করেছেন যে, ঐ গুরুদেবের পরামর্শে সুধাকান্তবাবু নূতন করে উইল করতে চাইছেন। আর

সেই নূতন উইলে তিনি মঞ্জুলা দেবীকে আর তাঁর নাবালক সন্তানকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চান।'

হেবো বলে, 'এ তো খুব সর্বনাশের কথা! এ কথা কি আপনাদের অনুমান, না প্রমাণ আছে কিছু?'

প্রবীরবাবু বলেন, 'এটা এখনও অনুমানের পর্যায়েই আছে বটে তবে অনুমানের স্বপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তিও আছে। খবরটা দিয়েছেন নকুলচন্দ্র।'

সে কাহিনীও বিস্তারিত শুনলো হেবো।

সুধাকান্তবাবুকে এই পুরাতন ভক্তটি আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। নকুলচন্দ্র ছিলেন তাঁর মুহুরি। সুধাকান্তের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে দু-হাতে পয়সা কামিয়েছেন—ছেলেদের মানুষ করেছেন, মেয়েদের পাত্রস্থ করেছেন। দু-জনেই অবসর নিয়েছেন বটে, তবু আজও নকুলচন্দ্র প্রতিদিন আসেন তাঁর 'বড়বাবুকে' দেখতে। সংসারের খবরাখবর নিয়ে, পুরাতন দিনের কথা দুটো-চারটে আলোচনা করে, রাত বাড়লে বাড়ি ফিরতেন। সুধাকান্ত কোন্ কেসে কেমন করে সওয়াল করেছিলেন, কোন্ আসামীকে ফাঁসীর দড়ির নিশ্চিত আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করেছিলেন, কোন্ ধড়িবাজ বদমায়েসের কূট কৌশল ব্যর্থ করে তাকে কারাকক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন—বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন নকুলচন্দ্র। আর মনে মনে খুব উপভোগ করলেও সুধাকান্ত বলতেন,, 'আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথা থাক, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আমাদের সময় হাকিমরা ছিল সত্যিকারের মানুষ। সেই ম্যাক-ফার্লন সাহেবকে মনে আছে তোমার?'

নকুল বলতেন, 'মনে নেই আবার? ফেয়ারওয়েলের দিন তিনিই না আপনাকে বলেছিলেন, এখান থেকে যেতে আর কোন দুঃখ নেই, শুধু একটা দুঃখ, তোমার মত উকিলের জোরালো সওয়াল আর শুনতে পাব না।'

বাধা দিয়ে সুধাকান্ত বলতেন, 'আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথায় আর কাজ কী?'

এই দুটি প্রাচীন বন্ধুর সামাজিক মর্যাদার আসন উঁচু নিচু কি না বুঝবার উপায় ছিল না। ওঁদের বন্ধুত্বে ভাঁটার টান পড়ল সুধাকান্ত দীক্ষা নেবার পর থেকে। গুরুদেব নকুলচন্দ্রকে পছন্দ করতেন না। ওঁদের সান্ধ্য আসরে প্রায়ই এসে বসতেন তিনি। আর দু-জনেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতেন। ক্রমশ

নকুলচন্দ্র অনুভব করেন, তিনি এ বাড়ির কর্তার কাছে অবাঞ্ছিত। তবু দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অভ্যাসবশত সন্ধ্যাবেলায় একবার দেখা দিয়ে যেতেন।

কিছুদিন আগে সুধাকান্তের হঠাৎ খুব জ্বর হয়। নকুলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন শহরের নামকরা ডাক্তার অনুকূলবাবুকে। অনুকূলচন্দ্র বয়সে ছোট, কিন্তু পসার খুব আছে তাঁর। ঔষধপত্র পড়তে সামলে নিলেন সুধাকান্ত; কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দিন সাতেক জ্বর ভোগ করেই একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। বিছানা থেকে নামতে পারেন না। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন সুধাকান্ত। নকুলচন্দ্র সকাল বিকেলে দু-বেলা আসতে শুরু করলেন, খবর নিতে—ব্যবস্থা-পত্র করতে। বয়স হলে কী হবে, নকুলচন্দ্র এখনও বেশ শক্ত আছেন। দোতলায় উঠে গিয়ে তিনি তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে রোজ দেখা করেন। সেদিনও গিয়ে যেই বসেছেন, সুধাকান্ত বললেন, 'নকুল, ঐ লোহার সিন্দুকটা খুলে ডান-দিকের উপরের খোপে একটা বন্ধ খাম আছে, বার করে দাও তো।'

দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা লোহার মজবুত আলমারি। তার চাবিটা সর্বক্ষণ থাকে অসুস্থ সুধাকান্তের বালিশের নিচে। চাবিটা বার করে তিনি নকুলচন্দ্রের হাতে দিলেন। ওঁর চোখের সামনেই ঘটছে সব কিছু। নকুলচন্দ্র চাবি খুলে উপরের খোপ থেকে একটা সীলমোহর করা খাম বার করে ফিরে এলেন। খাম ও চাবিটা বড়বাবুর হাতে দিতে সুধাকান্ত বললেন, 'সিন্ধুকটা আবার খোলা রেখে এলে কেন? ওটা বন্ধ করে চাবিটা দাও আমাকে।'

নকুলচন্দ্র বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম, খামটা আবার তুলে রাখতে হবে।'

'না, ওটা এখন বাইরেই থাকবে।'

খামটা বালিশের নিচে রাখলেন সুধাকান্ত।

সিন্ধুক বন্ধ করে নকুলচন্দ্র চাবিটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, বলে ফেলেন, 'কিন্তু এটা কি ভাল হচ্ছে বড়বাবু?'

চমকে উঠে সুধাকান্ত বললেন, 'কোন্‌টা নকুল?'

'আমি তো স্যার জানি কী আছে ঐ সীলমোহর-করা খামের ভিতরে! বছর-দশেক আগে ওটা আমিই তো আপনার সামনে সীলমোহর করেছিলাম। সাক্ষী হিসাবে আমারও সই আছে কাগজটায়।'

সুধাকান্ত কোন জবাব দিলেন না। গুম মেরে বসে রইলেন। কিন্তু নকুলচন্দ্র পাকা লোক। সাক্ষী নীরব থাকলে তাকে ছেড়ে দিতে নেই, আরো ভালো করে চেপে ধরতে হয়—দীর্ঘদিনের কোর্ট-কাছারির অভিজ্ঞতায় এটুকু জানা ছিল তাঁর। তাই হেসে বলেন, 'আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না কিন্তু বড়বাবু।'

সুধাকান্ত ধমকে ওঠেন, 'উইল পালটাব কিনা তাও কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি?'

নকুল ম্লান হাসেন। অনেক দুঃখের সে হাসি। বলেন, 'আজ্ঞে না। আপনি মস্ত বড় উকিল, আর আমি সামান্য মুহুরি। আপনারই অন্নে পালিত বলতে পারেন। আমার মত লোকের সঙ্গে আপনি কেন এসব বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ করবেন? তবে কিনা নিমুকে একদিন কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম—তাই তার ঐ বাচ্চাটার কথা ভেবে—কিন্তু নাঃ! আমার অন্যায়ই হয়েছে।'

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে থাকেন সুধাকান্ত।

নকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'আর মুশকিল হয়েছে কি জানেন বড়বাবু—আপনি তো চোখে দেখেন না, ওদের উপরেই আসতে দেন না; কিন্তু আমি তো দেখতে পাই, খোকনবাবু সারা বাড়িটা টলমল করে হেঁটে বেড়ায়। ঠিক নিমুর মত দুষ্টু হয়েছে—মায় হাসিটা পর্যন্ত। তাই ঐ ছেলেটির ভবিষ্যৎ ভেবে··· কিন্তু আবার পাগলামি করছি আমি। এ সব কথা আলোচনা করার আমার অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ, অন্যায়ই হয়েছে আমার, মাপ করবেন আমাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নকুলচন্দ্র। লাঠিটা তুলে নেন হাতে।

আশ্চর্য, তবু সুধাকান্ত কোন প্রতিবাদ করেন না। জানালা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকেন পাথরের মূর্তির মত। তিনি যেন ভুলে গেছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নকুলচন্দ্রের সঙ্গে এ বাড়ির কী সম্পর্ক! প্র্যাকটিসের প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি টাকার মুখ দেখেননি। প্রথম যৌবনে তিনিও যেমন গুনতেন কোর্টঘরের কড়ি ও বরগা, মুহুরিবাবুও তেমনি সারাদিন ধরে গুনতেন বটগাছের পাতা। সেই দুঃখের দিন থেকেই নকুলচন্দ্র তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছিলেন—সুখে দুঃখে শতাব্দীর অর্ধাংশ পাড়ি দিয়ে এসেছেন একই নৌকোয়। নিমুর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে ঐ নকুলচন্দ্রকেই একদিন পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বরযাত্রী যেতে পারেননি—একটা বড় কেসের দিন

পালটানো যায়নি বলে—ঐ নকুলচন্দ্রকেই বরকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। বৈবাহিককে বলে পাঠিয়েছিলেন—'আমি নগদ চাই না, নমস্কারী চাই না, ননদ পুঁটুলি চাই না—নির্মলের কাকাকে যেন বৌমা গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি দিয়ে প্রণাম করেন।' মঞ্জুলার মা একই গরদের থান থেকে কেটে দু-জোড়া পাঞ্জাবি বানিয়েছিলেন—মঞ্জুলার শ্বশুরের ও খুড়শ্বশুরের নমস্কারী। সেসব দিনের কথা আজ সুধাকান্ত নিঃসংশয়ে ভুলে গেছেন।

নকুলচন্দ্র ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে চান ঘর থেকে। সুধাকান্ত ফিরে ডাকেন না তাঁকে। দরজার কাছে গিয়ে নকুলচন্দ্র দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। লাল চেলি পরা, গলায় গরদের চাদর, কপালে আধুলির মাপে একটা সিঁদুরের টিপ। তন্ত্রসাধক তিনি। কেউ-কেউ বলে তিনি নাকি কাপালিক। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে তাঁর। বয়সে ঐ গুরুদেবটি সুধাকান্তের চেয়ে বছর-বিশেক ছোটই হবেন—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তাঁর—তবু তিনি অনায়াসে সুধাকান্তের প্রণাম নিয়ে থাকেন।

নকুলচন্দ্র গুরুদেবকে নমস্কারমাত্র না করে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শুনতে পান গুরুদেব তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেশ জোর গলায় সুধাকান্তকে বলছেন—'আবার তুমি ঐসব অসৎ কুসঙ্গের সংস্পর্শ করছ? বলেছি না—ওদের দোতলায় উঠতে দেবে না!'

মিনমিনে গলায় সুধাকান্ত কি জবাব দিলেন সেটা আর শুনতে পেলেন না তিনি।

এতক্ষণ তীক্ষ্ন মনোযোগ দিয়ে হেবো শুনছিল কেস-হিস্ট্রিটা। প্রবীরচন্দ্র থামতেই বলল, 'বুঝলাম। এখন কী করতে চান আপনারা?'

কাকা বলেন, 'আমি তো আশার কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'কেন? এখনই নিরাশ হবার কী আছে? আমি তো আশার লক্ষণ ভালই দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত দেখুন, সুধাকান্ত গুরুদেবের হাতে সিন্ধুকের চাবিটা দেননি। নিজে উত্থানশক্তি-রহিত, কিন্তু সিন্ধুক খোলার কাজটার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন নকুলবাবুর। দ্বিতীয়ত, নকুলচন্দ্র যখন খোকনের কথা বলেছিলেন তখন তিনি উদাস দৃষ্টি মেলে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তৃতীয়ত, বোঝা যাচ্ছে গুরুদেব ইতিপূর্বেই নকুলচন্দ্রের দ্বিতলে আসা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করেছিলেন সুধাকান্ত।'

কাকা বলেন, 'কি জানি বাপু, অত সূক্ষ্ম বিচার আমি বুঝি না। আমি প্রবীরকে বলছিলুম কাজটা হাতে নিতে। এ সাধারণ মানুষের কাজ নয়। পুলিসের সাহায্যও আমরা পাব না, কারণ সুধাকান্ত বে-আইনি কিছু করছেন না। সম্পত্তি সুধাকান্তের নিজের উপার্জন, পৈতৃক নয়। তিনি যদি সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি গুরুদেবকে উইল করে দিয়ে যান তাহলে আইনত আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। মামলা মোকদ্দমা করে মঞ্জুলা হয়ত তার নাবালক সন্তানের জন্য একটা মোটামুটি খোরপোষ আদায় করতে পারবে—তাও পারবে কিনা জানি না। কিন্তু এত বড় অন্যায়টা সহ্যই বা করে যাওয়া যায় কেমন করে?'

হেবো বলে, 'সে তো ঠিক কথাই। সুধাকান্তকে বাধা দেবার আইনগত অধিকার না থাকলেও নীতিগত অধিকার আমাদের আছে। এ যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম আর কাকে বলে? কিন্তু প্রবীরকাকু, কেমন করে কী করবেন?'

কাকা বলেন, 'তা যদি আমি বাতলাতে পারব তাহলে আমিই তো গোয়েন্দা হতুম।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বলে, 'সে কথা ঠিক। তা প্রবীরকাকু, আপনি কী বলছেন?'

'আমি বলছি, আমাদের কিছু করতে হলে সর্বপ্রথম ঐ দুর্গের ভিতর ঢুকতে হবে। আমার পক্ষে ঐ ব্যূহে প্রবেশ করা অসম্ভব। গুরুদেবটিকে আমি চিনি। গভীর জলের মাছ তিনি। বহু বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করেছেন আশ্রমের নামে। তাছাড়া চোরাই মাল পাচারের একটা ফলাও ব্যবসা তাঁর আছে। বহুবার ফাঁদ পেতেছে পুলিস—ধরা পড়েনি একবারও। অত্যন্ত ধড়িবাজ লোক। সেও আমাকে চেনে, আমিও তাকে চিনি। ফলে কোন ছুতো-নাতাতেই আমার পক্ষে ঐ ব্যূহে প্রবেশ অসম্ভব।'

হেবো বলে, 'বুঝেছি। ভীমসেনও ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন।'

'ভীমসেন কে?'

'মধ্যম পাণ্ডব। দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারেননি তিনি। শেষ-মেশ আমারই মত একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুই ঢোক ওর ভিতর।'

কাকিমা ভয় পেয়ে বলেন, 'না বাপু, এ সবের মধ্যে হেবোর গিয়ে কাজ নেই। বড়ঠাকুরও বাড়িতে নেই—'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'ভয় নেই কাকিমা, অভিমন্যু-বধ পালা অভিনয় করছি না আমরা। বেরিয়ে আমি ঠিকই আসব।'

প্রবীরও আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তাছাড়া আমি তো থাকবই পিছনে।'

হেবো হেসে বলে, 'সেটা কোন সান্ত্বনার কথা নয় প্রবীরকাকু, কারণ ভীমসেনও অভিমন্যুকে ঐরকম একটা প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলছি, কাজটা টেক আপ্ করতে পারতুম, সামনে ছুটিও আছে স্কুলের—ক্লাস কামাই হবে না; কিন্তু আমি ওখানে যাব কোন অছিলায় ?'



ভীমসেনও ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন

প্রবীরবাবু বলেন, 'আমি সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। নকুলবাবু আমাদের দলে। তিনি সুধাকান্তবাবুকে বলবেন, তুমি তার ভাইপো বা ভাগ্নে। গাঁয়ে থাক—দুদিনের জন্য শহর দেখতে এসেছ।'

হেবো বলে, 'তাতে দুটি অসুবিধা। প্রথম কথা, নকুলবাবু সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। অথচ সুধাকান্তবাবু আজ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁকে চেনেন। জেরার মুখে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। মনে করুন, নকুলচন্দ্রের এক ছেলে পাঁচ বছর আগে সাপের কামড়ে মারা গেছে। তাঁর ভাইপোর পক্ষে এত বড় খবরটা জানা থাকা উচিত। সেই প্রসঙ্গ উঠলে আমি কি বলব ? দ্বিতীয়ত, নকুলবাবুর বাড়িও কৃষ্ণনগরে

—তাঁর ভাইপো বা ভাগ্নে গ্রাম থেকে শহর দেখতে এলে তাঁর বাড়িতেই উঠবে। সুধাকান্তের স্কন্ধে তাকে নকুলচন্দ্র চাপাতে চাইবেনই বা কেন, আর তাঁর ভাইপোই বা ভাইবোনদের ছেড়ে ঐ নির্বান্ধব পুরীতে থাকতে চাইবে কেন ?'

কাকা বলেন, 'এ কথা ঠিক।'

হেবো বলে, 'তার চেয়ে আমার মাথায় আর-একটা ফন্দি এসেছে। আচ্ছা, নকুলবাবুর বাড়িতে কে কে আছেন ?'

কাকিমা বললেন, 'ঠিক জানি না। তবে ওঁর অনেকগুলো ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি আছে শুনেছি।'

হেবো বলে, 'ব্যস্, ব্যস্, মা ষষ্ঠী রক্ষা করেছেন। বসুন, আসছি আমি—উপায় বার করেছি।'

বলেই বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। একটু পরে ফিরে আসে একখণ্ড টেস্ট পেপার নিয়ে। পাতা উল্টে কি দেখে নিয়ে বলে, 'নকুলবাবু বলুন, আমার বাবা তাঁর পরিচিত একজন মক্কেল। মামলা-সূত্রে আলাপ। আমি হাঁসখালি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের একটি ছাত্র। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেব। আমার সীট পড়েছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। পরীক্ষা দিতে শহরে এসেছি। যেহেতু নকুলবাবুর বাড়িতে মা ষষ্ঠীর কৃপায় সারাদিন চ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগে আছে, তাই তিনি আমাকে কয়েকদিনের জন্য সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে এনে রাখছেন। দ্বিতলের অব্যবহৃত ঘরটায় থেকে আমি পড়াশুনা করব ও পরীক্ষা দেব। ব্যাপারটা বুঝেছেন ? আমি তাহলে দোতলাতেই থাকব। সকাল বেলা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাব, তারপর লুকিয়ে থাকব বাড়িতেই। যেহেতু আমি পরীক্ষার্থী তাই কেউ সন্দেহ করবে না যে, পরীক্ষা না দিয়ে আমি বাড়িতেই লুকিয়ে আছি।'

যে কথা সেই কাজ। পরদিন সকালের লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জারে নকুল ও প্রবীরচন্দ্রের সঙ্গে হেবো রওনা দিল কৃষ্ণনগর। হেবোর বাবা-মা কদিনের জন্য মধুপুরে গেছেন ঈস্টারের ছুটিতে। হেবোরও স্কুল ছুটি ; ঈস্টার, মহরম আর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার জন্য লম্বা ছুটি। মেজদা একবার হেবোকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কোথায় যাচ্ছে। হেবো জবাবে বললে, 'কাকা যেখানে পাঠাচ্ছেন।'

নকুলচন্দ্র হেবোকে নিয়ে এলেন সুধাকান্তের বাড়িতে। ঠিক হল প্রবীরচন্দ্র কাছে-পিঠেই কোন একটা বোর্ডিং হাউসে থাকবেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা হেবো গিয়ে

তাঁকে দৈনন্দিন রিপোর্ট দেবে। সুধাকান্ত নকুলবাবুর পরিচিত এই ছেলেটিকে কদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজি হলেন। ব্যূহ প্রবেশে কোন বেগ পেতে হল না। হেবোর আসল পরিচয়টা নকুলচন্দ্র শুধু জানিয়ে গেলেন মঞ্জুলা দেবীকে। প্রয়োজন ছিল না, কারণ দিদির কাছ থেকে হেবোর কীর্তি-কলাপ ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন তিনি। তবু মঞ্জুলা দেবী খুব যে একটা ভরসা পেলেন তা তাঁর মুখ দেখে মনে হল না।

সুধাকান্তবাবু হেবোকে ডেকে কোন প্রশ্নই করলেন না। এসব দিকে যেন তাঁর খেয়ালই নেই। হেবো লক্ষ্য করে দেখে, তাঁর ঘরের সামনে সর্বক্ষণ একটা টিকি-ওয়ালা লোক বসে পাহারা দেয়। শুনল, লোকটা গুরুদেবের এক চ্যালা—নাম কেবলানন্দ।

ঘরটার তালা খুলে যে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল সে বাড়ির ঠাকুর। হেবো তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখে নেয়। দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা চওড়া বারান্দা, ডান দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে দুখানি ঘর। আর সিঁড়ির বাঁয়ে পশ্চিম দিকে আর একখানা কামরা। পূর্ব দিকের প্রথম ঘরখানা এতদিন তালাবন্ধ পড়ে ছিল। পাশের ঘরখানিতে আছেন অসুস্থ গৃহকর্তা। সিঁড়ির ওপাশের পশ্চিমের ঘরখানায় গুরুদেব তাঁর সেই ছেলেটিকে নিয়ে থানা গেড়েছেন। অর্থাৎ ঐ পশ্চিমদিকের ঘরখানাই হচ্ছে শত্রুপক্ষের শিবির।

হেবো খুশি হয় মনে মনে। এতে তার সুবিধাই হয়েছে। ঠিক পাশের ঘরেই আছেন সুধাকান্ত। দুটি ঘরের মাঝখানে আছে একটি দরজা, ওপাশ থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে বিলাতি বাড়ির কায়দায় গা-তালা লাগানো। গা-তালায় চাবির যে ফুটো আছে তাতে চোখ লাগালে ও-পাশের ঘরের খানিকটা নজরে আসে—খাটের একটু অংশ। লোহার সিন্দুকটা অবশ্য দেখা যায় না। সেটা ঘরের অন্য প্রান্তে। হেবো মনে মনে স্থির করল— প্রথমেই তাকে একখণ্ড সাদা কাচ যোগাড় করতে হবে। ঐ ছিদ্রপথে তাকে বারে বারে চোখ লাগাতে হবে; আর গুরুদেবটি যে রকম ঝাণ্টু লোক, তাক বুঝে কাঠির খোঁচা মেরে হেবোকে কানা করে দিতে পারেন। একতলার যে ঘরটায় মঞ্জুলা দেবী থাকেন সেটাও দেখল। সেটাও অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল দীর্ঘদিন। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়েছে।

ঠাকুর, দারোয়ান, ঝি—সকলকেই লক্ষ্য করে দেখল। মনে হল না ওরা কোন

পক্ষে যোগ দিয়েছে। অন্তত ও-পক্ষে যে নয়, সেটা বোঝা যায়, কারণ সবাই দেখা যাচ্ছে খোকনকে ভালবেসে ফেলেছে এবং সবাই গুরুদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এগুলো শুভ লক্ষণ, ওরা বোধহয় বেইমানি করবে না। অবস্থা বেগতিক হলে ওরা এ-পক্ষেই যোগ দেবে। গুরুদেবটিকেও ভাল করে লক্ষ্য করল। কাপালিক বা তান্ত্রিকদের মত দেখতে নয় মোটেই। প্রকাণ্ড তাঁর বপুখানি, মেদের মৈনাক! মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি চুল। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। পেল্লায় একটি ভুঁড়ি, কপালে সব সময়েই একটা লাল সিঁদুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক বলতেই বাজে-পোড়া তালগাছের মত পাকানো চেহারার কথা মনে পড়ে, এঁকে দেখে তা মনে পড়ে না মোটেই—বরং মনে হয় কৃষ্ণনগরের আহ্লাদি-পেহ্লাদি পুতুলের একজন জোড়া ভেঙে এসেছে বুঝি। মেদবহুল ঐ চেহারার মধ্যে দেখবার মত বস্তু হচ্ছে তাঁর চোখ দুটো। প্রায় সব সময়েই ফুলো-ফুলো, গালের চর্বি'র তলায় ঢাকা থাকে, কিন্তু সময়-বিশেষে যেন জ্বলে ওঠে।

প্রথম দর্শনেই হেবোর উপর যেন তাঁর স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠল। হেবো ছদ্ম-ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বলেই বোধহয়। গুরুদেব বললেন, 'কল্যাণ হোক! তোমার নামটি কী বাবা?'

'আজ্ঞে ভাল নাম বটুকনাথ বটব্যাল, ডাক নাম বটু।'

'ভাল, ভাল। তা বাবা বটু, তুমি বুঝি হাঁসখালি ইস্কুলের ছাত্র? সায়েন্স, না হিউম্যানিটিজ?'

'আজ্ঞে সায়েন্স।'

'খুব ভাল! এটা তো সায়েন্সেরই যুগ! আচ্ছা এস তুমি। মন দিয়ে পড়াশুনা কর।'

গুরুদেবের চেলাটি হাবাগোবা ধরনের; কিন্তু বুদ্ধিতে কম হলে কী হবে, লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি, আর বুলডগের মত একরোখা। সম্ভবত লোকটা উৎকল-বাসী। সুধাকান্তের দরজার সম্মুখে থানা গেড়ে বসে আছে যেন একটা ব্লাড-হাউণ্ড কুকুর! গুরুদেব ওকে ডাকেন, 'বাবা কেবল' বলে—নাম নাকি কেবলানন্দ।

নিজের ঘরে এসে হেবো তার বইপত্র খুব আড়ম্বর করে সাজিয়ে রাখল টেবিলের উপর, আর পিছনের একটা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখল তার গোয়েন্দাগিরির সরঞ্জাম—নোটবই, ডায়েরি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মাপবার ফিতে।

প্রথম দিনটা গেল পরিস্থিতিটা ঠিকমত আঁচ করে নিতে, এ নাটকের চরিত্রগুলিকে ভালমত সমঝিয়ে নিতে। হেবো বুঝেছে—তার প্রথম, প্রধান ও একমাত্র কাজ হচ্ছে পাশের ঘরের উপর নজর রাখা। যতদূর জানা গেছে সুধাকান্ত তাঁর পুরাতন উইলটি লোহার সিন্দুক থেকে বার করেছেন, সেই উইল-মতে নির্মলেন্দুবাবুরই সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার কথা। যেহেতু নির্মলেন্দু গত হয়েছেন, সুতরাং আইনমতে নির্মলেন্দুর স্ত্রী মঞ্জুলা দেবী ও নাবালক পুত্র এখন সেই সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ভাবগতিক দেখে অনুমান করা যেতে পারে, সুধাকান্ত উইলটি বার করে রেখেছেন সেটা পালটাবার জন্য। আগের উইলটি যদি তিনি নষ্ট করেন তাহলেও ভাবনার কিছু নেই, কারণ আইন বলছে যে, উইল না করে তিনি যদি মারা যান, তাহলেও মঞ্জুলা আর তাঁর সন্তান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না। কিন্তু দুর্ভাবনার শেষ তো সেখানেই নয়—সুধাকান্ত আবার যে নূতন উইল করতে চান। তিনি না চাইলেও গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে তাই করাতে চান। যে-কোন কারণেই হোক সুধাকান্ত এখন সম্পূর্ণভাবে ঐ গুরুদেবটির করতলগত। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়, গুরুদেবও তেমনি অনিবার্যভাবে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সুধাকান্তকে। সুধাকান্তের যেন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা, শুভবুদ্ধি বলে কিছু নেই, তিনি যেন কলের পুতুল। ফলে দু-চার দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ সুধাকান্তের সই করার ক্ষমতা লুপ্ত হবার আগেই ঐ গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে উইলটি পালটিয়ে নিতে চান। আচ্ছা, ইতিমধ্যেই সে দুষ্কর্মটি হয়ে যায়নি তো? হেবো অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সমাধানে এসেছে—না। কারণ মঞ্জুলা দেবীর কাছ থেকে জানা গেছে, ইতিমধ্যে এক ডাক্তারবাবু ছাড়া বাইরের লোক কেউ আসেনি এ বাড়িতে। উইল পালটাতে হলে সাক্ষী চাই। গুরুদেব সাক্ষী হলে চলবে না। কেবলানন্দ সাক্ষী হলে সেটা খুব জোরদার হবে না। ডাক্তারবাবু যখন আসেন তখন ঠাকুর ব্যাগ হাতে ঘরে থাকে। ফলে উইলটা এখনও পালটানো হয়নি। সাক্ষীর অভাবই তার প্রমাণ। কলকাতা থেকে আসবার সময় নকুলচন্দ্রের কাছ থেকে হেবো আইনের ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিয়েছে। নকুলচন্দ্র নামকরা উকিলের মুহুরি ছিলেন—আইন ভালরকমই জানেন তিনি। আইনঘটিত খিটিমিটিগুলো বুঝে নিয়েছে বলেই হেবো জানে, একটা জোরদার সাক্ষী না রেখে গুরুদেব উইলটা পালটাবার ব্যবস্থা করবেন না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে হেবো তার নোটবই বার করে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছকে ফেলল ঃ

নিম্নলিখিত উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব ঃ

১। নূতন উইল যদি সুধাকান্ত না করতে পারেন—

(ক) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের আকস্মিক মৃত্যু—

(তাহলে তাঁকে খুন করতে হয়—অসম্ভব !)

(খ) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের সই করবার ক্ষমতা লোপ—

(তা কেমন করে সম্ভব ?)

২। নূতন উইল যদি আইনত সিদ্ধ না হয়—

(ক) যদি সাক্ষী না থাকে—

(গুরুদেবটি খলিফা ব্যক্তি—সাক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করবেনই।)

(খ) সুধাকান্তের সই যদি না মেলে—

(অসম্ভব—যেহেতু তিনি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় সই করছেন।)

(গ) যদি আইনের অন্য কোন খুঁত থাকে—

(অসম্ভব—সুধাকান্ত আইনজ্ঞ লোক।)

(ঘ) যদি প্রমাণ করা যায় সুধাকান্তের মানসিক স্থৈর্য ছিল না—

(প্রায় অসম্ভব—কারণ তিনি যে পাগল নন তা সুপ্রতিষ্ঠিত।)

৩। নূতন উইল যদি গুরুদেব উপস্থাপিত করতে না পারেন—

(ক) গুরুদেব যদি মারা যান—

(তাহলেও লাভ নেই—গুরুদেবের ওয়ারিশ সম্পত্তি পাবে।)

(খ) উইল যদি হারিয়ে যায়—

(অসম্ভব—গুরুদেব ওটা সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করবেন।)

(গ) উইল যদি চুরি যায়—

(একমাত্র সম্ভাবনা—গুরুদেবের সঙ্গে শার্লক হেবোর বুদ্ধির রণাঙ্গণে দ্বৈরথ সমরের ফলাফলই এর জবাব দিতে পারে।)

যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার উপক্রম করছে, হঠাৎ মনে হল কে যেন তার দরজায় টোকা দিচ্ছে। টপ্ করে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে

হেবো। কে ডাকছে তাকে। সন্তর্পণে দরজা খুলে দেখে অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে কেবলানন্দ।

'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

কেবলানন্দ গুরুদেবকে 'বাবা' ডাকে।

'উনি এখনও ঘুমোননি ?'

'না, এখনও তাঁর সেবা হয়নি।'

সেবা হয়নি ? কার সেবা হয়নি ? হেবো কোন কথা বলে না। ওর পিছনে-পিছনে চলে আসে শত্রুশিবিরে—গুরুদেবের ঘরে। এতক্ষণে মালুম হয় 'সেবা' জিনিসটা কী। গুরুদেব নৈশ আহারে বসেছেন। কার্পেটের একটা বড় আসন বেমালুম হারিয়ে গেছে তাঁর বিশাল বপুর অন্তরালে। তাঁর সামনে একটা বড় পাথরের থালায় স্তূপাকার করা গব্য ঘিয়ে ভাজা লুচি। পাশে ম্যাগনাম-সাইজ একটা জামবাটিতে। মাংস—খুড়ি! মহাপ্রসাদ। রূপার একটি মাঝারি বাটিতে দেড়পো আন্দাজ ঘন ক্ষীর, আর রেকাবিতে খান-আষ্টেক সরপুরিয়া। আরও তিন-চারটে বাটিতে নানান ব্যঞ্জন। এই হচ্ছে বাবাজীর নৈশ 'সেবা'!

হেবো এবার আর ছদ্মভক্তিভরে নয়, সত্যিই ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। পঞ্চাশ বছর বয়সে যিনি এই পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করবার সাহস রাখেন তিনি নমস্য বইকি!

গুরুদেব ওকে সামনের আসনে বসতে বললেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। ওঁর সেবার রকম-সকম থেকে এমনিতেই সে ধপ্ করে বসে পড়েছিল।

মধুর হেসে গুরুদেব বলেন, 'আহারাদি হয়েছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গুরুদেব হেবোর হাতে একটি নির্মাল্য দিয়ে বলেন, 'এই জবাফুলটি সব সময় কাছে কাছে রাখবে। ভয় নেই, ভালভাবেই পাশ করে যাবে তুমি। আর হ্যাঁ, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস করে কমলালেবুর সরবত খাবে। রাত জেগে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে তো! ওতে পিত্ত প্রকুপিত হতে পারে না।'

হেবো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। চৈত্র মাসে কমলালেবু কোথায় পাবে প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

গুরুদেব বলেন, 'বাবা কেবল, ওকে এক গ্লাস সরবত দাও।'

কেবলানন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে যায়। কুঁজো থেকে ঢেলে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল কাঁচের গ্লাসে করে হেবোর সামনে রাখে। ব্যাপারটা হেবো বুঝতে পারে না। ওর সে অবাক চাহনি দেখে গুরুদেব হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'ওহো তাইতো', ওটা তো সাদা জল! দাও গ্লাসটা আমাকে।'

গুরুদেব নিজেই গ্লাসটা টেনে নেন। একটা গামছা দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেন। তারপর সেই গামছার ভিতর ডান হাতটা ঢুকিয়ে জলটা স্পর্শ করেন। যেন কিছুই হয়নি। এইভাবে এবার গামছাটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, 'নাও, এবার খাও!'

স্তম্ভিত হয়ে যায় হেবো। ওর সামনে একগ্লাস কমলা রঙের সরবত! কথা ফোটে না ওর মুখে। দু-এক মিনিট কেটে যাবার পর সম্বিৎ ফিরে পায় একটা



এই জবাফুলটি সব সময় কাছে কাছে রাখবে

অট্টহাসি শুনে। শুনতে পায় গুরুদেব বলছেন—'ওরে ও কেবল, আর-একটা খালি গ্লাস দে বাবা। বেচারি ভয় পাচ্ছে। গাঁয়ের ছেলে তো! হাঁসখালি গাঁ ছেড়ে বাইরে আসেনি কখনও বোধহয়।'

যন্ত্রচালিতের মত কেবলচন্দ্র আর একটা খালি গ্লাস এগিয়ে দেয়। কিছুটা সরবত সে-গ্লাসে ঢেলে নিয়ে গুরুদেব অম্লান বদনে সেটা এক নিশ্বাসে পান করেন। বলেন, 'খেয়ে নাও বাবা বটুক। ওতে বিষ মাখানো নেই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে হেবো সরবতটা খেয়ে ফেলে। চমৎকার কমলালেবুর সরবত!

ইষ্টদেবকে নিবেদন করে গুরুদেব এবার সেবায় মনোনিবেশ করেন। কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে হেবো। বোঝে, কঠিন বিচ্ছুর পাল্লায় পড়েছে সে এবার। মন্ত্রশক্তিতে সে এতদিন বিশ্বাস করত না। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসব বিভূতির খেলা দেখাতে পারেন শুনেছিল আগে—কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, এইমাত্র যা দেখল তা সত্যই অলৌকিক ক্ষমতা না সস্তা মাদারির খেল্—ম্যাজিক। কিন্তু গুরুদেব তাকে চিন্তা করবার অবকাশ না দিয়েই বলে ওঠেন: 'তোমার তো সায়েন্স, নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা বলে বাঙলা ইংরাজি দুটোকে যেন উপেক্ষা কোরো না; জান তো ঐ দুটোতেই সায়েন্সের ছেলেরা বেশি ফেল করে। বাঙলায় কেমন নম্বর পেয়েছিলে টেস্ট পরীক্ষায়?'

হেবো অম্লান বদনে বলল, 'বাষট্টি।'

লুচি দিয়ে মহাপ্রসাদের ছটাকখানেক ওজনের একটি কণিকা জড়িয়ে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে গুরুদেব বলেন, 'এসে কী লিখেছিলে?'

'এসে?'

'হ্যাঁ গো, এসে—মানে প্রবন্ধ। বাঙলা সেকেণ্ড পেপারে প্রবন্ধ থাকে না তোমাদের?'

গুরুদেব কি টিউশানি করেন নাকি? মায় সেকেণ্ড পেপার পর্যন্ত জানা আছে তাঁর? সামলে নিয়ে বলে, 'ও এসে! আমাদের 'এসে' ছিল, "তোমার প্রিয় লেখক"।'

দাঁতের ফাঁক থেকে মহাপ্রসাদের একটা কুচি বার করবার চেষ্টা করতে করতে গুরুদেব বলেন, 'অ। তা কী লিখেছিলে তুমি? কে তোমার প্রিয় লেখক?'

'আজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছিলাম।'

'আশ্চর্য!'

আশ্চর্য হয় হেবোই। এতে আশ্চর্যের কি আছে রে বাবা? বলেও সে কথা—'কেন, আশ্চর্য মনে হচ্ছে কেন?'

'আমাকে যদি কেউ ও প্রশ্ন দিত—আর আমি যদি তোমার বয়সী ছেলে হতাম, তাহলে আমি লিখতাম—কনান ডয়েল!'

২৫০ 14629

কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে হেবোর। লোকটা 'থট রীডিং' জানে না-কি? মানে হেবোর মনের কথাও ও লোকটা বুঝতে পারছে নাকি? না হলে হঠাৎ কনান ডয়েলের নাম আসে কোথা থেকে? একটা উল্টো চাল চালতে হেবো বলে—'কনান ডয়েল কে? কোন সাহেব?'

মহাপ্রসাদের একটি টেংরি চুষতে চুষতে গুরুদেব বলেন, 'স্যর আর্থার কনান ডয়েল হচ্ছেন শার্লক হোমসের সৃষ্টিকর্তা।'

হেবো এবার স্পিক্‌-টি-নট্‌! কেঁচো খুঁড়তে আবার কোন্‌ সাপ বেরুবে কি জানি! দু-চার মিনিট কোন কথা নেই। হেবো বসে বসে ঘামছে। গুরুদেব নিমীলিত নেত্রে হাড় চুষছেন। হঠাৎ আবার তিনি হাসি-হাসি মুখে বলেন, 'কই তুমি তো বললে না শার্লক হোমস্‌ কে? তিনি কোন সাহেব নাকি?'

হেবো এবারও কোন সাড়াশব্দ করে না।

হঠাৎ চোখদুটি খুলে গুরুদেব বলেন, 'ওহো, তোমার একখানা বই নিয়ে এসেছিলাম। দেখা হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে যাও তুমি।—কেবল বাবা—'

আর কিছু বলতে হল না। কেবলানন্দ গুরুদেবের ঝোলা ঝেড়ে একখণ্ড টেস্ট পেপার এনে হেবোর হাতে দেয়। আবার চোখ বুজে লুচি-মাংসের সেবা করতে করতে গুরুদেব বলেন, 'বাবা বটু, ঐ গ্রন্থের পাঁচশো একত্রিশ পৃষ্ঠাটা খোল তো একবার।'

হেবো দুরু-দুরু বক্ষে নির্দেশমত পৃষ্ঠাটা খোলে। গুরুদেব নিমীলিতচক্ষু অবস্থাতেই বলেন, 'ওটা হাঁসখালি স্কুলের বাঙলার সেকেণ্ড পেপার। তাই নয়?'

হেবো জবাব দেয় না।

'ছয় নম্বর প্রশ্নটা এবার দেখ। মনে কর তুমি এবার হাঁসখালি স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছ। তোমার সামনে তিনটি অলটারনেটিভ 'এসে' আছে—বাংলার বর্ষাকাল, সংবাদপত্র আর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা। কোন্‌টা লিখবে তুমি?'

খাচ্ছেন গুরুদেব, অথচ গলাটা বুজে গেছে হেবোর। কি বলবে ভেবে পায় না। আবার দু-চার মিনিট আহারপর্ব চালিয়ে ক্ষীরের বাটিটা টেনে নেন গুরুদেব। হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে সেইভাবে বলে ওঠেন, 'ওহো! কী ভুলো মন দেখ আমার! তোমাকে বলছি—মনে কর তুমি হাঁসখালি স্কুলের ছাত্র! মনে করার কী আছে, তুমি তো সত্যিই তাই। নয়?'

হেবো ভাবছিল একগ্লাস জল পেলে খেত।

'আচ্ছা থাক। এবার ঘরে যাও তুমি। সামনে পরীক্ষা, রাত জাগা ঠিক নয়।'

হেবো এবার আর প্রণাম করে না। মাথাটা নিচু করে টেস্ট পেপারখানা বগলদাবা করে রওনা দেয়। দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েছে, পিছন থেকে গুরুদেব ডাকেন—'বাবা হেবো!'

'আজ্ঞে?'—ঘুরে দাঁড়ায় হেবো।

এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে সে। কিন্তু উপায় নেই, ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে যখন তখন আর কী করা যায়! তবু যতদূর সম্ভব ম্যানেজ করে নেবার চেষ্টায় বলে, 'আমাকে হেবো বলে ডাকলেন যে? আমার নাম বটু।'

'ওহো! তাই তো! আমার ভারি ভুলো মন। হেবো তো তোমার নাম নয়, শার্লক হোমসের কথা ভাবতে ভাবতে আমি হেবোর কথা ভেবে ফেলেছি! তুমি তো বটুক,—হেবো হবে কেন? তুমি তো হাঁসখালি স্কুলের পাতিহাঁসের মতো লক্ষ্মী ছেলে—আর হেবোটা হচ্ছে একটা হাড়-বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান!'

কানদুটো লাল হয়ে ওঠে হেবোর। উপায় নেই। এ অপমান তাকে সহ্য করে যেতে হবে। আজ সে হেবো নয়, সে বটুকনাথ বটব্যাল। মনে মনে ভাবে, শিশুপালের শত গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে। সেও করবে। তারপর শিশুপাল-বধের সময় হবে এর কড়ায় গণ্ডায় শোধ। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আর কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ বাবা ব্যাটবল, বলব। তুমি প্রবীরকে চেন? প্রবীর মুখুজ্জে?'

ধরা যখন পড়ে গেছে তখন আর তাস লুকিয়ে লাভ নেই। সম্মুখ রণক্ষেত্রেই শিশুপাল-বধ করতে হবে তাকে। আর আত্মগোপন নিরর্থক। বললে, 'হ্যাঁ চিনি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'পবুকে বোলো, মহাভারতের অভিমন্যু-বধ অধ্যায়টা পড়তে। বোলো আমি বলেছি—মহারথীতে মহারথীতে যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে অভিমন্যুর মতো চ্যাংড়াকে বলি দিতে পাঠাতে নেই। বড় করুণ ঐ অভিমন্যুর চ্যাপ্টা হয়ে যাবার চ্যাপ্টারটা নয়?'

আর সহ্য করতে পারে না হেবো। সে তো আর শ্রীকৃষ্ণ নয়! ভীমসেনও

পারেনি কীচককে ক্ষমা করতে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বধ করে ফেলেছিল কীচককে। বললে, 'আপনার বাবা বেঁচে আছেন?'

সরপুরিয়া চিবানো বন্ধ হয়ে যায় গুরুদেবের, চোখদুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, 'আছেন, কিন্তু কেন হে ছোকরা? সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন?'

'না, তাই বলছিলাম। তাঁর জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার।'

চর্বণ-কার্য বন্ধ হয়ে গেছে গুরুদেবের।

হেবো দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'দেখুন আপনি বিচার করে। রথী মহারথীর মধ্যে লড়াই হচ্ছিল—অভিমন্যু বয়সে ছোট, তবু ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সে। লড়াইয়ে সেও প্রাণ দিল, তাতে দুঃখ নেই। মরল বেটা জয়দ্রথও। তারও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু ও চ্যাপ্টারের সবচেয়ে করুণ অধ্যায় কী জানেন? খামোখা ঐ পাষণ্ড জয়দ্রথের বাপ বেচারির মুণ্ডু গেল উড়ে।'

বলেই অ্যাবাউট টার্ন!

এবং তৎক্ষণাৎ ফরোয়ার্ড মার্চ!

যতটা কঠিন মনে হয়েছিল সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কঠিন। কঠিন এবং জটিল। গুরুদেব লোকটি পাক্কা খলিফা! খলিফার চেয়েও বড়, একটি ধড়িবাজ ঘড়িয়াল! হেবোর নাড়ী-নক্ষত্র বেটা জেনে ফেলেছে। হয়ত প্রবীরকাকুর পেছনে ওর গুপ্তচর ঘুরছে। হয়ত লোকটা একটা পাক্কা আঁধারের কারবারী। এত দুঃখেও একটু গর্ববোধ না করে পারল না হেবো। তাহলে অন্ধকার মহলের কারবারীরাও শার্লক হেবোকে চিনতে শুরু করেছে!

কিন্তু উপস্থিত সমস্যাটার কী করা যায়? আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার আগে হেবো তার নোটবইতে চতুর্থ সম্ভাবনার কথাটাও লিখে রাখল ঃ

(৪) নতুন উইল করবার আগেই যদি সুধাকান্তের চেতনা ফেরে ঃ

ক। যদি তখন গুরুদেব-বাবাজির স্বরূপটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় (কঠিন কাজ!)

খ। যদি মঞ্জুলা দেবী আর তাঁর সন্তানকে তিনি ভালবেসে ফেলেন। (বাবাজি বেঁচে থাকতে?)

* * *

পরদিন সকালে হেবো লক্ষ্য করল একটা সিল্কের চাদর কাঁধের উপর ফেলে নাটের গুরু তাঁর ঝোলা ও লাঠি নিয়ে কোথায় চলছেন হুড়মুড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ চটিটা পায়ে গলিয়ে হেবোও নেমে আসে উপর থেকে। গুরুদেব গেট খুলে বাইরে এসে একটা রিক্‌শা ভাড়া করে কোথায় যেন রওনা হয়ে পড়লেন। হেবো স্থির করল—ওঁকে অনুসরণ করতে হবে। কোথায় যাচ্ছে লোকটা? উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয় একটা রিক্‌শাকে ইঙ্গিত করামাত্র দাড়িওয়ালা একজন রিক্‌শাওয়ালা এগিয়ে এল।

'কোথায় যাবেন বাবু?'

রিক্‌শায় উঠে বসে হেবো বললে, 'ঐ রিক্‌শাটার পিছু-পিছু চল।'

রিক্‌শাওলা ওকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয়। আগের রিক্‌শাখানা প্রায় পঞ্চাশ ফুট সামনে চলেছে। গুরুদেব ওকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেননি। কোথায় চলেছেন উনি? গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়েই সোজা উত্তরমুখো বাঁক নিল। হেবোর রিক্‌শাখানা কিন্তু বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

হেবো ব্যস্ত হয়ে বলে, 'একি? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

মুখটা না ফিরিয়েই রিক্‌শাওলা বলে, 'এখানে নেমে ফিরে যাও। আমিই ফলো করছি ওকে।'

হেবো অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! ঐ একমুখ দাড়িওয়ালা রিক্‌শাচালককে সে পর্যন্ত চিনতে পারেনি! হেবো নেমে পড়ে সেখানেই। উত্তরমুখো ঘুরে প্রবীর-চন্দ্রের রিক্‌শাখানা দ্রুতগতি এগিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে।

সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি হেবো হাজিরা দিল প্রবীরচন্দ্রের বোর্ডিং-এ। শুনল গুরুদেব সকালবেলা গিয়েছিলেন পোস্ট অফিসে। একখানি টেলিগ্রাফ করেছেন তিনি। প্রবীরচন্দ্র অনেক কায়দা করে জেনে এসেছেন, সেখানি গেছে কলকাতার একটি সলিসিটর ফার্মের নামে। মিস্টার জি. এন. দে অ্যাডভোকেটকে গুরুদেব আগামী শুক্রবার আসতে অনুরোধ করেছেন।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'বুধবার অর্থাৎ পরশুদিনের মধ্যেই আমাদের যা হয় করতে হবে। দে-সাহেব হচ্ছেন ওঁর আশ্রমের অ্যাটর্নি। উইলে সাক্ষী থাকতে আসছেন তিনি।'

হেবো বলে, 'কলকাতায় গিয়ে যদি দে-সাহেবকে সব কথা খুলে বলা যায়?'

'তাহলেও লাভ নেই। তিনি ওঁর অ্যাটর্নি—ওঁরই স্বার্থ দেখবেন। তাছাড়া

কাজটা বে-আইনী তো হচ্ছে না কিছু। সুধাকান্তবাবুর স্বাধীন ইচ্ছায় তুমি আমি বাধা দেবার কে ?'

'তাহলে ?'

'তাই তো ভাবছি। আর তো সময় নেই। কী করা যায় ?'

হেবো ফিরে আসে তার ঘরে। একবার চেষ্টা করে সুধাকান্তের সঙ্গে দেখা করবার, চতুর্থ সম্ভাবনার সূত্রটা টিকবে কি না পরীক্ষা করতে ; কিন্তু কেবলানন্দ দরজায় পাহারা বসে আছে। ভিতরে ঢুকতেই দিল না সে।

ডাক্তার নবীনচন্দ্র এ শহরের নামকরা ডাক্তার। সুধাকান্তের পরিবারের সব কথাই জানেন। শেষ পর্যন্ত হেবো তাঁরই শরণাপন্ন হল। ডাক্তারবাবুর চেম্বারের শেষ রুগীটি বিদায় নিলে এগিয়ে এল হেবো। বলল তার কথা, মানে সুধাকান্ত-বাবুর উইলের কথা। শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, 'কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছি না !'

হেবো নিজের প্রকৃত পরিচয়ই দিল, অর্থাৎ মঞ্জুলা দেবী ওর কাকিমার ছোট বোন।

ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'সবই তো জানি বাবা ; কিন্তু আমি কী করতে পারি ? জেনে-শুনে বিষ তো আর খাওয়াতে পারি না !'

তা ঠিক। ফিরে আসে হেবো।

সারারাত ঘুম হল না বেচারির। হেরে যাবে সে ? অমন একটা ধড়িবাজ বদ-মায়েসের খপ্পর থেকে একটি বিধবা আর তাঁর নাবালক ছেলেকে রক্ষা করতে পারবে না ? লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, সম্ভবত মন্ত্র-তন্ত্রও জানে। সুধাকান্তকে হয়ত সে সম্মোহিত করে ফেলেছে। একটা রক্তচোষা বাদুড় যেমন দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে শিকারকে শেষ করে দেয়—এই পরিবারটিকে গুরুদেব তেমনি সস্নেহে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছেন। শেষ বিন্দু রক্তটি নিঃশেষ হবার আগে তিনি নড়ছেন না।

সারারাত ছটফট করতে করতে ভোর রাত্রের দিকে একটা সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষীণ আভাস এল ওর মাথায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। গত বছর দোলের দিনের কথা। চট করে উঠে বসে হেবো। আলোটা জ্বালে। দোল কী মাসে হয় ? ফাল্গুন ; অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল। নোটবইটা খোলে—হ্যাঁ, নোটবইতে টোকা আছে ঘটনাটা। এইতো একটা নূতন সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া গেছে ! গেছে কি ? খুব

কঠিন কাজ। ভাগ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ভাগ্য তো তাদেরই সহায়তা করে যারা পুরুষকারকে কাজে লাগায়।

অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতে থাকে। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে কার্যক্রমের সোপানগুলি সাজিয়ে নেয় মনে মনে। প্রথম কাজ কী ? কি কি বাধাবিঘ্ন দেখা দিতে পারে ? কি কি তার সমাধান ? তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কোন্ কোন্ বিপত্তি আসতে পারে ?

হঠাৎ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। সকাল হয়ে এসেছে। ভোরবেলা একটা লোকাল ট্রেন আছে—কলকাতা যাওয়ার। ঐ ট্রেনেই যেতে হবে তাকে। প্রবীরচন্দ্রকে খবর দেওয়ার সময় নেই, প্রয়োজনই নেই। তারও আর পাহারা দেওয়ার কোন দরকার নেই। শুক্রবারের আগে যখন উইল লেখা হবে না তখন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কী হবে ?

ভোরের ট্রেনেই হেবো ফিরে এল কলকাতায়। এল ওদের বাড়িতে। বাবা মা এখনও ফিরে আসেননি, বাঁচা গেল। কাকাও বাড়ি নেই—কোথায় যেন বেরিয়েছেন। কাকিমা ওকে দেখে বললেন, 'কী হল রে হেবো, খবর কী ?'

'শিগ্‌গির আমাকে কিছু টাকা দাও দেখি !'

'টাকা ? কত টাকা ? কি করবি ?'

'কি করব তার ফিরিস্তি শুনে কী হবে ? কিন্তু তুমি কি ভেবেছিলে এ কাজ একেবারে ফোকট্‌সে হয়ে যাবে ? আমার প্রফেসনাল ফিজ তো আমি দাবিই করছি না। প্রথমত, এখনও আমি প্রফেসনাল নই, দ্বিতীয়ত এটা ঘরোয়া কাজ। তোমার কাছে আবার ফি নেব কী ? তবু হাত-খরচা তো আছে।'

'কত টাকা লাগবে বল্ !'

'আপাতত গোটা-পঞ্চাশ ছাড়।'

'মঞ্জুলা কেমন আছে ?'

'ও সব খেজুরে আলাপ পরে হবে কাকিমা। তাড়াতাড়ি টাকাটা দাও। শিশুপাল-বধ যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে।'

'শিশুপাল-বধ যজ্ঞ ! কি সব বলছিস তুই !'

'আচ্ছা না হয় কীচক-বধ পালাই হল। দাও টাকাটা।'

'তোর একটা কথাও বুঝি না বাপু। আসল কথা বল। তায়ইমশাইকে বোঝাতে পারলি ?'

'তায়ইমশাই মানে ঐ বুড়োটা তো ? ওর ভীমরতি সারবার নয়! বাহাত্তুরে ধরেছে আর কি।'

'তাহলে ?'

'পারি না আর বক-বক করতে !'

'বেশ, নে বাপু !'

রাগ করেই টাকা কটা বার করে দেন কাকিমা। আর সেটা পকেটস্থ করেই বেরিয়ে যায় হেবো। চুনো-পুঁটি তো নয়, ঘাই-মারা রাঘববোয়াল সে ছিপে গেঁথে তুলতে চায়। সুতোর জোর থাকা চাই ; টোপটা শুধু লোভনীয় নয়, নিখুঁতও হওয়া চাই। একটু সন্দেহ হলেই রাঘববোয়াল টোপ ঠুকরে ফিরে যাবে—কপাৎ করে গিলবে না।

কৃষ্ণনগরে ফিরে আসে হেবো সেই রাত্রেই।

পরদিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ডাক্তারবাবু যখন সুধাকান্তকে দেখতে এলেন তখন গুরুদেব বাড়ি ছিলেন না। হেবো গুটি-গুটি ঢুকল ঐ ঘরে। সুধাকান্ত বেশ সুস্থই আছেন। উঠে বসেছেন তিনি। হেবো তাঁর বালিশটা ঠিক করে দেবার অছিলায় দেখে নিল, বালিশের নিচে লোহার সিন্ধুকের চাবির থোকাটা আছে। আর আছে একটা খাম, মুখটা ছেঁড়া। দেখেই বুঝতে পারে, এর গর্ভেই ছিল আগেকার উইলটা। তার মানে, আগেকার উইলটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেন, 'ব্লাড প্রেশার দেখার যন্ত্রটা নিচে আমার গাড়িতে আছে। নিয়ে এস তো !'

হেবো শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে জানলার দিকে সরে যায়। জানলার পাশেই সুধাকান্তের লেখবার টেবিল। কিছু ফাইল পত্র, কাগজ-চাপা, বই, কলম-দানিতে কলম, ব্লটার ইত্যাদি সাজানো। হেবো সরে যায় টেবিলের দিকে।

হেবো শুনতে পায়নি মনে করে কেবলানন্দই নিচে নেমে যায় রক্তচাপ মাপবার যন্ত্রটা আনতে। মিনিট আড়াই তিন লাগবে ওর ফিরে আসতে, এর মধ্যেই হেবোকে হাতসাফাই করতে হবে ; কিন্তু সুধাকান্ত জেগে বসে আছেন। ডাক্তারবাবুও এদিকে ফিরে বসে আছেন। তবু শেষ চেষ্টা করবে হেবো।

হ্যাঁ, তিন মিনিটের মধ্যেই কেবলানন্দ ফিরে এল বাক্সটা নিয়ে। পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

সুধাকান্ত বলেন, 'কি হে ডাক্তার, অত গোমড়া মুখ করলে কেন? সময় কি একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে?'

'না না, তা কেন? তবে প্রেশারটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। রাত্রে ঘুম হয়েছিল?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুধাকান্ত বলেন, 'আর চব্বিশ ঘণ্টা টিকব তো?'

'সে কি কথা? অনেক দিন বাঁচবেন এখনও!'

'বাজে কথা বোলো না ডাক্তার। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবই বুঝছি আমি। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা না করে যেতে পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না। আগামীকাল আমি উইল করব স্থির করেছি। তাই বলছি, আজ রাত্রের মধ্যে কিছু হবে না তো?'

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন এই প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিটির কাছে গোপন করার কিছু নেই। বলেন, 'না, সে-রকম কিছু ভয় করার নেই।'

'তাহলেই হল। বেশ, কাল তাহলে এই সময় এসে আমার উইলে সাক্ষী হিসেবে একটা সই দিয়ে যেও। আমি যে সুস্থ মনে এ উইল করেছি তার একটা প্রমাণ থাকা দরকার। ডাক্তারের সইটা থাকা ভাল।'

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আসব।'

হেবো ইতিপূর্বেই তার নোটবইতে ২ (ক) সূত্রটা কেটে দিয়েছিল গুরুদেব টেলিগ্রাম করেছেন শুনে। এখন মনে মনে ২ (খ) সূত্রটাও কেটে দিল। একে একে সব সম্ভাবনাগুলিই নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নেন।

হেবো ঠাকুর দেবতাকে বড় বেশি ডাকে না। পরীক্ষার ঠিক আগে তাঁদের মনে পড়ে বটে—কিন্তু বছরের আর বাকি কটা দিন তাঁদের কথা বিশেষ মনে থাকে না। আজকের দিনটা কিন্তু ব্যতিক্রম। ডাক্তারবাবু চলে যেতেই সে ছুটে চলে আসে তার ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মনে মনে বলে, 'হে মা কালী! তুমিই বল, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি? আমি নিত্য ডাকাডাকি করে তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাই না—আর ঐ গুরুদেব রোজ সকাল-সন্ধ্যা তোমাকে পাঁঠার

মাংস খাওয়াতে চায়। কিন্তু তাই বলেই কি তুমি ও-দলে যোগ দেবে? যে টোপ পেতে এলাম, ঐ রাঘববোয়াল যেন সেটা গিলে ফেলে—এইটুকুই তুমি কোরো মা! বাকি খেলিয়ে তোলার দায়িত্ব আমার। আর ওকে দিয়ে যদি টোপটা তুমি না গেলাও, তবে বলব তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে!'

* * *

শুক্রবার সকালে হেবোর ঘুম ভাঙল একটা চেঁচামেচিতে। কাল রাত্রে নাকি বাড়িতে চোর এসেছিল। কি আশ্চর্য! স্বয়ং শার্লক হেবো যে বাড়িতে উপস্থিত সে বাড়িতে চোর? অথচ হেবো রাত্রে কিছু টেরই পায় নি? সকালবেলা কেবলানন্দ প্রথম লক্ষ্য করে, সিঁড়ির দরজাটা খোলা। গুরুদেব ঘরের দরজা খুলে শোন দক্ষিণা বাতাসের লোভে। হেবোও দরজা খুলে শোয়। সুধাকান্তের ঘর অবশ্য ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। সে ঘরে মেঝেতে শোয় কেবলানন্দ। পরীক্ষা করে দেখা গেল চোর একতলা থেকে কিছুই সরায়নি, দোতলার দুটি ঘর থেকেই মাল সরিয়েছে। হেবোর স্যুটকেস নেই, গুরুদেবের ঝোলাটিও নেই। গুরুদেব দারোয়ানকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। সে হলপ করে বলল—বাইরে থেকে চোর আসেনি, কারণ সে জেগেই ছিল। কিন্তু বাইরের লোক ছাড়া আর কে চুরি করতে পারে? পুলিসে খবর দেওয়া হবে কি না স্থির করার আগেই ঠাকুর এসে খবর দিল, বাগানের ভিতর ভাঙা স্যুটকেস ও ঝোলা পাওয়া গেছে। আবার নূতন করে হিসাব নেওয়া গেল। না, বেশি কিছু খোয়া যায়নি। হেবোর গেছে একটি টেরিলিনের সার্ট আর গোটা-কুড়ি টাকা। গুরুদেবের ঝুলির সব কিছুই প্রায় পাওয়া গেছে। দামী কিছুই ছিল না ওতে। দুটো জিনিস একটু দামী ছিল—দুটোই বেহাত হয়েছে। একটা রুপোর কোশাকুশি আর একটা শেফার্স কলম।

হেবো থানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু গুরুদেব বাধা দিলেন। বললেন, 'যা গেছে তা তো পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু ঠাকুরটাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা। আজ কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অতিথি আসছেন—ঠাকুর না থাকলে মহা মুশকিল।'

মঞ্জুলা দেবীও সায় দিলেন সে কথায়।

হেবো জনান্তিকে মঞ্জুলা দেবীকে বলে, 'আসল কথা গুরুদেবের ভয় হয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। পুলিসের খাতায় হয়ত তাঁর নাম আছে, হয়ত তাঁকেই হাজতে পুরবে পুলিস!'

মঞ্জুলা দেবী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে হেবোর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তাই কি কাল রাত্রে চোর এসেছিল ?'

হেবো বলে, 'তার মানে ?'

'তার মানে, তোমার কোন কারসাজি নয় তো ?'

হেবো বলে, 'কি যে বলেন ! আমারও তো জিনিস খোয়া গেছে।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পুলিসে খবর দেওয়া হল না।

বেলা বাড়ল। বেলা দশটা নাগাদ এসে পেঁছিলেন অ্যাডভোকেট জি. দে। সসম্মানে তাঁকে উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন গুরুদেব। চা-জলখাবারের পর্ব মিটলে বুলডগটাকে দরজার বাইরে বসিয়ে ওঁরা অর্গলবন্ধ ঘরে পরামর্শে বসলেন। হেবো নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগালো। মাঝের দরজার চাবির ফুটোতে চোখ লাগিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কান লাগিয়ে বরং দু-একটা কাটা কাটা কথা শোনা যায়। অ্যাডভোকেট সাহেব বলছেন, 'এবার ড্রাফ্‌ট্‌খানা নিখুঁত হয়েছে ; আমি ফেয়ার কপি করে ফেলি।'

সুধাকান্ত বাধা দিয়ে বলেন, 'না, ফেয়ার কপিটা আমি নিজে হাতে লিখব। আজ বেশ সুস্থ আছি আমি।'

গুরুদেব বললেন, 'কিন্তু তাতে কি কষ্ট হবে না তোমার ?'

সুধাকান্তের হাসিটা চোখে না দেখতে পেলেও অনুভব করে হেবো। তিনি হেসে বলেন, 'কষ্ট হলেও উপায় নেই। আইনের খুঁত আমি রাখব না। আদ্যোপান্ত হাতের লেখাটা আমার হলে আইনগত তার মর্যাদা বাড়বে—না কি বলেন দে-সাহেব ?'

দে-সাহেবের জবাবটা শোনা গেল না ; কিন্তু সুধাকান্তের পরবর্তী বক্তব্যটা শোনা যায়—'দয়া করে আমার ঐ কলমটা দেবেন। নিজের কলম ছাড়া লিখতে পারি না আমি।'

প্রায় মিনিট পনের পরে নিচে গেটের সামনে একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল। কেবলানন্দ হন্তদন্ত হয়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। বন্ধ ঘরে টোকা দিয়ে বলল, 'ডাক্তার-বাবু এসেছেন।'

হেবোও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখে নকুলচন্দ্র আর ডাক্তারবাবু সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসছেন। ওঁদের পিছনে পিছনে ঢুকে পড়ে রোগীর ঘরে। রোগী আজ

বেশ প্রফুল্ল। বলেন, 'ডাক্তার আমাকে আজ বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ দিকি।'

'কেন ? হঠাৎ আজ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে কেন ?'

'আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছি কি না, দেখে বল।'

'ও ! উইলটা করেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, একটা সইও দিতে হবে তোমাকে। নকুল, তুমিও দেবে।'

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করেন। তারপর কোন কথা না বলে উইলখানা টেনে নেন। সমস্তটা ধৈর্য ধরে পড়ে কাগজখানা ফিরিয়ে দেন সুধাকান্তবাবুকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে আপনি মাপ করবেন সুধাকান্তবাবু, আমি এ উইলে সাক্ষী থাকতে পারব না। এ অনুরোধ করবেন না আপনি।'

একটু রুক্ষ স্বরে সুধাকান্ত বলেন, 'কেন ? কারণ কী ?'

'আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ আপনি অত্যন্ত অন্যায় করছেন।'

রুক্ষতর স্বরে সুধাকান্ত বলেন, 'কিন্তু সে বিচারের ভার তো তোমার উপর নেই ডাক্তার ! তুমি ভিজিট নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছ। আমি যে স্বাভাবিক অবস্থায় আছি তার সার্টিফিকেট আমি আইনত দাবি করতে পারি।'

'না, পারেন না ; কারণ আজকের ভিজিট আমি নেব না।'

বাক্স গুছিয়ে উঠে পড়ার উপক্রম করেন ডাক্তারবাবু।

হেবো মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করে ছুটে যায় নিচে। মঞ্জুলা দেবীকে খুঁজে বের করে তাঁর হাতদুটি চেপে ধরে—'সর্বনাশ হয়েছে কাকিমা, একটা কাজ করতেই হবে আপনাকে ! যেমন করে হোক !'

'কী হয়েছে ? অমন করছ কেন তুমি ?'

'ডাক্তারবাবু উইলে সাক্ষী হতে অস্বীকার করেছেন। যেমন করে পারেন তাঁকে রাজী করান !'

কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই প্রশ্ন করেন না মঞ্জুলা দেবী। বলেন, 'বেশ, সেই ব্যবস্থাই করছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন ডাক্তারবাবু গট্-গট্ করে নেমে আসছেন দ্বিতল

থেকে। মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে এগিয়ে আসেন মঞ্জুলা দেবী। বলেন, 'একটা কথা ছিল ডাক্তারবাবু।'

'বল মা।'

'আপনি আপত্তি করবেন না। উইলে আপনি সই দিয়ে আসুন।'

ভ্রু-দুটি কুঁচকে ওঠে ডাক্তারবাবুর, বলেন, 'কিন্তু কেন বল তো মা? উইল তুমি দেখেছ?'

মঞ্জুলা বলেন, 'না, দেখিনি। তবে আন্দাজ করতে পারি। আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই তো?'

'হ্যাঁ; তাই। এতে আমাকে সই দিতে বলছ কেন?'

হেবো ভাবে, এইবার মঞ্জুলা দেবীর আর কোন জবাব নেই। বস্তুত তার মত উপস্থিত-বুদ্ধি-ওয়ালা ছেলের মাথাতেও কোনও ফন্দি বার হল না। কিন্তু হেবো জানত না যে, যারা নিছক সরল ও সহজ তারা অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে যেতে পারে তাদের সারল্যের জন্যেই। যে জবাব হেবোর মুখে জোগায় নি, মঞ্জুলার মুখে তাই জোগাল, আর, সেটা কোন ফন্দি নয়। তাঁর আন্তরিক কৈফিয়তই।

মঞ্জুলা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনি সই না দিলে অন্য কোন ডাক্তারে তা দেবে। শহরে ডাক্তারের অভাব নেই। কিন্তু যতক্ষণ ঐ উইল-পর্ব শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ওঁরা আমাকে বাবার কাছেই যেতে দেবেন না। শেষ সময়ে ওঁর কোন সেবা-যত্নই হচ্ছে না। খোকার বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে থেকেও এজন্য শান্তি পাচ্ছেন না। সম্পত্তি আমি এমনিও পাব না, অমনিও নয়—অন্তত শ্বশুরের শেষ সময়ে সেবা করার অধিকারটুকু আপনি আমাকে দিয়ে যান ডাক্তারবাবু!'

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তারবাবু বলেন, 'তোমার এ কথায় ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি মা! এমন মেয়েরও সর্বনাশ করেন তিনি? কিন্তু তোমার কথাই ঠিক। ও সম্পত্তি তুমি অমনিতেও পাবে না। নির্মলকে আমিও স্নেহ করতাম। তার আত্মাকে তৃপ্তি দাও তুমি। আমি সই দিয়ে আসছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!'

সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে যান তিনি।

হেবো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। নকুলচন্দ্রও সই দিলেন, সেটা পরে জানতে পেরেছিল হেবো।

সব খবর শুনে সন্ধ্যাবেলায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন প্রবীরচন্দ্র।

হেবো বললে, 'কিছু ঘাবড়াবেন না। ঐ উইল নির্ঘাত চুরি যাবে। ফাঁদ পেতে এসেছি আমি।'

প্রবীরচন্দ্র ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।

* * *

পরদিন। শনিবার সকাল। গত রাত্রের শেষ দিকে সুধাকান্তের আবার একটা আক্রমণ হয়েছে। যেন উইলটাতে সই করার জন্যেই তিনি মনের জোরে সুস্থ ছিলেন এতদিন। উইল সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে মানসিক অবসাদ, অমনি শয্যা নিলেন তিনি। শেষরাত্রে আক্রমণটা হয়েছে, অথচ বাড়ির কেউ জানতে পারে নি। পারবে কোথা থেকে! ওঁর ঘরে থাকে কেবলানন্দ। আর কারও সে ঘরে ঢোকা মানা। কেবলানন্দ রাত-ভোর নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে, সকালে সে উঠে জানতে পেরেছে। তাই সাত-সকালেই সোরগোল পড়েছে বাড়িতে। মঞ্জুলা দেবী খবর পেয়ে ছুটে এলেন উপরে। রোগীর ঘর খোলাই ছিল। সুধাকান্ত অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। মঞ্জুলা আর হেবো ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব গর্জন করে ওঠেন, 'আবার তুমি এসেছ উপরের ঘরে! কতদিন না বারণ করেছি। বলেছি না, এ ঘরে আসবে না?

হঠাৎ কি হল মঞ্জুলার! কোথা থেকে দুর্জয় সাহস এল ওর মনে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বললেন, 'বেরিয়ে যান বলছি!'

একেবারে থতমত খেয়ে যান গুরুদেব। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমতা-আমতা করে বলেন, 'কি, এত বড় সাহস!'

মঞ্জুলা হেবোকে বলেন, 'দারোয়ান আর গঙ্গারামকে ডাক তো হেবো, এ দুটো লোককে রোগীর ঘর থেকে বার করে দিতে হবে!'

কাঁপতে কাঁপতে খাট থেকে উঠে দাঁড়ান গুরুদেব। কি করবেন কি বলবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। কেবলানন্দ বাঘের মত থাবা গেড়ে বসে আছে—যেন আদেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মঞ্জুলা এগিয়ে যান সুধাকান্তের মাথার কাছে। বালিশের তলা থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন গুরুদেবের দিকে, বলেন, 'এর জন্যেই প্রাণটা পড়ে আছে তো এ-ঘরে? যান, ওটা নিয়ে চলে যান! বাবার মৃত্যু হলে তখন সম্পত্তির দখল নিতে আসবেন। কিন্তু তার আগে ফের যদি এ ঘরে পা বাড়ান, দারোয়ান দিয়ে আপনার ঠ্যাং ভেঙে দেব আমি! যান বলছি।'

অবাক কাণ্ড! অমন প্রবল প্রতাপান্বিত গুরুদেব যেন একেবারে কেঁচোটি হয়ে গেছেন। চাবির গোছাটি তুলে নিয়ে গুটি-গুটি বেরিয়ে যান ঘর থেকে। পোষ-মানা কাবলি বেড়ালের মত কেবলানন্দ যায় তাঁর পিছু-পিছু।

হেবো এগিয়ে এসে মঞ্জুলা দেবীকে প্রণাম করে।

'কি হল রে? হঠাৎ প্রণাম কিসের?'

'সে আমি বোঝাতে পারব না!'

'শোন্। এক কাজ কর্। ডাক্তারবাবুকে খবর দে।'

কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েও কিছু লাভ হল না।

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন যে আর বড় জোর দু-দিন। এ দু-দিন মঞ্জুলা প্রাণ ঢেলে শ্বশুরের সেবা করলেন। দুর্ভাগ্য সুধাকান্তের। পুত্রবধূর সেবা যে তিনি পেলেন, তা জানতেও পারলেন না। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে মঞ্জুলা একবারও বার হলেন না ঘর ছেড়ে।

গুরুদেবেরও কি হল, এ ঘরে একবারও মাথা গলালেন না। পরের দিন কাউকে কিছু না বলে গুরুদেব কোথায় চলে গেলেন তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে। কেবলানন্দ রয়ে গেল।

হেবো বললে, 'কাকিমা, এবার একবার শেষ চেষ্টা করতে হয়। ওঁর ঘরটা একবার খুঁজে দেখতে চাই, চাবিটা পাওয়া যায় কি না। উইলটা নিশ্চয় ঐ সিন্ধুকেই আছে।'

মঞ্জুলা বলেন, 'ওসব থাক হেবো। একটা মরণাপন্ন মানুষের শিয়র থেকে তাঁর উইল চুরি করতে পারব না আমি।'

'আরে, আপনাকে চুরি করতে কে বলছে? যা করবার তা আমিই করব।'

'না! তাঁর শেষ ইচ্ছায় বাধা দেবার কোন অধিকার ধর্মত আমার নেই।'

হেবো ধমকে ওঠে, 'থামুন তো আপনি! এই যদি ধর্ম হয়, তবে অধর্ম বলে দুনিয়ায় কিছু নেই' আপনাকে কিছু করতে হবে না। শুধু কেবলানন্দকে ঘণ্টা-কয়েকের জন্য এখান থেকে সরিয়ে দিন।'

'তা কেমন করে সরাব আমি?'

'ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলুন ৺আনন্দময়ীতলায় আপনার শ্বশুরের নামে পুজো দিয়ে আসতে।'

'আনন্দময়ীতলাটা আবার কোথায়?'

'বড় জাগ্রত কালী এখানকার। কেবলানন্দ জানে। মায়ের নামে পুজো দেওয়ার কথায় বেটা না বলতে পারবে না। রিকশা করে গেলেও ঘণ্টা-দুয়েক সময় পাওয়া যাবে।'

উইল চুরি করার ব্যাপারে কোন উৎসাহ না থাকলেও ৺আনন্দময়ী মায়ের নামে পুজো পাঠানোতে মঞ্জুলার আগ্রহ ছিল। কেবলানন্দকে সহজেই সরানো গেল।

তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল হেবো। গুরুদেবের ঘরের প্রত্যেকটি স্থান প্রত্যেকটি কোণা তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। বাবাজির একটা ঝোলা আছে, একটি টিনের স্যুটকেস আছে। তালা-বন্ধ নয়। খোলাই। তাড়াতাড়ি করে খুঁজে দেখল হেবো। কা কস্য পরিবেদনা। চাবির থোকা কোথাও নেই।

মঞ্জুলা দেবী এসে বলেন, 'কী পাগল ছেলে তুমি হেবো! গুরুদেব কখনো চাবিটা এ বাড়িতে রেখে যান? সঙ্গে নিয়েই গেছেন তিনি।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, কাকিমা। গোয়েন্দাগিরি যদি একটুও শিখে থাকি তবে নিশ্চিত জানি সেটা তিনি নিয়ে যান নি। এ বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন।'

মঞ্জুলা বলেন 'অসম্ভব !'

'অসম্ভবই মনে হচ্ছে আপনার ! তা-ই হওয়ার কথা ; কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত সু যুক্তির বিশ্লেষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। চাবি আমি খুঁজে পাবই।'

হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন মঞ্জুলা। গুরুদেবের ঘরটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও চাবির থোকা পাওয়া গেল না। হেবো একটু অবাক হল। এমন তো হওয়ার কথা নয় ! তার কি হিসাবে ভুল হল কোথাও ! গুরুদেব তো চাবি নিয়ে যেতে পারেন না। তবে কি তিনি আরও কঠিন কোন চাল চেলেছেন ?

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে আসে হেবো। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, উনি চাবিটা হেবোর ঘরেই রেখে গেছেন ? একবারে বাঘের ঘরে যদি ঘোঘের বাসা হয়ে থাকে ? যদি উনি ভেবে থাকেন হেবো সারা বাড়ি খুঁজবে, কিন্তু নিজের ঘরটা খুঁজবে না ?

কী আশ্চর্য ! যা ভেবেছে তাই। হেবোর ঘরের ভিতর থেকেই উদ্ধার করা গেল চাবির থোকাটা। উপরের একটা কুলুঙ্গিতে পুরনো বইয়ের পিছনে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভিতর থেকে বার হল সেটা। কী ধড়িবাজ লোক ! এক নম্বরের ঘড়েল ! কোন সুযোগে হেবোর অলক্ষিতে তারই ঘরে চাবিটা লুকিয়ে রেখে গেছে।

তৎক্ষণাৎ সুধাকান্তের ঘরে চলে আসে হেবো। কেবলানন্দের ফিরতে এখনও দেরি আছে। মঞ্জুলা দেবী রোগীর জন্য পথ্য তৈরি করতে নিচে গেছেন। ঘরে আর কেউ নেই। সুধাকান্ত অচৈতন্য। দরজাটা বন্ধ করে দেয় প্রথমে। দ্রুতগতিতে লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেলে হেবো। হ্যাঁ, সামনেই রয়েছে সীলমোহরাঙ্কিত খামটা। সেটা বের করে হেবো আবার সিন্দুকটা বন্ধ করে ! খামটা পকেটে ফেলে আবার চাবিটা রেখে আসে সেই ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। আর কালবিলম্ব না করে হেবো তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। এবার কাকা কাকিমার হাতে উইলটা জমা দিতে হবে। বাবা মা হয়ত মধুপুর থেকে ফিরে এসেছেন। সোমবার থেকে স্কুলও খুলবে। আর দেরী করা উচিত নয়। কাজ যখন হাসিল হয়ে গেল তখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

কাকা কাকিমা ওকে দেখে বলেন, 'কিরে হেবো, কি খবর ?'

"হেবো বললে ওয়া গুরুজীকি ফতে !"

'তার মানে ?'

'তার মানে এই সেই অপয়া উইল যত্ন করে রেখে দাও।'

'সে কি রে ? কেমন করে পেলি ?'

'সে অনেক কথা। সুধাকান্ত বাবু এখন অচৈতন্য। ডাক্তার বলেছেন আর তাঁর জ্ঞান ফিরবে না। সুতরাং নূতন করে উইল আর করতে পারবেন না। ব্যস, খেল্ খতম !'

কাকিমা বলেন, 'কিন্তু ওটাকে যত্ন করে রেখে কি লাভ ? পুড়িয়ে ফেলি বরং ওটাকে।'

কাকা বলেন, 'না না, তার আগে খুলে দেখি ওটাই সেই আসল উইল কি না।'

হেবো বললে, 'এখন নয় কাকা ! গুরুদেবকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার চোখের সামনেই ওটাকে না পোড়ালে আমার গায়ের ঝাল মিটবে না ! বেটা বলে কিনা, বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান !'

কাকিমা হেসে ওঠেন, 'কাকে বলেছে রে ? তোকে ?'

'আমাকে বললে তখনই তার নাকটা ভেঙে দিতাম না ? বলেছে অন্য একটা ছেলেকে।'

'তবে তুই অত চটছিস কেন ?'

'সে অনেক কথা।'

'প্রবীরের খবর কি ?'

হেবো চমকে উঠে বলে, 'ঐ যাঃ ! তাঁকে তো খবর দিয়ে আসা হয়নি ! নাঃ ! এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে আমার ! কাকা, আমি আর একবার যাই বরং।'

'তা যা। তবে কালকেই ফিরে আসিস। দাদারাও কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসছেন। প্রবীর বেচারাকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার।'

হেবো আবার রওনা হয়ে পড়ে কৃষ্ণনগর যাবে বলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হেবোর, কৃষ্ণনগরে গিয়ে সে প্রবীরকাকুর দেখা পেল না। কারণ হেবো রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই সুধাকান্ত মারা গেলেন। প্রবীরচন্দ্র খবর পেয়ে হেবোর খোঁজে এসেছিলেন, এবং হেবো কলকাতা চলে গেছে শুনে তিনিও চলে এলেন হেবোদের বাড়িতে।

প্রবীরচন্দ্র যখন পেঁছিলেন তার আগেই সে রওনা হয়ে গেছে। প্রবীরচন্দ্রের কাছে সংবাদ পেয়ে হেবোর কাকা ও কাকিমাও কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রবীরচন্দ্র হেবোর উইল চুরির কথা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ হতেই পারে না ! আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই যে, ঐ ঘড়েল শিরোমণি লোহার সিন্দুকে উইল রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—আর যাওয়ার সময় সেই চাবির থোকাটা রেখে যাবে হেবোর ঘরেই। হেবোর মত পাকা ছেলে এ কথা বিশ্বাস করল কেমন করে ?'

কাকিমা বলেন, 'কিন্তু সে যে উইলটা রেখে গেল আমার কাছে !'

হো-হো করে হেসে উঠে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'নিয়ে আসুন সেখানা, খুলে দেখুন ভিতরে কি মাল আছে ! ওখানা আসল উইল নিশ্চয় নয়। হেবোকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওখানা ঐ হতভাগা বোম্বেটে ওখানে রেখে গেছে। আসল উইল সে সঙ্গে নিয়েই গেছে।'

হেবোর কাকা বলেন, 'আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল।'

বাধা দিয়ে প্রবীর বলেন, 'সন্দেহ হয়েছিল না ঘণ্টা ! তাহলে এতক্ষণ সেটা খুলে দেখেন নি কেন ?'

'হেবোই তো বারণ করলে।'

'বাদ দিন ওসব ছেলেমানুষী ! নিয়ে আসুন সেখানা।'

কাকিমা ভয়ে ভয়ে আলমারি খুলে বন্ধ খামটা নিয়ে আসেন। সীলমোহরগুলি পরীক্ষা করে প্রবীরবাবু বলেন, সীল ঠিকই আছে, তবে ভিতরে কী আছে জানেন ?'

'সাদা কাগজ ?'

'মোটেই নয়। ভিতরে আছে আসল উইলের একটা হুবহু কপি। শুধু সই-গুলো জাল। বেটা জানে যে হেবো এটা চুরি করবে এবং পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর সুধাকান্তের মৃত্যু হলে আমরা যখন বলব তিনি কখনও কোন উইল করেন নি, তখন সকলের নাকের উপর আসল উইলখানা মেলে ধরবেন তিনি।'

কাকা বলেন, 'তবে এখানা খুলে দেখি ?'

'নিশ্চয়ই।' বলে প্রবীরচন্দ্র খুলে ফেলেন খামটা। কাগজের ভাঁজটা খুলে মুখটা লাল হয়ে যায় তাঁর। তাঁর অনুমান সত্য হয়নি। কাগজখানা মেলে ধরেন তিনি। কাগজটায় লেখা ছিল—

'দুঃখ কোরো না বাবা হেবো—থুড়ি বটুক ! হেলে ধরতে হাত পাকিয়েছ বলে কেউটের গর্তে হাত দিতে যেও না। উইলটা সিন্ধুকে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে সেটা সঙ্গে করেই নিয়ে গেলাম। পদুকে দুঃখ করতে বারণ কর।'

কাকা চিৎকার করে ওঠেন—'ছি ছি ছি ! হেবোটা একটা আস্ত গাড়োল !'

প্রবীর বলেন, 'আপনারাও কিছু কম যান না !

মুখ কালো করে বসে থাকেন কাকা।

কাকিমা বলেন, 'সে যা হবার হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধি যে কত তা বোঝা গেছে ! একরত্তি একটা ছেলেকে ঠেলে দিয়ে এখানে বসে সবাই ল্যাজ নাড়ছ ! এতক্ষণে বোধহয় মঞ্জুলাকে ঐ গুরুদেব হাত ধরে পথে বার করে দিয়েছে ! চল তাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করি।'

অগত্যা কাকা কাকিমা আর প্রবীরচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে রওনা হলেন কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে।

সুধাকান্তের বাড়িতে পেঁৗছে দেখেন, রীতিমত একটা জনসমাবেশ হয়েছে।

সুধাকান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শহরের গণ্যমান্য সকলেই এসে হাজির হয়েছেন। মৃতদেহ দাহ করে শ্মশানযাত্রীরাও ফিরে এসেছে।

বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছে। গুরুদেব ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। হেবোও আছে। শহরের প্রবীণ উকিল গণেশবাবু বলছেন, 'শহরে একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল! সুধাকান্তবাবুর সওয়াল শুনতে বার অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ত।'

'অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল ওঁর,' নবীন একজন উকিল বলেন, 'অথচ সেই মানুষেরই শেষ অবস্থায় কী ভীষণ বুদ্ধিভ্রংশ হল দেখুন।'

গণেশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'মুনিদেরও মতিভ্রম হয় হে ঘোষাল, তা সুধাকান্তবাবু তো সামান্য মানুষ।'

জগন্নাথবাবু বলেন, 'কেন? মতিভ্রম কিসের?'

গণেশবাবু বলেন, 'ও, আপনি বুঝি জানেন না? সুধাকান্তবাবু একেবারে শেষ অবস্থায় তাঁর উইল পাল্টিয়ে তাঁর বিধবা পুত্রবধূকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে গেছেন।'

জগন্নাথবাবুও নামকরা প্রবীণ উকিল, সুধাকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্টই। তিনি বলে ওঠেন, 'এ হতেই পারে না! কি নকুলবাবু, এ কথা কি সত্যি?'

নকুলবাবুর সঙ্গে হেবোর চোখাচোখি হয়। হেবোর সঙ্গে তাঁর বোধহয় আগেই কোন কথা হয়ে থাকবে। তিনি অম্লান বদনে বলে বসেন, 'এঁরা অনেকে তাই বলছেন বটে, তবে আমার তো বিশ্বাস হয় না! তাহলে আমাকে তিনি নিশ্চয়ই বলে যেতেন।'

গুরুদেব ফোড়ন কাটেন, 'অথবা সাক্ষী রাখতেন। আপনি কি তাঁর শেষ উইলে গত শুক্রবার সই করেন নি?'

'শুক্রবার? কই? মনে তো পড়ে না।

গুরুদেব হেসে বলেন, 'আমি শুনেছি উইলে আপনারও সই আছে।'

নকুল বলেন, 'ভুল শুনেছেন তাহলে।'

'তা হবে! হস্তরেখাবিদ সে কথা বলতে পারবে।'

হঠাৎ বাধা দিয়ে অ্যাডভোকেট দে-সাহেব বলে ওঠেন, 'না। শেষ সময়ে অর্থাৎ গত শুক্রবার তিনি যে উইল করেছিলেন আমি সে উইলে সাক্ষী হিসাবে সই করেছি; আর—

'আর?'

'আর, জানি না নকুলবাবু কেন অস্বীকার করছেন, তিনি আমার সম্মুখেই সাক্ষী হিসাবে সই দিয়েছিলেন।'

গণেশবাবু বলেন, 'একি সর্বনাশের কথা মশাই! হ্যাঁ নকুলবাবু, ইনি কী বলছেন?'

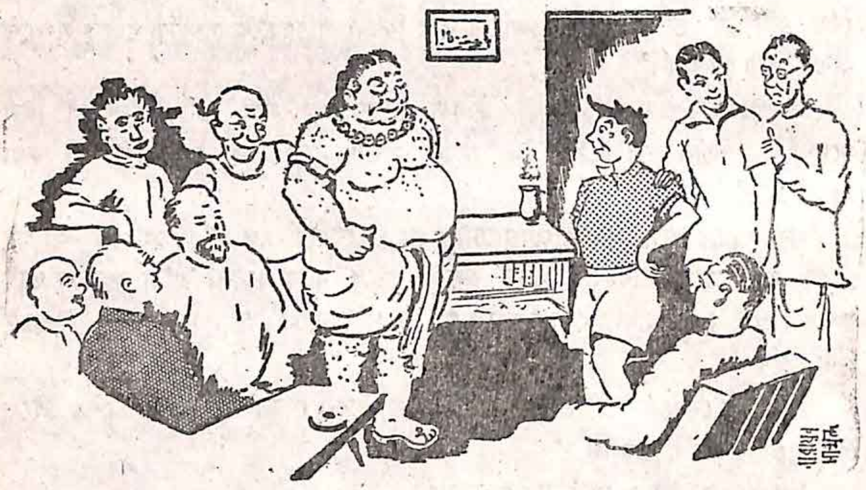
নকুলবাবু আবার একবার হেবোর দিকে দেখে নিয়ে বলেন, 'বেশ তো উইলটা আনা হলেই বোঝা যাবে।'

হেবো উপর-পড়া হয়ে বলে, 'উইল করে থাকলে সুধাকান্তবাবু তা তাঁর লোহার সিন্দুকে রেখে থাকবেন, না কি বলেন গুরুদেব?' গুরুদেব বলেন, 'তা তো বলতে পারি না বাবা, তবে আমার কাছে ঐ সিন্দুকের চাবি আছে। খুঁজে দেখতে পার।'

চাবিটা তিনি দেন হেবোর হাতে।

হেবো হেসে বলে, 'বেশ, আপনারাও তাহলে চলুন, সিন্দুকটা আমরা প্রথমে খুঁজে দেখি।'

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন হেবো একটা প্রচণ্ড ভুল করতে চলেছে। তাই হেবোকে ডেকে বলেন, 'হেবো, শোন। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।'



ওর ডেঁপোমির একটা শিক্ষা হওয়া উচিত

হেবো বললে, 'আসছি প্রবীরকাকা, আগে সিন্দুকটা খুলে দেখে আসি।'

হেবোর কাকা প্রবীরচন্দ্রকে জনান্তিকে ডেকে বলেন, 'বাধা দিও না। যা হবার তা তো হয়েছেই। ওর ডেঁপোমির একটু শিক্ষা হওয়া উচিত!'

সদলবলে ওঁরা উপরে উঠে আসেন। হেবো ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা খুলে ফেলে। ভিতরটা ভাল করে দেখে বলে, 'কই উইল বলে তো কিছু মনে হচ্ছে না। গুরুদেব, আপনি একটু খুঁজে দেখবেন?'

গুরুদেব বলেন, 'না বাবা। আমি তো বলি নি উইল ওখানে আছে। তুমিই বলেছিলে।'

'তবে উইল কোথায় আছে ?' চালের মাথায় প্রশ্ন করে হেবো।

'আমার আছে বাবা। এই দেখ !'

ঝোলার ভিতর থেকে ঠিক একই রকমের একখানি সীলমোহর-করা খাম বার করে তিনি গণেশবাবুর হাতে দেন।

গণেশবাবু সেটি গ্রহণ করে বলেন, 'এইটিই তাহলে সুধাকান্তের শেষ উইল ?'



'এ তো একখন্ড সাদা কাগজ !'

গুরুদেব হেসে বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। খুলে দেখুন। সমস্ত সম্পত্তিই তিনি দেবোত্তর করে গেছেন। আমিই তার অছি। তিনজন সাক্ষী আছেন—এবং নকুলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন।'

গণেশবাবু বলেন, 'নকুলবাবু ?'

নকুলবাবুর চক্ষুস্থির হয়ে গেছে ততক্ষণে, আমতা আমতা করে বলেন—'হেবো !'

হেবো একেবারে পাথরের মূর্তি যেন। কথা নেই তার মুখে। গুরুদেব খুক-খুক করে হেসে ওঠেন।

গণেশবাবু খামটা খুলবার উদ্যোগ করতেই হেবো বাধা দেয়। বলে, 'এতই যদি হল তবে গুরুদেব আপনিই খামটা খুলুন। উইলটা পড়ে শোনান আমাদের।'

গুরুদেবের চোখদুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, 'বেশ, তাই পড়ে শোনাচ্ছি আমি।'

সাবধানে খামটা খুলে ফেলেন তিনি।

কাগজখানা বার করে ভাঁজটা খুলেই কিন্তু চমকে ওঠেন।

এপিট-ওপিট কয়েকবার দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান।

অ্যাডভোকেট দে-সাহেব ঝুঁকে পড়েন কাগজটার উপর। তারপর বলেন—'একি !'

গণেশবাবু বলেন, কি হল ? ব্যাপার কি ?'

গুরুদেবের অবশ হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে এপিট-ওপিট দেখে বলেন, 'এ তো একখণ্ড সাদা কাগজ। উইল কই ?'

গুরুদেব কোন জবাব দেন না। গোল মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেছে তাঁর। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়েছে।

হেবো খুক-খুক করে হেসে ওঠে।

আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না গুরুদেব। ধপ করে বসে পড়েন মাটিতে। গণেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কি হল ?'

হেবো তাড়াতাড়ি বলে, 'আজ্ঞে জয়দ্রথ বধ !'

* * *

সুধাকান্তের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হবে স্থির হল। মঞ্জুলা দেবী ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে চান। শ্বশুর তো তাঁর জন্য সম্পত্তি বড় কম রেখে যান নি ! ভাল করেই খরচ-পত্র করতে মনস্থ করেছেন তিনি।

পরদিনই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে গুরুদেব রওনা হচ্ছেন শুনে হেবো ছুটে এল সিঁড়ির মুখে। দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার শ্রাদ্ধের গুরুবিদায়টা নিয়ে যাবেন না স্যার ?'

গুরুদেব শুধু বললেন, 'জ্যাঠামো কোরো না !'

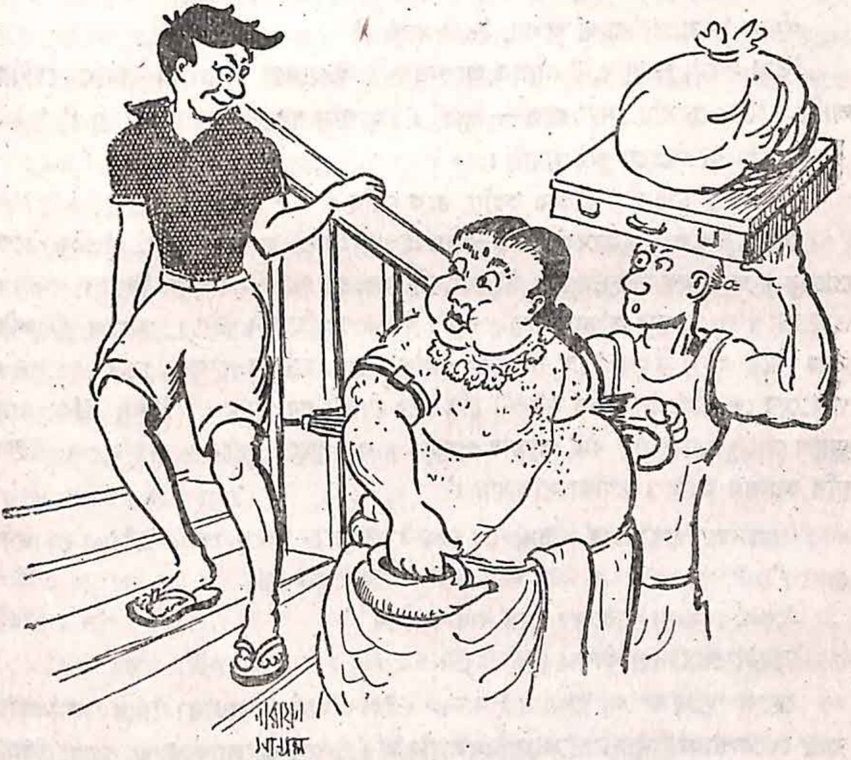
হেবো বললে, 'অন্তত এ দুটো নিয়ে যান। খুঁজে পাওয়া গেছে এ দুটো আপনারই।' হেবো বার করে দেয় একটা রুপোর কোশাকুশি আর একটা কলম।

গুরুবিদায় সমাপ্ত হতেই বাড়ির সকলে ঘিরে ধরল হেবোকে : কাকা, কাকিমা, মঞ্জুলা, নকুলচন্দ্র আর প্রবীর। দরজা বন্ধ করে সবাই মিলে চেপে ধরল হেবোকে। এবার বলতে হবে, কি করে কি হল।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হেবো হেসে বললে, 'কেন পারছেন না জানেন? আপনারা সবচেয়ে সহজ পথটা দেখতে পারছেন না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলেই সমস্যাটা সহজ হয়ে যাবে।'

'কি উদাহরণ?'



'আপনার শ্রাদ্ধের গুরুবিদায়টা নিয়ে যাবেন না স্যার?'

'আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞাসা করব। ঠিক খেয়াল করে বানান তিনটে বলুন দেখি।'

'বেশ, বল।'

'প্রথম বানান মুমূর্ষু।'

'ম-য়ে হ্রস্বউ, ম-য়ে দীর্ঘউ আর মূর্ধণ্যষ-এ রেফ হ্রস্বউ।'

হেবো বললে, 'ঠিক। এবার বলুন—মুহূর্ত।'

'ম-য়ে হ্রস্বউ, হ-য়ে দীর্ঘউ আর ত-য়ে রেফ।'

হেবো বললে—'ভুল।'

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'না হে ভুল নয়। এখনকার বানান তয়ে রেফ। আগে ছিল তয়ে তয়ে রেফ।'

হেবো আবার বললে—'ভুল।'

প্রবীরচন্দ্র চটে উঠে বলেন, 'অবে তুমি ঠিক বানানটা বল শুনি !'

হেবো বললে, 'ভ-য়ে হ্রস্বউ আর ল।'

থমকে গিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'তার মানে ?'

'তার মানে, প্রথম দুটি বানান আপনার ঠিকই হয়েছে। তৃতীয় বানান যেটার আমি জানতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে—"ভুল" ; আপনি বলতে পারছিলেন না।'

হোহো করে হেসে ওঠে সবাই।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'স্বীকার করছি, ঠকে গেছি।'

হেবো বললে, 'গুরুদেবও ঠিক ঐভাবেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঠকে গেছেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন উইলটা চুরি করতেই আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করব। তাই টোপ ফেলে চার ছড়িয়ে বঁড়শি ছিপ হাতে বসেছিলেন উনি। আসল উইলটা সঙ্গে নিয়ে একটা নকল উইল সিন্দুকে রেখে এবং চাবিটা ফেলে চলে গেলেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন নকল উইলটা চুরি করে বোকা হব আমি। কিন্তু উনি যান ডালে ডালে তো আমি যাই পাতায় পাতায়। সব জেনে শুনেও সেই নকল উইল চুরি করলাম আমি। বোকা সাজলাম।'

বাধা দিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আসল উইলটা কোথায় গেল ?'

'কেন, যেখানা গুরুদেব পরে বার করলেন।"

'সেটা তো সাদা কাগজ !'

হেবো হেসে বললে, 'সেখানাই আসল উইল। আমি কলকাতা গিয়ে কাকিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু মাল-মশলা কিনি। একটা কালো পাইলট কলম, কিছু স্টার্চ আর আইওডিন্। স্টার্চের সল্যুশানে কয়েক ফোঁটা আইওডিন ফেলে দিলে ব্লু-ব্ল্যাক রঙের কালি হয়। কিন্তু সেটা ম্যাজিক কালি ; কিছু পরেই লেখা উপে যায়। কাগজে কোন দাগ থাকে না। উইল করার আগের দিন যখন ক্যাবল গেল ডাক্তারবাবুর ব্যাগ আনতে তখন ঐ কালি-ভর্তি কলমটা আমি কলমদানিতে রেখে দিই। আগের রাত্রেই বাড়ির অন্যান্য ফাউণ্টেন পেন চুরি গেছে। ফলে আশা করেছিলাম ঐ কলমেই উইল লেখা হবে। একমাত্র ভয় ছিল—অ্যাডভোকেট-সাহেব যদি শেষ মুহূর্তে তাঁর পকেট থেকে কলম বার করে বসেন। কিন্তু আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। সম্পত্তির কণামাত্র না পেয়েও যখন কাকিমা তাঁর শ্বশুরের সেবা করতে গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রাগ করে বলেছিলেন—তোমার কথায় ভগবানে

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি মা ! আর ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছিল—ভগবান আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন । সবাই ঐ কলমেই সই দিয়েছেন ।'

কাকা বলেন, 'কিন্তু ডাক্তারবাবুও কি তাঁর নিজের কলমে সই করেন নি ?'

নকুলবাবু বলেন, 'না, নিয়ম হচ্ছে দলিলে সকলে একই কলমে সই করবে—যাতে প্রমাণ হয় সাক্ষীরা দলিলকারীর সঙ্গে একই সময়ে সই করেছেন । এ নিয়ম খুব কঠোরভাবে মানা হয় না ; কিন্তু সুধাকান্তবাবু পাকা উকিল ; আইনের খুঁত তিনি রাখবেন না । তাই আমি আর ডাক্তারবাবু যখন দ্বিতীয়বার সই দিতে ফিরে গেলাম তখন তিনি তাঁর কলমটা এগিয়ে দিয়েছিলেন ।

মঞ্জুলা দেবী বলেন, 'হেবো, তাই বুঝি তুমি ডাক্তারবাবুকে সই করতে পীড়াপীড়ি করছিলে ?'

হেবো হেসে বলে, 'ঐ মুহূর্তটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ । ডাক্তারবাবু যদি সই না দিতেন, তাহলে এঁরা দ্বিতীয় ডাক্তারকে ডাকতে যেতেন—ফলে উইল তখনই সীলমোহর করা হত না । আর ঘণ্টাকয়েক প্রর দ্বিতীয় ডাক্তারবাবু যখন সই দিতে আসতেন ততক্ষণে লেখা সব আবছা হয়ে যেত । ধরা পড়ে যেতাম আমি ।'

প্রবীরচন্দ্র ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'সাবাস হেবো ! বাঙলা সিনেমার তুমি ক্ষুদে নায়ক হতে পার !'

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল হেবো । মঞ্জুলা দেবী ওকে কাছে ডেকে বলেন, 'শ্রাদ্ধের পর পণ্ডিতবিদায় করতে হয় । তুমি একটি ক্ষুদে পণ্ডিত ! এই তোমার পণ্ডিতবিদায় ।'

ছোট্ট একটা বাইনাকুলার । অত্যন্ত জোরালো তার লেন্স । বহু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় । হেবো জানলার কাছে সরে এসে দেখল, রাস্তার ওপারে যে ভদ্রলোক চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তার হরফগুলো পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে ।

জয়দ্রথ-বধ পালা বুষোৎসর্গে শেষ হওয়ায় হেবো আগেই আহলাদে আটখানা হয়েছিল, বাইনোকুলারটা হাতে পেয়ে সে যেন ষোলখানা হয়ে গেল ।

আদি পর্ব

কলকাতা ফিরে এসে হেবো দেখে যথারীতি তার নামে একখানা সীলবন্ধ চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেই বুঝতে পারে এটা কার লেখা। আশ্চর্য ভদ্রলোকের ধৈর্য! প্রতিবার হেবো সাফল্যমণ্ডিত হয়, আর উনি ফোড়ন কাটেন। অসহ্য!

ও! তোমরা বুঝি বুঝতে পারছ না? না, দোষ তোমাদের নয়, আমারই। রাম-জন্মের আগেই রামায়ণের কাহিনী ফেঁদে ফেলেছি আমি। 'গুরুবিদায় পর্ব'টা হেবোর জীবনে এসেছে অনেক পরে। ডাক্তার ওয়াটসনের মত তোমরা যদি কেউ ওর কীর্তিকাহিনী ভবিষ্যতে কখনও লিখতে চাও তবে আমার মত উল্টোপাল্টা করে লিখো না। আগের কথা আগেই লিখো। চিঠিখানা কোথা থেকে এসেছে এবং খাম না খুলেই হেবো কেমন করে তার অন্তর্নিহিত জ্বালা অনুভব করল, তাহলে এবার সেই গোড়ার কথাগুলো বলতে হয়: কেমন করে হেবো গোয়েন্দা হয়ে উঠল।

হেবোর বর্তমান বয়স ষোলো। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবে সে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে যখন সে ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ে। এই তিন-চার বছরের ভিতরেই সে একের পর এক কয়েকটি মারাত্মক রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। আমার তো ধারণা বড় হলে ওর নাম ও-দেশের শার্লক হোমস্, ইয়ারকুল প্যোরো, আর এ-দেশের ব্যোমকেশ বক্সী, পরাশর বর্মা, জয়ন্ত অথবা কিরীটী রায়ের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে—মানে তোমরা যদি কেউ ওয়াটসনের ভূমিকা নিতে রাজী হও। তাই তোমাদের সুবিধা হবে মনে করে ওর গোয়েন্দা-জীবনের আদি কথাটা এবার বলে রাখি।

আগেই বলেছি, গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে ছেলেবেলা থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিল তার বাক্সে। জমিয়ে রেখেছিল। মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে একটা মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল-করা চশমার একটা পুরু লেন্স, একটা মোটা নোটবই। নোটবইতে সময়ে অসময়ে সে নানান তথ্য টুকে রাখত। কোন্ সমস্যার ক্লু কোন্ সূত্রে প্রয়োজন হবে তা কে জানে? ঐ নোট বইটা নিয়ে মেজদা ওকে কত ঠাট্টাই না করেছে! সবার সামনে ঠাট্টা করে বলত হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তার।'

হেবো রাগ করত না। সে জানত তার দিনও একদিন আসবে। এলও তাই, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

হেবোর মেজদির বিয়ে হয়েছিল মাসকতেক আগে। হেবো তখন ক্লাস সিক্সে

পড়ে। পুজোর সময় মেজদির শ্বশুরবাড়ি তত্ত্ব পাঠানো হবে। বাবা আর কাকা বাজার উজাড় করে পুজোর তত্ত্ব সওদা করে আনলেন। গোল বাধল জুতোজোড়া নিয়ে। জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে হেবোর মা বলেন—'জুতোজোড়া মনে হচ্ছে খুকির পায়ে বড় হবে।'

মেজদা সেটা নেড়ে-চেড়ে বলে—'বড় নয় মা, ছোটই হবে—এই দেখ আমার পায়েই ছোট হচ্ছে।'

কাকা বলেন—'আমারও তাই মনে হয়েছিল। দাদাকে বললাম আর এক সাইজ বড় নাও বরং, তা দাদা—'

বাধা দিয়ে হেবোর বাবা বলে ওঠেন—'আরে না, ওর চেয়ে বড় হলে খুকি উল্টে পড়ে যাবে।'

ক্রমে দেখা গেল আন্দাজে-কেনা জুতোর মাপ সম্বন্ধে বাড়ির প্রত্যেকের মতামত বিভিন্ন প্রকারের। বাড়ির সবাই যেন বিধানসভায় ভোট দিচ্ছেন—একদল সরকারী পক্ষ, একদল বিরোধী পক্ষ। মেজদা হেসে বলে—'শ্রীমান শার্লক হেবো এ বিষয়ে কি বলেন? তিনি তাঁর কাস্টিং ভোটটা এবার দিলেই পারেন!'

এই সুযোগ! হেবো কোন কথা বলল না, সোজা উঠে গেল নিজের পড়ার ঘরে। ফিরে এল একটু পরেই। হাতে তার নোট বুক। বিধানসভার স্পীকারের মতই গম্ভীর স্বরে বললে—'আন্দাজে কথা বলা শার্লক হেবোর ধাতে নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। জুতো মেজদির পায়ে ঠিক হবে।'

নোটবইটা সে মেলে ধরে সকলের সামনে। মেজদির বিয়ের সময় যে জুতোজোড়া কেনা হয়েছিল—তার নম্বর টুকে রাখা আছে ওর নোট বইতে দু-মাস আগে। কাকা বলেন—'ভাগ্যিস হেবোর নোটবইটা ছিল!'

হেবো গর্বের হাসি হাসল শুধু।

ক্লাসের ছেলেরা, পাড়ার বন্ধুরা, মায় বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে হেবো একটা হবু-গোয়েন্দা। বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস্। একমাত্র মেজদাই সেটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেবোর চেয়ে সে দু বছরের বড়—সেবার তার পরীক্ষার বছর। হিউম্যানিটিস গ্রুপে হায়ার সেকেন্ডারি। হেবোকে সে মনে করে নেহাত নাবালক। হেবোর গোয়েন্দাগিরির উপর কখনও তার অহেতুক উষ্মা, কখনও বা দাদা-সুলভ তাচ্ছিল্য। বাবা-কাকার সুরে সুর মিলিয়ে হেবোকে কখনও উপদেশ দেয়—'এসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দে হেবো, নাহলে বেঘোরে ফেল্লু মারবি।' কখনও বা লুকিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে চুকলি কাটে—'মা হেবো আবার ডিটেকটিভ বই পড়ছিল!' ঠাট্টা করে মেজদাই ওর এই নামকরণটা করেছে—শার্লক হেবো। হেবোর অবশ্য তাতে দুঃখ নেই। সে জানে ঐ বিদ্রূপের নামই সে একদিন সার্থক করে তুলবে।

ঐ নামই হবে তার গৌরবের পরিচয়। তাছাড়া মেজদা যে কেন এতটা চটেছে তাও তো তার অজানা নেই ওর। সে একটা ভারি মজার গল্প।

পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন। মা, কাকিমা আর মেজদি মিলে সারাটা দুপুর ধরে নানান রকমের পিঠে তৈরি করেছে। হেবোর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই হবার উপায় নেই। বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী। হেবো জানে, চার রকমের মিষ্টি হয়েছে গোকুল পিঠে, রসবড়া, পুলি-পিঠে আর সরুচুকলি। সংখ্যায় কোন্ জাতের কতটি তৈরি হয়েছে তারও মোটামুটি হিসেব লেখা আছে ওর নোটবইতে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—লোভ তার কিঞ্চিৎ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তো হ্যাংলার মত চাইতে পারে না! হেবো তাই অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করে বলেছিল—'আরে মেজদি, একটার পর একটা বানিয়ে তো যাচ্ছ—একটু টেস্ট করে দেখা তো উচিত—মানে, ঠিকমত ভেতরে রস ঢুকছে কি না—'

কাকিমা এ যুক্তিতে হেসে ফেলেছিলেন। তবু হয়ত দুটো রসবড়া ওকে পরখ করতে তুলে দিতেন; কিন্তু মা মেজদির ভোটাধিক্যে ওর প্রস্তাবটা পাস হল না। মা বললেন—'সে আর তোকে নতুন করে দেখতে হবে না। এইমাত্র তোর মেজদা পরখ করে বলে গেল।'

যুক্তির বাইরে যেতে পারে না হেবো। অগত্যা ওকে ঢোক গিলে যেতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বার-বার ওই পিঠেগুলোর কথাই ওর মনে হয়েছে, ঘুম আসার আগে পর্যন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্নও দেখল, পুলি-পিঠেগুলোর গায়ে লেত্তি জড়িয়ে মেজদা গচ্ছা-গচ্ছি খেলছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হেবোর। রাত তখন নিষুতি। সমস্ত বাড়িটা ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, মাঝের হল-কামরার বড় ঘড়িটার টক্-টক্ ছাড়া। হেবোর হঠাৎ মনে হল ভাঁড়ার ঘর থেকে যেন একটা সন্দেহজনক শব্দ আসছে, বাসনপত্র সরানোর শব্দ। কিছুদিন আগেই পাড়ায় মিঠুয়াদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। সে-চুরির কিনারা হয়নি। পুলিসে খামোখা মিঠুয়াদের নতুন চাকরটাকে ধরে নিয়ে গেছে। একেই চুরিতে বিপদগ্রস্ত, তার উপর চাকরটাও বেহাত হওয়ায় মিঠুয়ার মায়ের অবস্থা চরমে উঠেছে। হেবো সবই খবর রাখে। বাসনপত্র সরানোর আওয়াজ শুনেই হেবো বুঝতে পারে ব্যাপার খানা। এ নিশ্চয়ই সেই সিঁধেল চোরের কাণ্ড। জন্ম-ডিডেকটিভ শার্লক হেবো। তড়াক করে খাট থেকে নেমে পড়ে সে। খাটের নিচে থেকে টেনে নেয় হকিস্টিকটা। ধরতেই হবে বাছাধনকে এবার! পা টিপে-টিপে সাহসে ভর করে একাই এগিয়ে গেল সে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে। প্যাসেজের আলোটা সে ইচ্ছা করেই জ্বালে না। চোর যেন টের না পায়। পাগলা দাশুদের স্কুলে কে যেন একবার চোর ধরতে গিয়ে বেড়াল ধরে নাকাল হয়েছিল। হেবো সে ভুল করবে না। অতি সন্তর্পণে সে উঁকি দিয়ে দেখল ভাঁড়ার-ঘরের আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। ঘর নীরন্ধ্র অন্ধকার

—তবু মনে হল একটা মানুষ মোড়ার উপর দাঁড়িয়ে উপরের তাক থেকে কিছু পেড়ে নামাচ্ছে। কি আবার? বাসনপত্র নিশ্চয়ই! হেবো সাবধানী—সে জানে চেঁচিয়ে উঠলে অথবা আলো জ্বাললে চোর তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালিয়ে যাবে! তার হাতে হকিস্টিক আছে বটে, কিন্তু চোরের হাতে যে ছোরা অথবা রিভলবার নেই, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ছেলেমানুষকে কাবু করে পালিয়ে যাওয়া একটা জোয়ান মানুষের পক্ষে কিছু না। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কি হবে? মদোন্মত্তের চেয়ে শশকও বয়সে বড় ছিল এমন প্রমাণ নেই। হেবো জানে ভাঁড়ার-ঘরে এই একটি মাত্র দরজা। ও-পাশের জানলায় গরাদ দেওয়া আছে। আর মুহূর্তমাত্র দেরি করে না হেবো; চট করে ভাঁড়ার-ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দেয়। ব্যস্, বাছাধন এবার ইঁদুরের যাঁতাকলে বন্দী! এখন রিভলভারই হোক আর ছোরাই হোক, হেবোর হাতে ওর নিষ্কৃতি নেই। পরমুহূর্তেই ওর গগনবিদারী চিৎকারে বাড়ির নৈশ নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে যায়—'চোর! চোর!! চোর!!!'

ছুটে এল বাড়ি সুদ্ধু সবাই। বাবা-মা-কাকা-কাকিমা মায় ছট্টুলাল আর বামুনদি। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ছট্টুলাল এসে মহড়া নিল দরজার সামনে। সারা বাড়ির আলো তখন জ্বলে উঠেছে। ছট্টুলাল দরজার শিকলে হাত দিয়ে তার দেহাতি ভাষায় চিৎকার করে বললে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দিতে পিছপাও হবে না সে!

কাকা বলেন—'দরকার কি ছট্টুলাল! দরজা বন্ধই থাক! আগে পুলিসে খবর পাঠানো যাক।'

ছট্টুলাল তার গোঁফের প্রান্তে চাড়া দিয়ে বললে, এমন কলে-পড়া ইঁদুর যদি তার হাত ফস্কে পালায় তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাজুবন্ধ পরে সে ফিরে যাবে ছাপরা জেলায়! —'আপ্ দেখিয়ে না হুজুর, ক্যা হাল করে! সালা চোট্টাকো হাম ছাতু বনা দেউঙ্গা!'

শিকল খুলে দিয়ে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরে দড়াম করে দরজাটা সে খুলে দেয়।

বের হয়ে এলেন রসবড়া-রসাপ্লুত মেজদা!

সে অপমান মেজদা ভুলতে পারেনি। তোমরাই বল, সে লজ্জার কথা কি ভোলা যায়? একবাড়ি লোকের সামনে রাত দুটোর সময় চোর বলে ধরা পড়াই শুধু নয়, সেই পোষ মাসের শীতে মধ্যরাত্রিতে বেচারিকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হয়েছিল। তাড়াহুড়োয় রসবড়ার মাটির হাঁড়িটাই উল্টে পড়েছিল ওর মাথায়! ভাঙা হাঁড়ির কানাটা আটকে ছিল গলায় জয়মাল্যের মত।

তাই মেজদার যত আক্রোশ হেবোর উপর। ভ্রূক্ষেপ করে না হেবো। চোর সে ঠিকই ধরেছিল। বাইরের চোর না হোক, ঘরের চোর,—বাসন-চোর না হোক, রসবড়া-চোর।

কিন্তু যে ঘটনার পর থেকে হেবো গোয়েন্দা হিসাবে সকলের কাছে প্রথম স্বীকৃতি পেল, যে ঘটনায় তার নাম প্রথম ছাপা হল খবরের কাগজে, এবার সেই ঘটনার কথাই বলব তোমাদের।

সেবার পুজোর ছুটিতে হেবোর বাবা কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ক'দিন ধরে বাড়িতে নানান জল্পনা-কল্পনা। মধুপুর—পুরী—না দার্জিলিঙ। শেষ-মেশ স্থির হল, না ওসব কিছু নয়, যাওয়া হবে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করতে। বেনারস। হেবোর ফুর্তি দেখে কে! বহুদিন বাঙলার বাইরে যায়নি ওরা। রেলগাড়ি খোলা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হু-হু করে ছুটছে—আর জানলায় মাথা রেখে বসে আছে হেবো, এটা ভাবলেই একটা শিহরণ



রসবড়া রসাপ্লুত মেজদা

লাগে। ঠিক হল বাবা-মা-মেজদা আর হেবো যাবে কাশীতে। কাকা যাবেন কাকিমাকে নিয়ে কাকিমার বাপের বাড়ি মালদায়। ছটুলাল থাকবে বাড়ির তদারকে। হেবো তাকে নানারকমভাবে তালিম দিয়ে শিখিয়ে দিল খালি বাড়ি কেমনভাবে পাহারা দিতে হবে।

তার পর স্কুলের ছুটি হলে নির্দিষ্ট দিনে ওদের স্টেশনে তুলে দিতে এলেন কাকা-কাকিমা। আলোয় আলো হাওড়া স্টেশন। দেরাদুন এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। অসম্ভব ভিড় হয়েছে। পুজোর সময় যেমন হয় আর কি। ওদের কামরায় অবশ্য ভিড় হয়নি মোটেই। রিজার্ভ কামরা। অর্থাৎ কামরাটায়

যতগুলো সীট আছে ঠিক ততগুলো রিজার্ভেশন টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। হেবো লক্ষ্য করে দেখে রেলের কামরায় লেখা আছে—'বারো জন বসিবেক।' গুণে দেখল বারো জন লোকই আছে বটে। কিন্তু তারপরই লক্ষ্য হল রেল-কোম্পানীর আর একটি বিজ্ঞপ্তি :

'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।'

আপন মনেই হাসল হেবো। কী বুদ্ধি রেল-কোম্পানীর বড় কর্তাদের! আরে বাপু, চোর-জুয়াচোর যে নিকটেই আছে এ সাধারণ সংবাদটা কি শার্লক হেবো জানে না? কিন্তু ঐভাবে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চোর-জুয়াচোর-পকেটমারদের সাবধান করে দেবার মনেটা কি? যাই হোক সাবধান সে প্রথম থেকেই হয়ে আছে। স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব যাত্রীদের সে লক্ষ্য করতে থাকে। সকলেই কিছু চোর-জুয়াচোর নয়; কিন্তু বিজ্ঞপ্তি যখন দেওয়া হয়েছে তখন নিশ্চয়ই চোর-জুয়াচোর লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে। কে হতে পারে? অধিকাংশই পশ্চিমা লোক। ওদের পরিবার ছাড়া আরও একটি বাঙালী পরিবার বসেছেন সেই কামরায়। কর্তা-গিন্নী, আর দুটি ছেলেমেয়ে। ও পাশের দূরের ঐ সাধুবাবার উপর কেমন যেন সন্দেহ হয়। ওর দাড়িটা নকল নয় তো? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ কি আগে থেকে সীট রিজার্ভ করিয়ে রাখে? ও কোন্ জাতের সাধু তাহলে? তাছাড়া মাঝের বেঞ্চিতে ঐ মধ্যবয়স্ক পাঞ্জাবী লোকটি? তিনিই বা এত রাতে গগল্‌স্ চোখে দিয়ে আছেন কেন? এরও দাড়ি আছে, তার উপর পাগড়ি।

হেবোরা বসেছিল দরজার উল্টো দিকে একটা কোণ ঘেঁষে। সেখান থেকে সকলের উপরেই বেশ নজর রাখা চলে। বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ালো। এ পাশের মারোয়াড়ী ভদ্রলোক সীতাভোগ কিনলেন। আসানসোলে মধ্যরাত্রে উঠল অনেক লোক। শিখ ভদ্রলোক 'রিজার্ভ গাড়ি' বলে দরজা আড়াল করে দাঁড়ালেন; তবু কিছু লোক জোর করে উঠল। 'বারো জন বসিবেক' আইন আর মানা যাচ্ছে না। একজন পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। গায়ে ঘুণ্টি দেওয়া মেরজাই—মাথায় কাজ-করা সাদা টুপি। মেজদা বসেছিল বেঞ্চির প্রান্তে। তাকে ঠেলে-ঠুলে পশ্চিমা ভদ্রলোক বসবার উপক্রম করতেই মেজদা তার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—'একদম জায়গা নেই দেখতে পার্তা নেই? মানুষ কা মুণ্ডুর উপর বসেগা না কি রে বাপু?'

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলেন—'জরা মদৎ তো করো ভাইসাব, ঔর এক মুসাফির কে লিয়ে কাফি জগাহ্ হো সক্তা।'

এই সময় শিখ ভদ্রলোক চট করে স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে গেলেন। ফলে হেবোর মেজদাকে আর মদৎ করতে হল না—পশ্চিমা ভদ্রলোক মাঝের বেঞ্চিতে ঐ খালি আসনটি দখল করলেন। আরও যারা উঠেছিল এই স্টেশনে তাদের দাঁড়িয়েই থাকতে

হল। 'বসিবেক'-এর হিসাবটাই রেল কোম্পানী কষেছে ; মাঝপথে ভিড় ঠেলে উঠলে কতজন 'দাঁড়াইবেক' এবং কতজন পাদানি থেকে 'ঝুলিবেক' তার তো আর কোনও হিসাব নেই। শুধু একজন ফতুয়া-পরা ভুঁড়ি-সর্বস্ব ভোজপুরী পশ্চিমা লোক এই এত লোকের ভিড় ঠেলে কায়দা করে উঠে গেল বাঙ্কের উপর। গাড়ি আসানসোল ছাড়ল।

আবার বসে বসে সবাই ঢুলতে শুরু করেছে। কেউ-কেউ বই পড়ছে সেই আধো অন্ধকারে। মাঝের বেঞ্চির মুসলমান ভদ্রলোকটি টেনে নিলেন হেবোর বাবার 'আনন্দবাজার' খানা। জেগে থাকলে হয়ত হেবোর বাবা অবিনাশবাবুর অনুমতি নিতেন তিনি, কিন্তু হেবো দেখল ওর বাবা বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন। হেবোর ঘুম আসছিল না। তা ছাড়া আজ রাত্রে সে ঘুমোবে না—ঘুমোনো উচিতও নয়! এই সুযোগে পকেট থেকে হেবো অতি সন্তর্পণে বার করে একখানা চটি বই, 'হত্যাকারী কে?' পড়তে থাকে একমনে। বই পড়ছে বটে, কিন্তু সজাগ দৃষ্টি তার ঠিকই আছে সকলের উপর। শোবার জায়গা বস্তুত কেউই পায়নি, একমাত্র বাঙ্কের উপরের ঐ ভুঁড়িয়াল ভোজপুরীটা ছাড়া। অন্য সকলেই বসে বসে ঢুলছে। নাক ডাকার শব্দ আসছে বাঙ্কের উপর থেকে। অত বড় দেহটাকে কায়দা করে লোকটা ঘুমোচ্ছে কেমন করে? বার-বারই হেবোর নজর যাচ্ছে ঐ বিজ্ঞপ্তিটার দিকে—'নিজে টিকিট কেন, মালের উপর নজর রাখ,—চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।'

জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেবে স্থির করেছিল, কিন্তু ওরই মধ্যে কখন একটু ঢুলুনি এসেছে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে জেগে ওঠে হেবো। গাড়ি তখন একটা টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। টানেলের গুমরানির বিকট শব্দেই ঘুম ভেঙে গেছে ওর। নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। তাদের মালপত্র সব ঠিকই আছে। ঘুমোচ্ছে সবাই, বসে বসেই। শুধু বাঙালি ভদ্রলোকটি জেগে বই পড়ছেন। আর আসানসোল থেকে ওঠা সেই ভদ্রলোকটি, যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলেছিলেন তিনিও জেগে আছেন—খবরের কাগজটা তখনও দেখছেন। সাধুবাবাও অবশ্য জেগে আছেন গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত তিনি। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলো হেবো।

ঘুম ভাঙল একটা চেঁচামেচিতে। গাড়ি তখন দাঁড়িয়ে আছে গয়া স্টেশনে। ভোর হয়-হয় আর কি। অবাক চোখে হেবো দেখে, কামরাতে উঠেছে দু'জন য়ুনিফর্মধারী পুলিস। আরও দু'জন পুলিস অফিসার উঠেছেন কামরায়। ঐ দিককার বেঞ্চিতে যে বাঙালি ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে একজন পুলিস অফিসারের কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

ভদ্রলোক বলছেন—'কেন মশাই, বাঙালি হয়ে জন্মেছি বলেই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?'

পুলিস অফিসারটি বলছেন—'আহা, আপনি রাগ করছেন কেন ? আমি তো শুধু আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করেছি। আমাদের খবর—লোকটা বাঙালি, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কই অবিনাশবাবু তো রাগ করেননি ?'

হেবো বুঝতে পারে এর আগে তার বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি কি ? একটু চেষ্টা করেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এরা আবগারি পুলিস —মানে মদ-গাঁজা-আফিং নিয়ে যারা চোরাকারবার করে তাদের ধরে বেড়ায়। ওরা নাকি খবর পেয়েছে, এই গাড়িতে একজন অনেকদিনের পাকা চোরাকারবারী এক স্যুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। লোকটা বাঙালি—স্যুটকেস তার সঙ্গেই আছে।

দ্বিতীয় অফিসার প্রথমজনকে বললেন—'এঁদের আর মিথ্যে হয়রানি করে কি হবে মুখুজ্জে ? এঁরা সব ভদ্রলোক ; আমার মনে হয় আসানসোলে যে পাঞ্জাবী লোকটা স্যুটকেস হাতে এই কামরা থেকে নেমে গেল,—সেই যে গগ্‌ল্‌স-পরা লোকটা হে—সেই আসল ঘাঘি ! রাত্রিবেলা গগ্‌লস দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বেটা শিখ সেজে চোখে ধুলো দিয়ে গেল।'

মুখার্জি সাহেব বললেন—'আমারও তাই মনে হয়।'

—'তাহলে আর সময় নষ্ট করে কি হবে, চল যাই।'

—'চলো।'

দু-জন অফিসারই গাড়ি থেকে নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। হেবো কামরার সকলের উপর একনজর চোখ বুলিয়ে নিল। গণ্ডগোলে সবাই জেগে উঠেছে—একমাত্র বাঙ্কের উপর শায়িত বিশালবপু ভোজপুরী প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি এত গণ্ডগোলেও। একটানা নাক ডেকে চলেছেন তিনি। মেজদা হেবোকে কনুইএর একটা গুঁতো মেরে বললে—'শার্লক হেবো একটু এনকোয়ারি করে দেখলে পারতে !'

হেবো জবাব দেয় না। সে তখন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। একমনে কিসের যেন হিসাব করে যাচ্ছে চোখ বুজে। তারপর, কোথাও কিছু নেই, এক লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে। হাঁ-হাঁ করে ওঠে গাড়ি-সুদ্ধ লোকজন। আবগারি অফিসার দু-জন ছুটে এসে ওকে ধরে তোলেন। বলেন—পড়ে গেলে কেমন করে, খোকা ?'

'—খোকা নয়,' প্রতিবাদ করে হেবো,—'আমার নাম হেবো, শার্লক হেবো। আর পড়ে আমি যাইনি, ঝাঁপ দিয়েছি মাত্র। বিপদে ঝাঁপ দেওয়াই আমার স্বভাব। সে যাক। আপনারা ভুল করেছেন, আফিং চোর এই কামরাতেই আছে। আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হেবোর বাবা অবিনাশবাবুও নেমে এসেছেন ততক্ষণে। পুলিস অফিসার ভদ্রলোক হেবোকে তার বাবার জিম্বায় পৌঁছে দিয়ে বলেন—'আপনার ছেলে ? নিন ! তবে এ তুখোড় ছেলেটিকে একটু সামলিয়ে রাখবেন !'

হেবো চিৎকার করে ওঠে—'আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনারা ? আমি আন্দাজে কিছু বলছি না। প্রমাণ আমার হাতে।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন অবিনাশবাবু—'কি পাগলামি করছিস হেবো ?'

কিন্তু দ্বিতীয় অফিসারটি হঠাৎ বলে বসেন—'বেশ তো, দেখাই যাক না ও কি বলতে চায়। কি বলছ খোকা ? আফিং-চোরকে তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে ?'

হেবো কোন কথা বলে না। গট্-গট্ করে কামরায় ফিরে এসে বলে—'আফিং নিয়ে পালাচ্ছেন এই ভদ্রলোক।'

অম্লান বদনে সে দেখিয়ে দিল মাঝের বেঞ্চিতে বসা সেই মুসলমান ভদ্রলোক-টিকে। আসানসোলে উঠে যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলছিলেন। তাজ্জব কাণ্ড ! হেবোর বাবা আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। প্রচণ্ড রাগে হেবোর কানটা ধরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন ওর গালে। বাধা দিলেন সেই আবগারি অফিসারটি। বলেন—'আহা গাড়ির মধ্যে আর মারধোর করবেন না। বাড়ি গিয়ে শাসন করবেন বরং।'

মুসলমান ভদ্রলোকটি বোধহয় এদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেননি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। হেবোর গালটা জ্বালা করছে। কানটাও লাল হয়ে উঠেছে। কোনরকমে চোখের জল সামলে সে শুধু বললে—'প্লীজ, ওঁর স্যুটকেসটা খুলে দেখুন আপনারা শুধু !'

মুসলমান ভদ্রলোক বলেন—'হুয়া ক্যা ?'

আবগারি দারোগা চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কি ভেবে ফিরে আসেন তিনি। স্যুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতেই ঘটে গেল একটা তাজ্জব কাণ্ড। চট্ করে বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়ালো সেই মুসলমান লোকটা। চট্ করে পকেট থেকে বার করে সে কালো রঙের একটা ছোট্ট হাতিয়ার। হেবোর কানটা তখনও ধরা আছে অবিনাশ-বাবুর হাতে। কানে প্রচণ্ড টান লাগছে, তবু হেবো বুঝতে পারে জিনিসটা কি। রহস্য-লহরী সিরিজের অনেক বইতে ছবি দেখা আছে তার।

মুসলমান ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বলে ওঠে—'আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলে আমি কিন্তু তার খুলি উড়িয়ে দেব ! ছ-টা গুলি ভরা আছে এতে—ছয়জনকে না মেরে ধরা দেব না আমি ! দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও সকলে !'

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। সে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একমাত্র বাঙ্কে-শয়ান ভোজপুরীর নাসিকাধ্বনি।

ট্রেন হুইসিল দিল। পরমুহূর্তেই দুলে উঠল ট্রেনটা। জল আর কয়লা নিয়ে নূতন উদ্যমে ইঞ্জিন গাড়িকে টানছে। গাড়ি ছাড়ল। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে—'দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। চলন্তি ট্রেন থেকে যে নামবে সে-ই গুলি খাবে কিন্তু !'

বেঞ্চির উপর থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। ছুটে যেতে চায় দরজার দিকে।

সেই শুভ মুহূর্তেই ভোজপুরীর ঘুমন্ত আড়াইমনি বপুখানি উল্টে পড়ল পশ্চিমা মুসলমানটির ঠিক মাথার উপর। দুজনেই উল্টে পড়ল মেঝের উপর। এই সুযোগে একজন পুলিস টেনে দিয়েছে অ্যালার্ম চেনটা।

লিখতে যতক্ষণ লাগল তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনাটা। হুমড়ি খেয়ে পড়া মানুষদুটো যখন ফের উঠে দাঁড়াল তখন পশ্চিমা ভদ্রলোকের হাতে উঠেছে লোহার হ্যাণ্ডকাফ আর রিভলভারটা চলে এসেছে ভোজপুরীর দৃঢ় মুষ্ঠিতে। এত অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সামান্য পুলিস অফিসার দু-জন তো ছার, স্বয়ং শার্লক হেবো পর্যন্ত তাজ্জব। ভোজপুরী তাঁর পুরুষ্টু গোঁফজোড়া খুলে ফেলতেই অফিসার দু-জন একসঙ্গে বলে ওঠেন—'স্যার! আপনি!'

ভোজপুরীবেশী আবগারি পুলিসের বড়-সাহেব বললেন—'হ্যাঁ, আমিই; আসানসোল থেকে ওকে ওয়াচ করতে করতে আসছি। আর তুমি মুখুজ্জে, তুমি এত বড় ইডিয়েট, বাঙালি ধরে ধরে শুধু নাম জিজ্ঞাসা করছ?'

মুখার্জি সাহেব মাথা চুলকে বলেন, 'না স্যার, মানে, ইয়ে…এ খোকা শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে…'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেবো। তার কান অনেক আগেই বন্ধনমুক্ত হয়েছিল। বলে, 'খোকা নয়, বলুন শার্লক হেবো! আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস শার্লক হেবোর নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত!'

ভোজপুরী-বেশী বড় সাহেব ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন,—'বল তো ভাই, কি করে বুঝলে তুমি?'

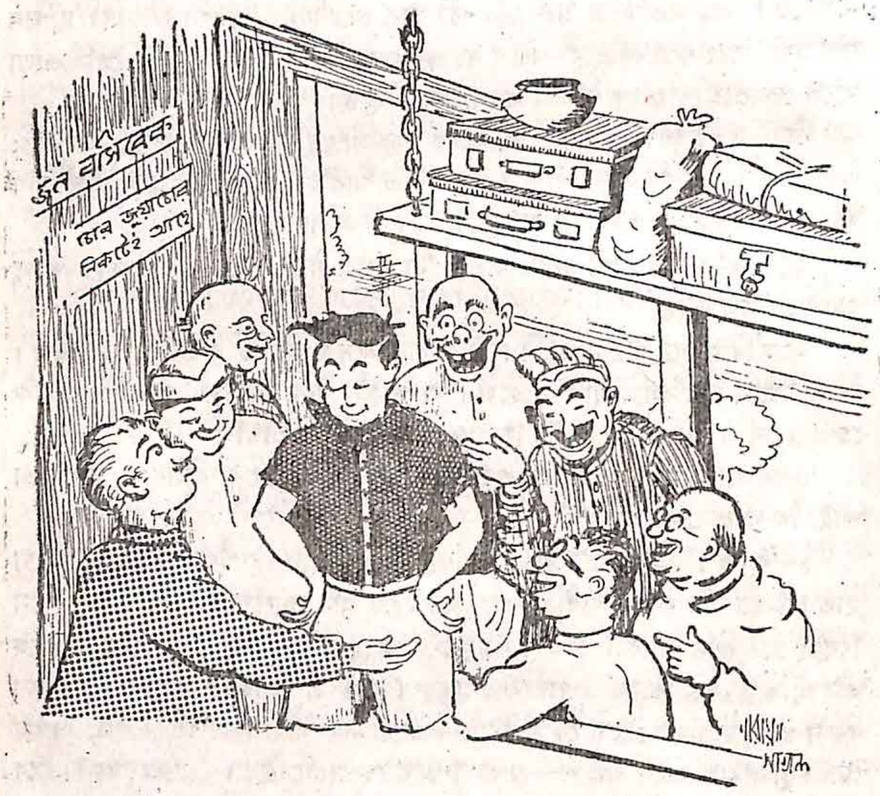
—'বলছি।' হেবো উঠে দাঁড়ায় বেঞ্চির উপর। হাফপ্যাণ্টের দুই পকেটে দুটো হাত চালিয়ে দেয়। গোয়েন্দা-গল্পের শেষ দিকে এটি গোয়েন্দার অবশ্য কর্তব্য, সে বিষয়ে তার জ্ঞান আছে। কোন্ কোন্ ক্লুর সাহায্যে সে অপরাধীকে চিনে ফেলেছে এটা বুঝিয়ে দেওয়াও গোয়েন্দার কর্তব্যভুক্ত (ঠিক ঐ ভঙ্গিতে শার্লক হোমসের একটা ছবি দেখেছিল হেবো কোন বইতে—অবশ্য তাঁর গায়ে ছিল ওভারকোট, মাথায় চোঙা টুপি আর মুখে পাইপ—সেসব কিছুই হেবোর নেই)। হেবো গম্ভীরভাবে বলে, 'রেল কোম্পানির ঐ বিজ্ঞপ্তিটা হাওড়া স্টেশনেই নজরে পড়েছিল আমার— "চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।" তখন থেকেই আমি সকলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করি। তারপর দেখলাম, লেখা আছে—"নিকটেই আছে।" আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ঐ সাধুবাবার উপর। কিন্তু সে তো আমার নিকটেই নেই, সে আছে বেশ খানিকটা দূরে!

এবার হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। মুখার্জিসাহেব বলেন, 'দেখলেন স্যার, খোকার কাণ্ড।'

কিন্তু আবগারি বিভাগের বড় সাহেব তখনও শুনতে চান হেবোর যুক্তি।

বলেন, 'তা যেন হল, কিন্তু তোমার নিকটে তো অনেকেই ছিল—ওকেই বা দেখালে কেন ?'

'বলছি। আমি প্রথমেই লক্ষ্য করি, আসানসোলে মেজদা যখন ওকে বললে যে বসবার জায়গা নেই, তখন ও মেজদাকে যে ভাষায় জবাব দিল তার বিন্দু-বিসর্গ বোঝেনি মেজদা। মেজদা যে কিছুই বোঝেনি তা বুঝতে পেরেছিলাম তার ফ্যাল ফ্যাল-করা চাহনি দেখে (এখন অবশ্য মেজদা যেভাবে তাকাচ্ছে তাকে অগ্নিদৃষ্টি



হো হো করে হেসে ওঠে সবাই

বলা উচিত)। তখনও কিন্তু উনি সরলভাষায় কিছু বললেন না। বাঙলা দেশে পশ্চিমারা বাঙালীর সঙ্গে, বিশেষ করে মেজদার মত ছেলেমানুষের সঙ্গে (মেজদার চেহারাটা এখন ফোটো তুলে রেখে দেবার মত) যে ভাষায় কথা বলে, সেটা সাধারণত হিন্দি-বাঙলার একটা খিচুড়ি ভাষা। "খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবিস" গোছের ভাষা। কিন্তু তা না বলে ইনি বললেন খাঁটি হিন্দি অথবা উর্দু। সিদ্ধান্ত : ইনি বাঙলা ভাষা একেবারেই জানেন না।

'তার একটু পরেই লক্ষ্য করে দেখি, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত আসনে জুত করে বসতে পাওয়ার পরই উনি বাবার আনন্দবাজারখানা টেনে নিলেন। যেহেতু ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে উনি বাঙলা ভাষা জানেন না, ফলে অনুসিদ্ধান্ত : উনি খবরের কাগজের ছবি দেখছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু শেষ রাত্রে গাড়ি যখন টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন হঠাৎ লক্ষ্য হয়, কামরায় দু-জন লোক জেগে আছেন। তার মধ্যে একজন ঐ ভদ্রলোক—তিনি তখনও খবরের কাগজ দেখছেন। আসানসোল থেকে গ্র্যান্ড-কর্ড লাইনে টানেল অন্তত তিন-চার ঘণ্টার পথ। এতক্ষণ ধরে কেউ খবরের কাগজে ছবি দেখে না। সিদ্ধান্ত : উনি আনন্দবাজারখানা পড়ছিলেন। তাহলে সবটা মিলিয়ে কি দাঁড়াল ? ইনি বাঙলা ভাষা বেশ ভালই জানেন—অক্ষর পরিচয়ও আছে ; কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। ইনি রাত জেগে আনন্দবাজার পড়তে পারেন, আর একটি বাঙালী বাচ্চার সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতে পারেন না। সম্ভবত ইনি বাঙালি, অথচ পশ্চিমার বেশে রেল-ভ্রমণ করেন। এঁর সঙ্গে আছে একটি স্যুটকেস—বসবার ভাল জায়গা পাচ্ছেন না—তবু সেই স্যুটকেসটাকে বাঙ্কের উপর না তুলে দিয়ে পাশে নিয়ে বসে আছেন। এদিকে পুলিসের ক্লু—চোর বাঙালী, এক সুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। এরপর আর কি বাকি থাকে স্যার আপনিই বলুন !'

মুখার্জিসাহেবের মুখের হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। তাঁর দিকে ফিরে ভোজপুরীবেশী বড়সাহেব ইংরাজিতে বললেন, 'আমার ইচ্ছে করছে এই ছেলেটির কাছে তোমাকে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ করে রেখে দিতে !'

মুখার্জিসাহেব মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

আর হেবোর দিকে ফিরে উনি বলেন, 'শার্লক হোমস্ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন—আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি তাঁর মত সার্থক সত্যান্বেষী হও। তবে বড় হয়ে যখন কোনান ডয়েল পড়বে তখন জানতে পারবে শার্লক হোমস্ শুধু বড় গোয়েন্দাই ছিলেন না ; নানান বিষয়ে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। বড় ডিডেকটিভ হতে গেলে প্রথমে তোমাকেও খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখতে হবে। কাল রাত্রে তুমি যেমন সকলকে লক্ষ্য করেছ, তেমনি আমিও সকলকে লক্ষ্য করতে করতে এসেছি ; যদিও সারা রাতই আমার নাক ডেকেছিল। তাই এর সুটকেসের ভিতর লুকানো আফিং-টাকে যেমন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, তেমনি তোমার হাফপ্যান্টের ডান পকেটে লুকানো "হত্যাকারী কে ?" বইটাকেও দেখতে পেয়েছি আমি। যদি শার্লক হোমসের মত বড় গোয়েন্দা হবার সত্যই ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রথমেই ঐ সব বাজে গোয়েন্দা-গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে। যাই হোক, আজকের দিনে তোমার সাফল্যের চিহ্ন-স্বরূপ তোমাকে উপহার দিলাম আমার এই হাতঘড়ি।'

নিজের মণিবন্ধ থেকে খুলে নিয়ে দামী রিস্টওয়াচটা তিনি পরিয়ে দিলেন হেবোর হাতে।

হেবো যদি আবগারি বিভাগের ঐ বড়সাহেবের উপদেশ মেনে নিয়ে তার গোয়েন্দাগিরির খেয়াল ত্যাগ করতে পারত তাহলে আমার গল্পেরও শেষ হত এখানে। বলতে পারতাম, এরপর থেকে হেবো মন দিয়ে পড়াশুনো শুরু করল। বলতে পারতাম—হেবোর গোয়েন্দা-গল্প শুনতে হলে আরও বছর আট-দশ পরে তোমাদের আসতে হবে ভাই।

কিন্তু হেবো মনেপ্রাণে ওঁর কথাটা গ্রহণ করতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? অত বড় সাফল্যে তার মাথাটা ঘুরে গেল। খবরের কাগজে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল—'বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আফিংচোর ধৃত' এই শিরোনামা দিয়ে। ছুটির পর রীতিমত সাড়া পড়ে গেল ওর স্কুলে। বন্ধুরা সবাই ওকে নিয়ে কদিন খুব হৈ-চৈ করল। এমনকি হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত ওকে ডেকে নিয়ে ওর বুদ্ধির তারিফ করলেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাইয়ের ঐ দোষ? শুধু প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, বললেন—'বড় গোয়েন্দা হতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে অধিকার থাকা চাই'। বাড়িতেও খাতির বেড়ে গেল হেবোর। মেজদা আর সাহস করে কোন কথাই বলে না। গর্বে হেবোর মাটিতে পা পড়ে না! ডিটেকটিভ বইয়ের প্রতি একটা অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসল তাকে। রাজ্যের গোয়েন্দাগল্পের বই যোগাড় করে সে শুধু পড়তে থাকে রাত জেগে। সেবার পরীক্ষায় আরও খারাপ ফল হল তার। বাবা বকলেন, কাকাও দুঃখ প্রকাশ করলেন; কিন্তু হেবোর মনে কোনও দুঃখ নেই, বলে—'পাশ তো করেছি!'

ক্লাশ-প্রমোশন নিয়ে হেবো এবার নাইনে উঠেছে। ওর কাকা বারবার বললেন 'হেবো, এই দুটো বছর একটু মন দিয়ে পড়াশুনো কর্। সায়েন্স নিয়েছিস হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন না পেলে কোন ভাল কলেজে সীট পাবি না।'

হেডমাস্টারমশাইও তাকে কাছে ডেকে নিয়ে অনেক ভাল ভাল উপদেশ দিলেন, বললেন—'তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে থাকতে এ বছর আমার স্কুল থেকে যদি কেউ স্কলারশিপ না পায়, তাহলে সে দুঃখ আমার চিরকাল থাকবে।'

হেবো মনে মনে বললে, 'স্কলারশিপ আর কটা টাকা হবে? তার চেয়ে একটা বড় চুরির কিনারা করতে পারলে অনেক বেশি টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।'

হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'আমাকে কথা দাও, স্কুল থেকে পাশ করে যাবার আগে আর গোয়েন্দাগিরি করবে না তুমি।'

হেবো বাধ্য হয়ে বলে, 'আচ্ছা বেশ।'

এই সময় হেবো ডাকে একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা অপরিচিত কিন্তু চিঠি পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে কে লিখেছেন তাকে। চিঠিখানায় লেখা ছিল—

কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমায় ভুলে গেছ কি না জানি না। আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি। তোমার মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু আমার সহকর্মী। তাঁর কাছেই তোমাদের সব খবর পাই। তাঁর কাছেই শুনলাম, এ বছর ক্লাস-পরীক্ষায় তুমি খুব সুবিধা করতে পারনি। প্রমোশন পেয়েছ বটে, কিন্তু সংস্কৃতে নাকি তোমার পাশ নম্বর ছিল না। মনে হয় আমার কথা তুমি কানে তোলনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করলে এত খারাপ ফল কখনো হতে পারে না। আমি তোমার উপর অনেক ভরসা করেছিলাম। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ। এখন আবার বলছি, ঐ সব বাজে ডিটেকটিভ বই পড়া ছেড়ে পড়াশুনায় মন দাও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ভালভাবে জানা না থাকলে কখনও বড় সত্যান্বেষী হওয়া যায় না। জান তো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, চালাকির দ্বারা কখনও কোনও মহৎ কাজ হয় না। আশা করি এবার পরীক্ষার ফলাফল দেখে তোমার চৈতন্য হবে।

আমাকে চিনতে পারলে তো ? নেহাত না পারলে, তোমার বাঁ হাতের কব্জির কথা কান পেতে শোন। আমার ঠিক-ঠিক পরিচয় সে সে টিক্-টিক্ করে বলে দেবে।

আশীর্বাদক

ইতি—

এই চিঠিখানা পেয়েও কিন্তু হেবোর কোন ভাবান্তর হল না। সে তখন মেতে আছে তাদের স্কুলের থিয়েটার নিয়ে! পুরস্কার বিতরণী সভায় শহরের বিশিষ্ট অতিথিরা দল বেঁধে আসেন। ছেলেদের গার্জেনরাও নিমন্ত্রিত হন। প্রতি বছরই এই দিনে একটা বড় রকমের হৈ-চৈ হয়। এবার স্থির হয়েছে, ছেলেরা অভিনয় করবে রবীন্দ্রনাথের নাটক—মুকুট। হেবো ভাল অভিনয় করে, সব গুণই আছে তার। ছেলেরা কেউ-কেউ বলে, ওকে মেজকুমার ইন্দ্রকুমারের পার্টেই মানাবে। ঐটেই সব-চেয়ে ভাল পার্ট। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'না, হেবো করবে রাজধরের পার্ট—ঐটেতেই ওকে ঠিক মানাবে।'

কথাটা হেবোর ভাল লাগেনি। এ যেন তাকে অপমান করতেই বলা। রাজধর হচ্ছে কুচক্রী, বদমায়েশ। কিন্তু থিয়েটার করার নিয়ম হচ্ছে—কোন্ পার্ট পেয়েছ তা নিয়ে মনে কোন খুঁতখুঁতানি না রেখে যেটা পেয়েছ সেটাই ঠিকমত রূপায়িত করা। এটাই হচ্ছে নাটক অভিনয়ের মূল কথা। সবাই যদি নায়ক হতে চায়, তাহলে নাটক হয় না—হয় একটা মন-কষাকষির পণ্ডশ্রম। তাই হেবোও মনে কোন খেদ না রেখে ছোট রাজকুমার রাজধরের পার্টটা মুখস্থ করে নিল।

গোল বাধল রৎনাটাকে নিয়ে। রতন হেবোদের চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। খুব বড়লোকের ছেলে। ওর বাবা নাকি কোথাকার কোন স্টেটের রাজা ছিলেন।

এখন অবশ্য রাজ্য নেই—ভারতবর্ষের সব স্টেটের রাজ্যই এখন ভারত সরকার নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কীর্তি এটা, হেবো জানে। তা হোক, তবু রতনরা খুব বড়লোক। ওর বাবা যে এককালে রাজা ছিলেন এটা কিছুতেই ভুলতে পারে না রতন। ক্লাসের ছেলেরা তাকে সমীহ করে চলে। কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি ওকে প্রত্যহ স্কুলে পোঁছে দিয়ে যায়—আবার ঠিক চারটের সময় ওকে নিতে আসে।

রতনকে দেওয়া হয়েছিল ছোট রাজকুমার রাজধরের বন্ধু ধুরন্ধরের চরিত্র। অর্থাৎ হেবোর সঙ্গেই তাকে অভিনয় করতে হবে। রতন বলে—'দেখিস না কি কাণ্ড করি আমি! তোরা তো সব টিনের তরোয়াল ঘোরাবি। আমি নিয়ে আসব সত্যিকারের তরোয়াল! সোনার কাজ করা বাঁট—ইয়া বড়! আমার বাবার তরোয়াল!'

সবাই অবাক হয়ে শোনে।

হেবো বন্ধুদের বলে, 'যতসব চালবাজি! সত্যিকারের তরোয়াল কখনও থাকতে পারে নাকি ওর বাবার! সে-সব সর্দারজি কবেই কেড়ে-কুড়ে নিয়েছেন।'

রতন বলে, 'আচ্ছা দেখা যাবে!'

ক্রমে এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট দিন। ড্রেস-রিহার্সালের দিনে সবাই জমায়েত হয়েছে স্কুল ছুটির পর। কাল থিয়েটার, আজ তাই সেজে-গুজে সবাই মহড়া দেবে। স্কুলের বড় হলঘরটায় স্টেজ বাঁধার কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকটি ছেলে লাল নীল কাগজের শেকল বানিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে টাঙিয়ে দিচ্ছে। যারা অভিনয় করবে তাদের সাজ-পোশাক পরানোর কাজ হয়ে গেছে। বাঙলার স্যার যখন রতনের কোমরে ভাড়া-করে-আনা টিনের তরোয়ালটা বেঁধে দিতে গেলেন তখন রতন বলে ওঠে, 'আমাকে স্যার ওসব টিনের তরোয়াল দিতে হবে না। আমার সত্যিকারের তরোয়াল চাই।'

বাঙলা স্যার অবাক হয়ে বলেন, 'সে আবার কি রে রৎনা! সত্যিকারের তরোয়াল আমি কোথায় পাব?'

ঠিক সেই সময়েই স্কুলের গেটে এসে থামল কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িটা। উর্দিপরা একজন চাপরাশি 'হলে' ঢুকে মাস্টারমশাইকে আভূমি নত হয়ে সেলাম করে। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল। রতন হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নেয়। সকলেই ছুটে আসে জিনিসটা দেখতে। সত্যিই দেখবার মত জিনিস বটে! বাঙলা স্যার খাপ থেকে সেটাকে বার করতেই সকলের চোখ ঝলসে গেল যেন। ইয়া লম্বা ঝকঝকে একটা ইস্পাতের তরোয়াল। মুঠটায় সোনালি কাজ করা। খাপটার গায়েও নানান কারুকার্য। রমেশবাবু ইতিহাস পড়ান, সেটা নেড়ে-চেড়ে বললেন—'এ যে দেখছি ভিক্টোরিয়া যুগের সোর্ড! এতো ত্রিপুরার সৈন্যদলে বেমানান হবে!'

মুখ শুকিয়ে যায় রতনের। হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'আহা তা হোক। অত খুঁটিয়ে আর কে দেখতে যাচ্ছে! বেচারি অত শখ করে এনেছে! দিন রমেশবাবু, ওটা ওর কোমরে বেঁধে।'

রমেশবাবু অগত্যা সেটা রতনের কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। বাঙলা মাস্টারমশাই তবু বলেন, 'কিন্তু আরও একটা কথা। রাজপুত্রদের তরোয়ালের চেয়ে এটা অনেক লম্বা আর অনেক দর্শনধারী। ধুরন্ধর সামান্য সৈনিক,—এটা খুব খারাপ দেখাবে না কি?'

হেবো তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ স্যার, তার চেয়ে ওটা সুবলদার কোমরে বেঁধে দিন। সুবলদা ইন্দ্রকুমারের পার্ট করছে—ও-ই আসলে গপ্পের হিরো। তাছাড়া সুবলদা অনেক লম্বা। ঠিক ফিট করে যাবে।'

সুবল ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। তালগাছের মত মাথায় বেড়েছে খালি। লোলুপ দৃষ্টিতে বেচারি তাকিয়ে দেখছিল তরোয়ালটার দিকে।

রতন প্রতিবাদ করে, 'ঈস! এ আমার বাবার জিনিস। আমি আর কাউকে দেব কেন?'

হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'কিন্তু ওটা যে মাপে তোমার পক্ষে অনেক বড় হচ্ছে রতন।'

'হোক। আমার বাবার তরোয়াল আমি কাউকে দেব না।'

সকলেই লজ্জা পেল ওর বেহায়াপনায়। হেবো মর্মান্তিক চটে গেল। কিন্তু মাস্টারমশাইরা সকলেই রয়েছেন। তাঁরা আর কিছু বললেন না। অগত্যা ওটা রতনের কোমরেই বাঁধা থাকল।

মহড়া শেষ হয়ে গেলে বন্ধুদের মধ্যে আবার ঐ নিয়ে গুজ-গুজ ফুস-ফুস শুরু হয়ে গেল।

ক্লাস টেনের নবীনদা বলে, 'রতনাটা সেলফিশ নাম্বার ওয়ান। ওর উচিত ছিল ওটা সুবলকে দেওয়া।'

গোবরা বলে, 'বিশেষত যখন হেড স্যার পর্যন্ত বললেন—'

ট্যানা বলে, 'রতনাটাকে জব্দ করা যায় না?'

"কি করে?"

'ধর, কাল যদি ওর তরোয়ালখানা হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়?'

'সে অসম্ভব। ও তো তরোয়ালখানা সারাক্ষণ কোমরে বেঁধে ঘুরে বেড়াবে। তরোয়াল চুরি গেলেই হেড-স্যার শার্লক হেবোকে তলব করবেন, 'চোর খুঁজে দিতে। আর তৎক্ষণাৎ আমরা সদলবলে ধরা পড়ে যাব!

হো-হো করে হাসল হেবো।

ট্যানা বলে, 'তার চেয়ে চল, সবাই মিলে ড্রইং মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে

ব্যাপারটা খুলে বলি। তিনি কি বুদ্ধি দেন শোনা যাক।'

'তাই চল তাহলে।'

সদলবলে ওরা এসে হাজির হল ড্রইং ক্লাসে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ; কিন্তু ড্রইং মাস্টারমশাই বাড়ি যান নি। তিনি একগাদা পীসবোর্ড কেটে, শল্মা-চুম্‌কি-রাঙতা মুড়ে একটা সুন্দর মুকুট বানাচ্ছিলেন। ত্রিপুরা রাজার রাজমুকুট—কাল থিয়েটারে লাগবে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে মুকুট বানানো দেখল। কী সুন্দর কারুকার্য করেছেন তাতে ড্রইং স্যার।

শেষ পর্যন্ত ওরা সব কথা খুলে বলল ড্রইং স্যারকে। ধৈর্য ধরে তিনি সবটা শুনলেন এবং শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তোমরা ঠিকই বলেছ, রতনের পক্ষে এটা অন্যায়ই হয়েছে। টীম-ওয়ার্কের কথা না মনে রাখলে কখনও ভালো থিয়েটার করা যায় না!'

ট্যানা বলে, 'তাছাড়া হেড-স্যারও ওকে বললেন তরোয়ালটা সুবলকে দিতে।'

ড্রইং স্যার বলেন, 'ঠিকই তো। তাঁর কথা অমান্য করা খুবই অন্যায় হয়েছে।'

হেবো আর সহ্য করতে পারে না। বলে ওঠে, 'অন্যায় যে হয়েছে, সে তো সবাই মেনে নিয়েছে স্যার। এখন অন্যায়ের প্রতিকার কি করা যায় বলুন।'

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বলেন, 'দেখ, একটা কথা আছে। যে সয়, সে রয়।'

ব্যাস্, এক কথায় মামলা ডিসমিস্।

হেবো কিন্তু ছোড়নেওয়ালা নয়। সে বলে, 'ও ছাড়া আরও একটা কথা আছে স্যার—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঐরকম একটা কথাও আছে বটে। যাক, এখন তোমরা যাও। আমি মুকুটটা শেষ করি।'

ড্রইং মাস্টারমশাই ঐ রকম আপন-ভোলা মানুষ।

বন্ধুরা হেবোকেই মুরুব্বি পাকড়াও করে। বলে, 'তুই একটা যা হয় বিহিত কর্।'

হেবো বলে,—'দেখি ভেবে!'

পরদিন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান। সন্ধ্যা ছয়টা তিন মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ছয়টা তিন মিনিট কেন? তার একটা ইতিহাস আছে। আজ এগার বছর ধরে এই ছয়টা তিন মিনিটেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই হেডমাস্টারমশাই আসার পর থেকে। তিনিই এ নিয়মটা চালু করেছেন। আগে এমন বহুবার হয়েছে যে ছাত্ররা সেজে-গুজে তৈরি হয়ে আছে, অথচ প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট জনসমাগম হয়নি বলে

অভিনয় শুরু করা যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ-পত্রে 'ছয়টা' লেখা থাকলে সকলেই ধরে নিতেন—বাঙালীর টাইম, সাড়ে ছ-টা নাগাদ শুরু হবে আর কি। আবার কোন-কোন বছর ছেলেরাও ঠিক সময়ে তৈরি হত না—ভাবত ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে আর কি লাভ? দর্শকরা তো সেই সাড়ে ছ-টার আগে আর আসছেন না!

ছাত্র আর দর্শকদের সময়ানুবর্তিতার মূল্যটা বুঝিয়ে দিতে হেডমাস্টারমশাই একটা ফন্দি বার করলেন। পরের বৎসর নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপা হল—অনুষ্ঠান শুরু হবে ইণ্ডিয়ান স্টাডার্ড টাইম সন্ধ্যা ছয়টা বেজে তিন মিনিটে।'

যাঁরা নিমন্ত্রণ-পত্র পেলেন তাঁরা একটু অবাক হলেন। ব্যাপার কি? ছটা নয়, সওয়া-ছটা বা সাড়ে-ছটা নয়—একেবারে ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে? কেউ কেউ প্রশ্নও করলেন হেডমাস্টারমশাইকে—'এ আবার কি মশাই? ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে?'

হেডমাস্টারমশাই গম্ভীর হয়ে উত্তরে বলেছিলেন, 'ছটা বেজে তিন মিনিট মানে সাতটা বাজতে সাতান্ন মিনিট।'

সে বছর কৌতূহলের আতিশয্যে দর্শকেরা দেখতে এলেন ব্যাপারটা। ব্যাপার কিছুই নয়, হেডমাস্টারমশাই ছয়টা বাজতে দুই মিনিটে প্রথম ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পর্দা উঠে গেল ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের ঠিক ছয়টা বেজে তিন মিনিটে।

সেই থেকে আজ এগারো বছর ধরে এ স্কুলের ট্র্যাডিশান সন্ধ্যা ছয়টা বেজে তিন মিনিটে অভিনয় শুরু করা। সেই বছর থেকে দর্শকেরা জেনে গেছেন, ছয়টা পাঁচ মিনিট পরে হলে ঢুকলে দুই মিনিটকালের অভিনয় দেখা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন।

পাঙচুয়ালিটি রক্ষা করার এ ব্যবস্থাটা বেশ মজার, নয়?

যাক, যা বলছিলাম। যারা অভিনয় করবে তারা চারটের মধ্যে সবাই হাজিরা দিয়েছে। ড্রইং স্যার আর রমেশবাবু একের পর এক মেক-আপ দিয়ে যাচ্ছেন। সাদা সাদা চুল দাড়িতে ক্লাস ইলেভেনের হারানদাকে আর চেনাই যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ত্রিপুরাবাহিনীর বৃদ্ধ সেনাপতি ঈশা খাঁ। যুবরাজের সাজ পোশাকও পরা হয়ে গেছে। তরণীদা সেজেছে ত্রিপুরাধিপতি। ঝলমলে সাজ পোশাকে মুকুট মাথায় ঘুর ঘুর করছে। এবার সুবলদা বসেছে ইন্দ্রকুমারের মেক-আপ নিতে। রতন সকলের আগে ধুরন্ধরের মেক-আপ নিয়ে বিরাট তরোয়ালটা কোমরে বেঁধে স্টেজের উপর পায়চারি করে পার্ট মুখস্থ করছে। অতিকায় তরোয়ালটা ঠক্ ঠক্ করে মাটিতে ঠোকা খেয়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। নিচু ক্লাসের ছেলেগুলো বারে বারে উঁকি দিচ্ছে গ্রীনরুমের ভিতর, আর উঁচু-ক্লাসের ছেলেদের ধমক খেয়ে বারে বারে ছুটে পালাচ্ছে।

যারা ভলাণ্টিয়ার হয়েছে, তাদের জামায় একটা করে রিবন-বাঁধা ব্যাজ। বুক, তথা ব্যাজ ফুলিয়ে তারা ঘন ঘন আসছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে গ্রীনরুমে! খবর দিয়ে যাচ্ছে 'হলে' কত লোক হয়েছে, কে কে এসেছেন। হেডমাস্টারমশাই একবার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে গেলেন, 'ফারদার এইটিন মিনিটস্ বয়েজ! ছটা বাজতে কুড়ি হয়েছে, ঠিক ছটা বাজতে দু'মিনিটে ওয়ার্নিং বেল পড়বে। তার মধ্যে একেবারে রেডি হওয়া চাই। ছটা তিনে পর্দা উঠবে মনে থাকে যেন, আর য়ু অল রেডি?'

এরা বলে, 'নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, আমরা রেডি।'

বস্তুত তখনই সবাই তৈরি। সেই মুহূর্তেই পর্দা ওঠালে ওরা অভিনয় শুরু করতে পারে। ফলে মিনিট কুড়ি আগেই ওরা তৈরি হয়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল রমেশবাবুর।

হঠাৎ তারিণী এসে বলে, 'স্যার, আমার মুকুট?'

'মুকুট? সে তো তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

"আমার মাথায় কিছু নেই স্যার!"

রমেশবাবু তখন একজন প্রতিহারীর পাগড়িটা খুলে, নতুন করে বাঁধছিলেন, হেসে বললেন, সে তো পরীক্ষার খাতা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মাথার উপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, কেমনতর মহারাজা তুমি?

কিন্তু ব্যাপারটা যে রসিকতার নয়, তা বোঝা গেল অল্প পরেই! মুকুট কোথাও পাওয়া গেল না। সর্বনাশ! খোঁজ খোঁজ! স্টেজের উপর নেই, গ্রীনরুমে নেই, আশেপাশে কোথাও পড়ে নেই। অত বড় জিনিসটা এতগুলো লোকের চোখের উপর দিয়ে কর্পূরের মত উবে তো যেতে পারে না? তাহলে? সবাই মিলে তারিণীকে গালাগালি করতে থাকে। এত বড় আহাম্মক, যে মাথার উপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, টের পায় না? খবর পেয়ে হেড-স্যার ছুটে এলেন। তাঁর মাথা-ভরা টাক, নাহলে হয়ত পট-পট করে মাথার চুলই ছিঁড়তেন তিনি। বলেন, 'শেম, শেম, বয়েজ! এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন তোমরা! আর এগারো মিনিট মাত্র বাকি আছে, এখন "মুকুট" নাটকে মুকুটই নেই? যেমন করে পার খুঁজে বার কর! ঠিক ছটা তিন মিনিটে আমি পর্দা তুলব। যদি এর ভেতর খুঁজে না পাও— তাহলে আমি নিজে স্টেজে গিয়ে অ্যানাউন্স করব যে আমার ছেলেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য অভিনয় শুরু হতে দেরি হবে।'

কী কেলেঙ্কারি!

এইসময়ে কে এসে বলল, 'গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট এসেছেন স্যার।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন হেডমাস্টারমশাই।

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। সবাই মিলে দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজতে থাকে। রমেশবাবু এসে জেরা শুরু করেন 'তারিণী, তোমার একেবারে কিছু মনে পড়ছে

না ? লক্ষ্মী বাবা, একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা কর।'

তারিণী আমতা আমতা করে। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

এবার মহড়া নিতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং হেডপণ্ডিতমশাই তাঁর বিশাল বপুখানি নিয়ে। স্বনামধন্য হেডপণ্ডিতমশায়ের নামে সারা স্কুল থরহরি কাঁপে। রমেশবাবুকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'ও আপনার কর্ম নয় মশাই! অমন বাপু-বাছা করলে মুকুটের সন্ধান পেতে রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে। লাঠ্যৌষধিই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য, তদ্ভিন্ন এর সমাধান অসম্ভব! ছিদেম তোর যষ্ঠিটা দে দিকিন।'

শ্রীদাম প্রতিহারীর পার্ট করবে। ভয়ে ভয়ে ত্রিপুরাবাহিনীর প্রতিহারী তার তেলপাকা লাঠিখানা এগিয়ে দেয় হেডপণ্ডিতের দিকে। পণ্ডিতমশাই সেটা বাগিয়ে ধরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক পাড়েন, 'তেরো! ইদিকে আয়!'

নবমীর বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে তারিণী এগিয়ে আসে।

'বল্ অকালকুষ্মাণ্ড, অনড্বান্! মাথা থেকে মুকুট খুলেছিলি একবারও? অনৃতভাষণ করলে এক ডাণ্ডায় তোর রাজাগিরি ঠাণ্ডা করে দেব!'

ত্রিপুরাধিপতি কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'পরচুলে ছারপোকা ছিল স্যার, তাই একবার মাত্র মাথা থেকে মুকুটটা খুলেছিলুম!'

'বর্ত্মে এস বাছাধন! মুকুট তাহলে খুলেছিলি? তখন কার হাতে দিয়েছিলি? সত্য কথা বলবি বলীবর্দ!'

'রতনকে সেটা ধরতে দিয়েছিলুম স্যার!'

'হুম্! রৎনা! ইদিকে আয়!'

তরোয়াল খট্ খট্ করতে করতে এবার এগিয়ে আসে রতন। ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলার আগের মুহূর্ত যেন!

'আরে আরে, তোর কটিবন্ধে উটি কি? ও তো টিনের তরবারি নয়? দেখি, দেখি ওটা বার করে দে তো!'

কাঁপতে কাঁপতে রতন তরোয়ালখান বার করে দেয়।

অস্ত্রটা হাতে পেয়ে এবার যেন মহিষাসুর হাসলেন।

'বাঃ! খাসা জিনিস!'

লাঠিখানা ছিদামকে ফেরত দিয়ে তরোয়ালখানাই বাগিয়ে ধরেন এবার। ঠিক যেন মহিষাসুর। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত ঘুরছে। তফাৎ এই যে মহিষাসুরের টিকি নেই, পণ্ডিতমশায়ের বিজয়কেতন ফ্যানের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। কোথাও কিছু নেই, হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি—'বল ছুছুন্দর! তারিণীর হাত থেকে মুকুট নিয়ে কোথায় রেখেছিলি?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে রতন বলে, 'আমি জানি না স্যার, আমি নিশ্চিত তরণীদাকেই ফেরত দিয়েছিলাম বোধহয়!'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন পণ্ডিতমশাই; 'ওরে আমার তর্কচঞ্চু! একই নিশ্বাসে "নিশ্চিত" আর "বোধ হয়"! ঠিক করে বল্ অলম্বুষ! ফেরত দিয়েছিলি, না নিজের মাথায় পরেছিলি ?"

'একবার পরেই ফেরত দিয়েছিলাম স্যার!"

'বত্মে' এস বাছাধন! কেন পরেছিলি? তুই বেটা ধুরন্ধর সৈনিক, তুই কোন্ সাহসে ত্রিপুরাধিপতির রাজমুকুট মাথায় পরলি, তাই আগে বল্! না হলে ঐ ফুটন্ত জল দেখছিস ?'



তুই বেটা ধুরন্ধর সৈনিক, তুই কেন রাজমুকুট মাথায় নিয়েছিলি তাই আগে বল্!

গ্রীনরুমের ওপাশে হাঁড়িতে চায়ের জল চড়ানো আছে। সেইদিকে নাটকীয়ভাবে পণ্ডিতমশাই তরোয়ালটা নির্দেশ করেন। রতন তাকিয়ে দেখে সেদিকে।

'ব্যাকরণ পড়িস? বল্ বলীবর্দ! নিপাততে সিদ্ধ মানে কী?'

রত্না ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'মুকুট খুঁজে না পেলে আজ তোকে ঐ ফুটন্ত জলে নিপাতনে সিদ্ধ কাকে বলে তাই শেখাব!'

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে রত্না।

হেডমাস্টারমশাই ঠিক তখনই ফিরে আসেন। ঠিক ছটা বাজে তখন। কেমন যেন শুকিয়ে গেছেন তিনি এই কয় মিনিটেই। বলেন, 'বয়েজ! এই এগারো বছরের ট্র্যাডিশান আজ নষ্ট হবে? পাঙচুয়ালি শুরু করতে পারব না আমরা?"

রমেশবাবু বলেন, 'না না, আমরা ঠিক সময়েই শুরু করব। পরিমল একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে—তার মধ্যেই ওটা আমরা খুঁজে বার করছি।'

ঠিক ছ-টা বেজে তিন মিনিটে যথারীতি পর্দা উঠে গেল। কথা ছিল পরিমল গাইবে—'সবারে করি আহ্বান'; কিন্তু সে নার্ভাস হয়ে শুরু করল—'তোমার মহা-বিশ্বে কিছু হারায় নাকো প্রভু।'

গান শেষ হয়ে এল, তখনও হারানো মুকুটের পাত্তা নেই। পরিমল উইংসএর দিকে একনজর দেখে নিয়ে অন্তরাটা ফিরেফিত্তি শুরু করে। হেডমাস্টারমশাই হঠাৎ হেবোর দিকে ফিরে বলেন, 'একি হেবো! তুমি এমন চুপচাপ বসে আছ যে? খুঁজছ না? তোমরা থাকতে একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে অথচ তোমরা হাত পা ছেড়ে বসে আছ?'

হেবো মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে, 'আপনি যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন স্যার! না হলে এমন সহজ কেস্‌টা তো কখন সলভ্‌ করে ফেলতাম!'

চমকে ওঠে সবাই। রমেশবাবু বলেন, 'তার মানে? তুমি বলে দিতে পার মুকুট কে নিয়েছে?'

অম্লানবদনে হেবো বললে—'তা পারি বই কি স্যার।'

'কী আশ্চর্য! তবে অমন চুপ করে বসে কেন?'

'হেডমাস্টারমশাই যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন।'

'কে? কে নিয়েছে মুকুট?' চোখ লাল করে প্রশ্ন করেন হেডপণ্ডিতমশাই।

হেডমাস্টারমশাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তার চেয়ে বড় কথা, মুকুটটা বর্তমানে কোথায় আছে তা জান?'

"তাও জানি স্যার!"

'কোথায়? কোথায়?" হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই।

গোবেচারির মত মুখ করে হেবো হেডমাস্টারমশাইকে বলে, 'বলব স্যার?'

'বল, বল, আমাকে আর দগ্ধে মের না!'

'বলছি স্যার। কিন্তু হারানো জিনিস খুঁজে দিলে আমাকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে?'

সবাই চমকে ওঠে। রমেশবাবু আত্মসম্বরণ করে শুধু বলেন—'পুরস্কার! তুমি কী বলছ হেবো! এই কি দর-দাম করবার সময়?'

হেবো একগুঁয়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডপণ্ডিতমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই নিজেই বলেন—'বেশ, বল বিনিময়ে কী পুরস্কার চাও তুমি ?'

অম্লান বদনে হেবো বললে—'আর কিছু নয়, রতন তার তরোয়ালটা সুবলদাকে দিক।'

বলা বাহুল্য রতন তাতে এক কথায় রাজি।

এক লহমায় হেবো গ্রীনরুমের এক অন্ধকূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনল ত্রিপুরাধিপতির অপহৃত রাজমুকুট।

হেডপণ্ডিতমশাই বলেন—'এবার বল্ হেবো, কোন্ অনড্বান…'

'না, এখন নয় পণ্ডিতমশাই ! ওটা আমি দেখব।—হেবো, অভিনয় শেষ হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'করব স্যার।'

পরিমলের গান শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল অভিনয়।

সবাই চলে গেলে হেবোর ডাক পড়ল হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে।

সেখানে দু-জনের মধ্যে কি কথা হয়েছিল আমি জানি না। তবে খবর নিয়ে জেনেছি হেডমাস্টারমশাই মুকুট চুরির অপরাধে স্কুলের কোন ছেলেকে কোন শাস্তি দেন নি।

শাস্তি পেয়েছিল নিরপরাধ হেবো। সেই ডাক-পিয়ন মারফৎ। প্রাইজ ডিস্ট্রি-বিউশনের দিন সাতেক পর সে আবার পেল একখানা চিঠি :

'ছিঃ হেবো ! শেষে আজকাল নিজেই চুরি করে নিজে গোয়েন্দাগিরি করছ !'

পলাশপুর পর্ব

বছর ঘুরে এল। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অবিনাশবাবু কোথাও যেতে পারবেন না। ছুটির মধ্যেও তাঁকে দু-একদিন নাকি কলেজে যেতে হবে। মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হেবোর। গত বছর এমন একটা ছুটিতেই কাশী যাওয়ার পথে সে অত বড় কাণ্ডটা করে। পথে বার না হলে কি আর চোর-ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায়? অত বড় সুযোগটা বোধহয় এবার নষ্ট হয়।

হঠাৎ হেবোর মা একদিন বললেন—'তোদের তো ছুটিই আছে, আমাকে একবার পলাশপুরে নিয়ে চল্‌ না। অনেক দিন জ্যাঠামশাইকে দেখিনি—শুনেছি তাঁর খুব অসুখ। পারবি নিয়ে যেতে?'

হেবো তো একপায়ে খাড়া। মায়ের জ্যাঠামশাই অর্থাৎ দাদুকে খুব ছেলেবেলায় একবার দেখেছিল ওরা। পলাশপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার তিনি। অনেক গল্প শোনা আছে দাদুর নামে। এবার স্বচক্ষে দেখা যাবে। বাদ সাধল মেজদা, বললে—'দেখ মা, নিয়ে আমি তোমাকে যেতে পারি, কিন্তু হেবোকে সামলানো আমার কর্ম নয়! কখন ওর মাথায় পোকা নড়বে আর ও গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে! সুতরাং হয় হেবো এখানে থাকুক আমি যাই অথবা আমি থাকি হেবো যাক।'

মা হেসে বললেন—'না, হেবোকে আমিই সামলাবো। তোকে ভাবতে হবে না।'

অগত্যা হেবো, তার মা আর মেজদা একদিন এসে হাজির হলেন পলাশপুরে। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক পলাশপুর শহরেই শুধু নয় সারা অঞ্চলটার মধ্যে সবচেয়ে পশারওয়ালা ডাক্তার। বয়স ষাটের কোঠায়, সত্তর ছুঁই-ছুঁই। তবু এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। মস্ত বাড়ি, গাড়ি, বাজারের উপর ডিসপেন্সারি। রায়সাহেব নিজে নিঃসন্তান। তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে ছাড়া অত বড় বাড়িটায় আর যারা থাকে তারা চাকর ড্রাইভার অথবা দরোয়ান শ্রেণীর। রায়সাহেবের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই ভাগ্নেটির দুর্ব্যবহারে নাকি আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই একে-একে তাঁকে ত্যাগ করেছে। হেবোর মাও এজন্য আসতেন না তাঁর জ্যাঠার কাছে, তবে আজ নাকি তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ, তাই এসেছেন।

দাদুর বাড়িতে পেঁছেই হেবোর মনে হল, আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারি-ভারি। দাদু কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন না। গুম হয়ে পড়ে আছেন নিজের শোবার ঘরে। ওদের খাওয়া-থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা করল পুরনো দিনের চাকর—নটবর।

ভাগ্নেপ্রবর লুটুবাবু সারা জীবনে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি কিছুই করেন নি। প্রয়োজন হয় নি। ছেলেবেলা থেকে মামার অন্নধ্বংস করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ ছিল না তাঁর। তাই তিনি শখের আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলেন। ছবি আঁকা, মডেল গড়া—এইসব নিয়েই তাঁর সময় কাটে। বাড়ির একতলায় তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য। তার নাম 'স্টুডিও'। সেখানে রাখা আছে তাঁর ছবি আর মাটির মূর্তি। সেখানে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না। ভাগ্নেপ্রবরের ঐ ঝাঁকি-দর্শনের মধ্যেই হেবো চিনে ফেলেছে লোকটাকে। এমন কাঁচা-পাকা বেড়াল-গোঁফ কখনও কোন আর্টিস্টের হয় ? তাই কি ওঁর স্টুডিও সর্বদা তালাবন্ধ ?

হেবোর মা একবার তাঁকে আড়ালে ডেকে অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু ভাগ্নেপ্রবর কিছুই ভাঙলেন না। বোঝা গেল এঁদের আগমনে লুটুবাবু খুশি হতে পারেন নি। অসুখের কথা জানাবার জন্য মা যখন বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন উনি শুধু বললেন—টাকার গরম দিদি। বেশি টাকা থাকলে অমন শখের অসুখ অনেকেরই হয় !'

এরপর আর কথা চলে না। হেবোর মা ওদের দু-ভাইকে ডেকে বললেন—'দেখ, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোদের দাদুর ঠিকমত চিকিৎসাই হচ্ছে না। তোদের উচিত, যে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করছেন তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নেওয়া। দরকার হলে তোদের বাবা অথবা মেসোকে টেলিগ্রাফ করে আনতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, লুটুকে আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে নটবর হুড়মুড় করে এসে পড়ে মায়ের পায়ের উপর। বলে—'আপনি ঠিকই ধরেছেন মা ! বুড়ো কর্তা একেরে বিন-চিকিচ্ছেয় মারা যাচ্ছেন !'

এইবার একটা সূত্র পাওয়া গেল। নটবরের কাছ থেকে অসুখের একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস সংগ্রহ করা শক্ত হল না। মাসখানেক আগে এক রাত্রে রায়সাহেব নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনা ঘটে তাঁরই ডিসপেন্সারি-ঘরে। তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে আনা হয়। পরদিনই তাঁর প্রবল জ্বর আসে। আর এরপর থেকেই রায়সাহেব একেবারে বদলে গেছেন। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন। কাছে লোক না থাকলে আঁতকে ওঠেন। শোবার ঘর ছেড়ে একেবারেই বার হন না। ওঁর বাইরের ঘরটা তালাবন্ধ করে ফেলে রেখেছেন তার পর থেকে। কাউকে ঢুকতে দেন না সে ঘরে। কেন, তা কেউ জানে না।

মেজদা বলে—'এ রকম হঠাৎ ভয় পাবার কারণটা কি ?'

'আজ্ঞে বুড়ো কর্তার দার্জিলিঙে একটা বাড়ি আছে। গরমকালটা তিনি প্রতি বছর সেখানে কাটিয়ে আসেন। সেবার সেখান থেকে তিনি নিয়ে এলেন একটা নেপালী দরোয়ান। মোহন থাপা। আমরা তাকে বলতাম বাহাদুর। সে থাকত ঐ

পশ্চিমের ঘরটায়। একদিন কী হল—মোহন থাপা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তারপর থেকেই নানান উৎপাত শুরু হল। দরজা জানলা ইচ্ছামত খোলে, ইচ্ছামত বন্ধ হয়। মাঝরাত্রে টিনের চালায় কারা যেন হেঁটে বেড়ায়। বুড়ো কর্তা দার্জিলিঙ থেকে ওর ছোট ভাইকে আনালেন। তার নাম কিশোর থাপা। বললে বিশ্বাস করবেন না, সে দেখতে হুবহু ওর দাদার মত। লোকটা যেদিন এল বুড়োকর্তাই তাকে প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। পরে জানা গেল লোকটা বাহাদুরের প্রেতাত্মা নয়, যমজ ভাই। কিন্তু বুড়োকর্তা তাকে সহ্য করতে পারলেন না। রাত-বিরেতে হঠাৎ তাকে দেখলেই তিনি চমকে উঠতেন। মনে পড়ে যেত তার দাদাকে। শেষে তিন মাসের মাইনে দিয়ে তাকে তিনি দার্জিলিঙের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে তেনাদের অত্যাচার চলতেই লাগল। কত শান্তি-সস্ত্যেন করা হল। ডাক্তার মৈত্রই ব্যবস্থা করেছিলেন এসবের…'

'ডাক্তার মৈত্রটা কে?' জিজ্ঞাসা করল হেবো।

'বুড়োকর্তাকে যিনি চিকিচ্ছে করেন আর কি। বিলাত-ফেরত আর জোয়ান বয়স হলে কি হবে, বামুনের ছেলে তো? গলায় পৈতেও আছে, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তিও করেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন শান্তি-সস্ত্যেনের। মায় গয়ায় পিণ্ড পর্যন্ত দিয়ে আসা হল—কিন্তু তেনাদের দাপাদাপিটা কিছুতেই বন্ধ হল না।'

মেজদা প্রশ্ন করে—'কিন্তু বাইরের ঘরে কি আছে তাহলে?'

নটবর কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে চুপ করে গেল। ঘরে এলেন লুটুবাবু। এসেই ধমক দিলেন নটবরকে—'কি রে বেটা! এদের ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস তো? চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব!'

হেবোর মা বলেন—'নটবরের দোষ নেই, আমরাই ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

লুটুবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলেন—তোমাদেরই বা ওসব কথায় থাকার দরকার কি? জ্যোঠা দেখতেই তো এসেছ দিদি, ভূত দেখতে তো আস নি!'

হেবো বুঝতে পারে ভিতরে ভিতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। এ ক্ষেত্রে দাদুকে রক্ষা না করলে তার অধর্ম হবে। ওসব ভুত-টুত সে মানে না। এসব আসলে কারও শয়তানি। কার হতে পারে? লুটুমামা, নটবর, কিশোর থাপা? বাড়িতে আর কে কে থাকে? কাউকে কিছ না বলে সে সুটকেস খুলে একে-একে তার সাজ-সরঞ্জামগুলো বার করে। মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, নোটবই, পেনসিল—

মেজদার মুখে খেলে গেল একচিলতে হাসি, বললে—'শার্লক হেবোর নাক-সুড়সুড়ানি শুরু হয়েছে!'

হেবো জবাব দিল না।

সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র পরীক্ষা করতে এলেন দাদুকে। হেবো তখন স্পষ্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দাদুর অসুখটা কি ? লটুবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন—'তাতে তোমার কি দরকার হে ছোকরা ?'

ডাক্তার মৈত্র তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'আহাহা, রাগ করছেন কেন ? ছেলেটি তো নেহাত ছোটও নয়, এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। ওদেরও কিছু কিছু জানা দরকার।' তারপর হেবোর দিকে ফিরে বলেন—'তোমার দাদু একটা মানসিক অসুখে ভুগছেন। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছেন আর কি।'

হেবো আর কথা বাড়ায় না। সে বুঝতে পারে আসল ক্লু লুকানো আছে ঐ তালাবন্ধ ঘরে। ও-ঘরে দাদু কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন ? ঐ ঘরটা সবার আগে ভাল করে সার্চ করে দেখা দরকার। কাজটা খুবই কঠিন। দাদু কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন—ও-ঘরে কেউ যাবে না। তালাবন্ধ ঘরের চাবিটা থাকে দাদুর বালিশের নিচে।

কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকে অত সহজে হতাশ হতে নেই। হেবো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বসল দাদুকে সেবা করতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হেবোর মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন। খুশি হলেন—হেবো যে তার পাগলামি ছেড়ে দাদুর সেবায় মন দিয়েছে এতে মনে মনে উৎফুল্ল হলেন তিনি। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লেন দাদু। হেবোও উঠে যায়। বলা বাহুল্য ঐ ফাঁকে দাদুর বালিশের তলা থেকে একটি চাবি চলে আসে হেবোর পকেটে।

মধ্যরাত্রে সবাই যখন অঘোর ঘুমে অচেতন তখন হেবো চুপিসারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। পা টিপে টিপে চলে আসে বাইরের ঘরে। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ বার হচ্ছে ঘরটা থেকে। হেবো আলো জবালল না। একটা টর্চের আলোয় ঘরখানা ভাল করে দেখল। ঘরটা মামুলিভাবে সাজানো। চেয়ার, টেবিল, আলমারি, সোফা। দেওয়াল-ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে সওয়া সাতটা বেজে। ক্যালেণ্ডারের পাতা ছেঁড়া হয় নি এ মাসে। গতমাসের পৃষ্ঠাটা প্রমাণ দিচ্ছে ঘরটা মাসাধিককাল অব্যবহৃত পড়ে আছে। সব আসবাব-পত্রে, মায় মেঝেতে ধুলোর একটা আস্তরণ পড়ে গেছে। হেবো লক্ষ্য করে দেখে দাদুর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজগুলো তালাবন্ধ। টেবিলের উপর কলমদানি, কাগজ-চাপা, কিছু ফাইলপত্র, একটা পিনকুশন, টেলি-ফোন ডাইরেক্টরি, আর টেলিফোনটা নামানো আছে সেই ডাইরেক্টরির উপর। কাছে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, টেলিফোনের মাউথ-পিসের উপর মাকড়সার জাল হয়েছে। অর্থাৎ অনেকদিন ধরেই ওটা ঐভাবে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই দাদু শেষবার যখন এ ঘর তালাবন্ধ করে যান মাসাধিক কাল আগে তখন টেলিফোনটাকে রিসি-ভারের উপর রেখে যেতে ভুলে গেছেন। হেবো মনে করে দেখে, ওরা আসার পর

বাড়িতে টেলিফোন একবারও বাজে নি। বাজবে কোথা থেকে ? আজ একমাসের উপর ওদের টেলিফোন সবসময় এনগেজ্‌ড !

হেবো পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে আলগোছে টেলিফোনটা তুলে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেল না ঘরে। ভূতের নামগন্ধও নেই। ঘর তালাবন্ধ করে চাবিটি আবার হেবো রেখে দেয় দাদুর বালিশের তলায়। সারা রাত বেচারির ঘুম হল না। কী হতে পারে ? কেন এমন অহেতুক ভয় পেলেন দাদু ? কে ভয় দেখালো ? কী ভয় দেখালো, আর কেনই বা দেখালো ?

হঠাৎ ভোর রাতে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। ও কিসের শব্দ ? ঘুমের জড়িমা কেটে যেতেই হেবো বুঝতে পারে পাশের তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন বাজছে। হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলে, রাত তখন সাড়ে তিনটে। এত রাত্রে কে টেলিফোন করছে ? ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে তালাবন্ধ ঘরের কপাট খোলা। ভিতরে আলো জ্বলছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে হেবো। দেখে দাদু ইতিমধ্যেই এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকেছেন। দরজার ফাঁক দিয়ে হেবো লুকিয়ে দেখতে থাকে।

দেখে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাদু টেলিফোনে কথা বলছেন :

'কে তুমি ? তুমিও রায়সাহেব ? লায়ার ! না তুমি রায়সাহেব নও ! আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ কেন ! বল তুমি কে ?···অ্যাঁ ! কে ?···তুমি ? তোমু ? ··· ক্যায়সে তোমু ?'

হাত থেকে পড়ে গেল টেলিফোনটা। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। হেবো চিৎকার করে ওঠে। লোকজন ছুটে আসে। মা, লুটুমামা, নটবর। ধরাধরি করে ওঁকে সবাই নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। কিছুদিন হল একটু সুস্থ হয়ে উঠছিলেন তিনি, আবার জ্বর এল পরদিন সকালে।

সকালবেলা শহরের সব কজন বড় ডাক্তারই দল বেঁধে দেখতে এলেন রায়সাহেবকে। অন্যান্য জুনিয়ার ডাক্তাররা নিবারণচন্দ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। অনেকেই খবর নিতে আসতেন সকাল সন্ধ্যায়। ডাক্তার মৈত্র সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা করছিলেন। ডাক্তার মৈত্র অবশ্য সবে ডাক্তারিতে ঢুকেছেন। অল্প বয়স। পলাশপুরে এসে নিবারণচন্দ্রের জুনিয়ার হিসাবে ঐ ডিস্‌পেন্সারিতেই বসছিলেন। দাদুর অত বড় প্র্যাকটিসের ঠেলা সামলাতে ভদ্রলোক একেবারে প্রাণান্ত হয়ে পড়েছেন। দেহাত থেকে দলে-দলে রুগী আসে সকালবেলা এখনও ওঁর চেম্বারে। তাদের ঔষধ দিয়ে বিদায় করে—দাদুর পুরাতন কেসগুলি তাদের বাড়ি গিয়ে দেখে, তার পর বেলা দুটোই হোক তিনটেই হোক তিনি নিবারণবাবুকে দেখতে আসেন। দাদুকে পরীক্ষা করে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা শেষ করে তবে বাড়ি যান, স্নানাহার করেন। দাদু খুবই স্নেহ করেন এই জুনিয়ার ডাক্তারটিকে, আর তিনিও দাদুকে বাপের মত

শ্রদ্ধা করেন। মাঝে মাঝে যেদিন ডাক্তার মৈত্রের বেশি বেলা হয়ে যায় সেদিন দাদু ওঁকে ধমক দেন—'এত বেলা হয়ে গেছে, এখনও তোমার স্নানাহার হয় নি? ও বেলায় এলেই পারতে!'

ডাক্তার মৈত্র জবাব দিতেন না। চুপচাপ পরীক্ষা করে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতেন তিনি।

তবু কি জানি কেন হেবোর মা একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করছিলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তিনি কি সব পরামর্শ করলেন। হেবো আন্দাজ করলে সবই, কিন্তু ওঁরা যখন তাকে পরামর্শ করতে ডাকলেন না তখন সেও ওপরপড়া হয়ে গেল না কথা বলতে। বেশ তো, ওঁরা যা ভাল বোঝেন করুন, হেবোও যা ভাল বুঝবে করবে।

পরদিনই অজিতেন্দ্রবাবু, মানে হেবোর মেসোমশাই এলেন মরণাপন্ন জ্যেঠ-শ্বশুরকে দেখতে। বোঝা গেল নিভৃত কক্ষে মা-মেজদার আলাপটা কি-জাতের হয়েছিল। অজিতেন্দ্রবাবু পুলিসের দারোগা, এসেছেন কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তাঁকে দেখে লুটুবাবুর মুখখানি কালো হয়ে গেল, বললেন—'একি, আপনি?'

'—হ্যাঁ, এলাম। ওঁকে দেখতে।'

—'এত দেখার কি আছে তাও তো বুঝি না। মামা মিস্ ইণ্ডিয়াও না, তাজ-মহলও না! তবু এত লোকে দেখতে আসে কেন, কে জানে!' —বলেই বেরিয়ে যান তিনি।

অজিতেন্দ্রবাবুকে হেবোর মা আড়ালে ডেকে সমস্ত কথা বললেন। মেজদাও ছিল সে গোপন পরামর্শ-সভায়। হেবো ঘরে ঢুকতেই হেবোর মা বললেন—'আমরা একটু জরুরি কথা বলছি হেবো, তুমি বরং একটু পরে এস।'

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে হেবোর। বেশ মজা! এ সমস্যার সমাধান যার পক্ষে করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাকেই ওঁরা আমল দিতে চাইছেন না কেন? সে বয়সে ছোট বলে? সে মেজদার মত কলেজে ক্লাস করতে যায় না বলে? কিন্তু বয়সে ধেড়ে হলেই যে বুদ্ধিতে বেঁড়ে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? সেবার কাশী যাওয়ার পথে আবগারি পুলিসের বড়কর্তা সেই মুখার্জি সাহেবকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ঐ ছোট ছেলেটির কাছে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশিতে পাঠাই! তা সেই মুখার্জি সাহেবের বয়স কি হেবোর চেয়ে কম ছিল? বেশ, থাক, দরকার নেই! যা করার একাই করবে হেবো। কারও সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন নেই!

বাগানে নেমে যায় সে। পেয়ারাগাছ থেকে একটা ডাঁসামতন পেয়ারা পেড়ে ডালে পা ঝুলিয়ে জুত করে চিবোতে বসে। নিচু গলায় গান ধরে—'ও তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

পরদিন ডাক্তার মৈত্র যখন রায়সাহেবকে দেখতে এলেন, তখন হেবো, মেজদা আর অজিতেন্দ্রবাবু বসেছিলেন সেখানে। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, বলেন—'ডাক্তার মৈত্র, আপনি ডাক্তারি ব্যাগ ব্যবহার করেন না কেন ? এ রকম একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছেন ?'

ডাক্তার মৈত্রের হাতে ছিল একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। পি-এ-এ মার্কা। অর্থাৎ প্যান-অ্যামেরিকান এয়ার-ওয়েজের এয়ার-ব্যাগ ! সচরাচর ডাক্তারদের যেমন কালো ডাক্তারি ব্যাগ হয়, তা নয়।

ডাক্তারবাবু বলেন—'এটাতে আমার হাত ধোবার তোয়ালে সাবান ইত্যাদি থাকে। ডাক্তারি-ব্যাগ আমার গাড়িতেই আছে।'

বলতে বলতেই নিবারণবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হাজিরা সিং ঘরে এল। তার হাতে কালো একটা চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ। ডাক্তার মৈত্র সেই ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর শিশি বার করে নেন। রায়সাহেবকে ফুঁড়তে ফুঁড়তে বলেন—'বিলেত থেকে ফেরার সময় আর জাহাজে আসি নি, প্লেনে এসেছিলাম। ঐ ব্যাগটা তখন থেকেই আমার সঙ্গে আছে।'

হেবো ফস্ করে প্রশ্ন করে বসে—'আপনি বিলেত গিয়েছিলেন বুঝি ?'

রায়সাহেব জবাব দেন—'মৈত্র এম. আর. সি. পি.। উফ্ ! ইণ্ট্রাভেনাস দিলে নাকি ?'

'না ইণ্ট্রাভেনাস নয়।'—বলেন ডাক্তার মৈত্র, দাদুর বাহুমূলটা ডলতে ডলতে।

হেবো আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ধমক দিলেন লুটুবাবু—'তোমরা রুগীর ঘরে কেন ?'

অজিতেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিতে হেবো বেরিয়ে আসে। আর কিছু কথোপকথন সে শুনতে পায় না। না পাক ক্ষতি নেই ; শিকারী বিড়ালটিকে সে চিনতে শুরু করেছে ঠিকই। আপন মনে বাগানে পায়চারি করতে করতে হেবো গুন-গুন করে সুর ভাঁজে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।'

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মডেলের কালো শেভ্রলেখানা। দাদুর অনেকদিনের গাড়ি। হেবো পায়ে পায়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চায় হেবো—'ড্রাইভারদাদা, আমাদের শহরটা একদিন দেখিয়ে আনলে না তো তুমি ?'

হাজিরা সিং বলে—'কেয়া কিয়া যায় বোলিয়ে ছোটাসাব। মেরা তো মরণেকা ভি ফুরসৎ নেহি।'

তা বটে। সেই সাত-সকালে গাড়ি বার করে হাজিরা দেয় ; আর সারাদিন তাকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। অনেকদিনের পুরনো গাড়ি। আজ এটা কাল সেটা খুটখাট মেরামতি লেগেই আছে, তবু এতদিন শুধু বাড়ি থেকে চেম্বার

আর চেম্বার থেকে বাড়ি যাতায়াত করতে হত। বয়স হয়ে যাওয়ায় দাদু আজকাল আর দেহাতে কলে যেতেন না। যেটুকু রোগী দেখতেন তা ঐ চেম্বারে বসেই। বড়জোর শহরে দু-একটা পুরনো ঘরে রুগী দেখতে যেতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার মৈত্রকে ঠেকাতে হচ্ছে সেই রুগীর ঝামেলা। ড্রাইভারকেও ঘুরতে হচ্ছে সারাদিন। ডাক্তার মৈত্র তো আর বয়সের দোহাই দিতে পারেন না। ডাকলে রুগীর বাসায় গিয়েও দেখে আসতে হয়। ফলে বেচারি হাজিরা সিং-এর আর মরবার ফুরসত নেই।

হেবো প্রশ্ন করে একে-একে। হাজিরা সিং কতদিন কাজ করছে, চেম্বারে দাদুর কতজন কর্মচারী আছে, কে কেমন লোক। হাজিরা সিং তার ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে সব কথা বলে যায়। হাজিরা সিং পুরনো লোক। মোহন থাপার আগেই কাজে বহাল হয়েছে সে। তবে, নটবর তার থেকেও আগে এসেছে এ বাড়ি। কিশোর থাপা ? সে তো এসেছে সবে। মোহন থাপা আত্মহত্যা করার পরে। দাদুর চেম্বারে আছেন জনা-ছয়েক কর্মচারী। তাদের মধ্যে ভবেশ গাঙ্গুলীই পুরনো লোক। পাশ-করা কম্পাউন্ডার। হীরেন আর গোরাবাবুও পাশ-করা কম্পাউন্ডার। ক্যাশ থাকে ভবেশবাবুর কাছে। আগে দাদু তাঁর কাছ থেকে দৈনিক ক্যাশ বুঝে নিতেন। এখন ডাক্তার মৈত্র সেটা বুঝে নেন। ডিসপেন্সারির যাবতীয় ঝামেলা একা মৈত্রকেই সামলাতে হয়। মৈত্র এসেছেন বছর-খানেক আগে। বেশ সজ্জন, সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করেন। গোরাবাবু লোকটাকে হাজিরা সিং বরদাস্ত করতে পারে না। কেমন যেন চোর-চোর ভাব লোকটার। লুটুবাবু খুব বিশ্বাস করেন তাকে। হাজিরা সিং দেখেছে প্রায়ই গোরাবাবু এসে লুটুবাবুকে কি সব গুজুর-গুজুর করে বলে যায়।

রাত্রে অজিতেন্দ্রবাবু হেব্যোর মাকে বললেন—'ডাক্তার মৈত্রের কাছে সব কথা শুনলাম। আমার মনে হয় আপনারা ভুল আশঙ্কা করছেন। ভূতের ভয় ইচ্ছে করে কেউ ওঁকে দেখাচ্ছে না। কারই বা স্বার্থ হবে এভাবে ভূতের ভয় দেখাবার ?'

মা কিন্তু যুক্তিটা মেনে নিতে পারেন না, বলেন—'ভূতের ভয় দেখাবার স্বার্থ হতে পারে তার, যে আশা করছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলে এ সম্পত্তিটা তার হাতে আসবে।'

অজিতবাবু বলেন—'বেশ তো, আমরা তো আরও কিছুদিন আছি। দেখাই যাক না পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়ায়।'

মা বলেন—'কিন্তু ওঁকে আপাতত এখান থেকে সরিয়ে কলকাতা নিয়ে গেলে হয় না ? এ বাড়িতে উনি আবার ভয় পেতে পারেন।'

'সে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু লুটুবাবু রাজী নয়।'

'সে কেন রাজী নয় ?'

'বলছে এক হাতেই চিকিৎসা হওয়া ভাল।'

হেবো সব কথা শুনল চুপিসারে।

অনেক রাত্রে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। দাদুর ঘরে কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। কান খাড়া করে খানিকটা শুনল হেবো। হ্যাঁ, ঠিকই। কথা বলছে কেউ। পা টিপে টিপে এ-ঘরের কাছে এসে উঁকি দিতেই হেবো দেখতে পেল— দাদু আর ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু বসে কথা বলছেন। দাদু বলছিলেন— 'বুঝলে অজিত, সেদিন থেকেই আমার মনে হল মোহন থাপার অতৃপ্ত আত্মাটা এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু আমি নই, হাজিরা সিং, নটবর— ওরাও বললে যে অপদেবতার অস্তিত্ব ওরাও টের পেয়েছে। মৈত্র বললে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে। পুজা অর্চনা সবই করা হল, কিন্তু অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্তি হল না। এই সময়, বুঝলে অজিত, একদিন এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল…'

ঘটনাটা আদ্যন্ত শুনে হেবোর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। রায়সাহেব সন্ধ্যাবেলা ডিস্‌পেন্সারিতে গেছেন। সেদিন সকাল থেকেই ওঁর শরীরটা খারাপ। আকাশের অবস্থাও খারাপ। টিপি-টিপি বৃষ্টি নেমেছে। রুগীদের বিদায় করে সন্ধে রাতেই বাড়ি ফিরে আসবেন স্থির করলেন। চেম্বারে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন না। হীরেন, গোরা আর ভবেশবাবু ছিলেন। রায়সাহেব ডিস্‌পেন্সারিতে ওঁর টেলিফোনটা তুলে নিলেন, ইচ্ছা, বাড়িতে ফোন করে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলবেন। ফোন তুলে অপেক্ষা করতেই অপারেটর বলল—'ইয়েস ?'

'নাম্বার থার্টিন প্লিজ।'

ওঁর বাড়ির নাম্বার তের, আর চেম্বারের নাম্বার চৌদ্দ।

প্রথমে রিঙিং টোন, এবং তার পরেই শুনলেন—'হ্যালো।'

'নাম্বার থার্টিন ? রায়সাহেবের বাড়ি ?'—প্রশ্ন করলেন রায়সাহেব।

'জী হাঁ, বোলিয়ে।'

একটু ঘাবড়ে গেলেন রায়সাহেব। বাড়িতে আছেন লুটুবাবু আর নটবর, হিন্দিতে তারা কথা বলবে কেন ? তাই একটু অবাক হয়ে বলেন—'তুমি কে কথা বলছ ?'

'আপ কৌন ?'

'আরে আমি রায়সাহেব। তুমি কে ? লুটু অথবা নটবরকে ডেকে দাও—'

'সালাম বড়াসাব ম্যয় বাহাদুর।'

রায়সাহেবের হাত থেকে টেলিফোনটা পড়ে যায়। তখনও কিশোর থাপা কাজে লাগে নি। বাহাদুর বলতে তখন সকলে মোহন থাপাকেই বুঝত। আর সেই বাহাদুর তার দিন-দশেক আগে আত্মহত্যা করেছে।

তাঁকে ঐভাবে বসে পড়তে দেখে ভবেশবাবু ছুটে এসে বলেন—'কি হয়েছে স্যার ?'

'কিছু না। তুমি একটা রিক্শা ডেকে দাও।'

রিক্শা করে বাড়ি ফিরে এসে রায়সাহেব দেখেন, লটুবাবু বাড়ি নেই। নটবর বললে ইতিমধ্যে তাঁর বসার ঘরে কেউ ঢোকে নি। সে অবশ্য রান্নাঘরে ছিল। টেলিফোন বেজেছিল কি না, তা সে জানে না। অবাক কাণ্ড! কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি কি ভুল শুনেছেন? অতগুলো কথা। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এল না। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বৃষ্টিটাও ঝেঁপে এসেছে। লক্ষণ ভাল নয়। রায়সাহেবের মনে হল একটু মেডিকেটেড ব্র্যাণ্ডি খেতে পারলে ভাল হত। মদ উনি খান না। ঘরে ব্র্যাণ্ডি নেই। কিন্তু ডাক্তারখানায় আছে। দেওয়াল-ঘড়িতে দেখেন, রাত দশটা। এখনও কি ডিস্পেন্সারি খোলা আছে? দেখাই যাক না। তাই শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে এসে ফোনটা তুলে নিলেন—উদ্দেশ্য, ডিস্পেন্সারি খোলা থাকলে একটা ওষুধ এনে খাবেন। ফোনটা তুলে নিয়ে নাম্বার চাইলেন। ও-প্রান্ত থেকে ভারি গলায় শোনা গেল—'হ্যালো!'

'এটা কি নাম্বার ফোর্টিন? রায়সাহেবের ডিস্পেন্সারি?'

'ইয়েস, স্পিকিং।'

'তুমি কে কথা বলছ?' প্রশ্ন করেন রায়সাহেব।

'তুমি কে কথা বলছ?' প্রতিধ্বনি করে যেন ও লোকটা।

'কে মৈত্র নাকি?'

'আঃ! বললাম তো এটা রায়সাহেবের ডিস্পেন্সারি। আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? কি চাও?'

রায়সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হকচাকিয়ে গিয়ে বলেন—'রায়সাহেব! কোন্ রায়সাহেব?'

ও প্রান্তের লোকটা ধম্কে ওঠে—ঈডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে? আমি রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক কথা বলছি। তুমি কে হে ছোকরা?'

রায়সাহেব কোনও জবাব দিতে পারেন না। ফোন রেখে বসে পড়েন। মিনিট-খানেক বোধহয় তাঁর জ্ঞান ছিল না। তারপর বুঝলেন, এসব নিশ্চয়ই কারও শয়তানি। কে হতে পারে? রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক একজন অত্যন্ত মানী লোক, তাঁকে 'ঈডিয়ট' বলবার সাহস কার আছে? কিন্তু নাঃ, শরীর খারাপ বলে এসব বেয়াদবি বরদাস্ত করে যাওয়া চলে না। পাগলের মত লাফিয়ে উঠলেন উনি। ওঁর বসবার ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাঁকলেন—'ড্রাইভার, গাড়ি নিকালো।'

বড় সাহেবের শরীর খারাপ শুনে গাড়ি গ্যারেজে তুলে রাখা হয়েছিল। আবার বার করা হল। রায়সাহেব সোজা গিয়ে উঠলেন ডিস্পেন্সারিতে। ব্যাপারটা একটা

হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। এখনই। গিয়ে দেখলেন, ডিস্‌পেন্সারির অন্যান্য কর্মচারীরা চলে গেছে। ডাক্তার মৈত্র শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে উঠবার উপক্রম করছেন। রায়সাহেব বলেন—'তুমি আছ ভালই হয়েছে। আচ্ছা, এর মধ্যে কেউ ফোন করেছিল ?'

'আজ্ঞে না। আপনার টেলিফোন ছাড়া আর কারও ফোন তো আসে নি।'

'আমার ফোন এসেছিল ? কে ধরেছিল ?"

'আজ্ঞে আমি।'

'তুমি ? তবে তুমি কী সব আজে বাজে কথা বলছিলে ?'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'সে কি স্যার ? আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। আমি যতবার বলছি—"আমি মৈত্র, কি চাইছেন স্যার ?" আপনি ততবারই শুধু বলছেন,—"আমি রায়সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" আমি আপনার গলার স্বর শুনে বেশ চিনতে পারছিলাম, তাই যখন অবাক হয়ে বললাম —"রায়সাহেব মানে ? কোন্ রায়সাহেব ?" তখন আপনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন —"ঈডিয়ট ! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে। আমি ডাক্তার নিবারণ মৌলিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।"

রায়সাহেব ক্রমেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে তিনি একাই ভুল শোনেন নি ! কে এমন করছে ? কেনই বা করছে ? মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা তুলে নেন। বাড়ির নাম্বার চাইলেন আবার। নিশ্চিত জানেন, তালাবন্ধ ঘরে কেউ সাড়া দেবে না। রিঙিং টোন বেজেই যাবে। সেই রিঙিং টোনের আওয়াজটা না শোনা পর্যন্ত ওঁর যেন মুক্তি নেই।

কী আশ্চর্য ! একবার বাজতেই ও-প্রান্তের সেই তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন রিসিভারটা কে যেন তুলে নিল। অস্ফুটে কে যেন বললে—'হ্যালো !'

সে স্বরে মৃত্যুর হিমশীতল একটা স্পর্শ লেগে আছে।

রায়সাহেব শেষ সম্ভাবনাটা একবার হাতড়ে দেখতে চান : 'আপনার নাম্বার কত ?'

ও প্রান্তবাসী ওঁর সেই শেষ অবলম্বনটা ধূলিসাৎ করে বললে—'তের নাম্বার হজৌর !'

'আমি রায়সাহেব বলছি, তুমি···তুকি কে ?'

'সেলাম বড়াসাব। ময় বাহাদুর হুঁ !'

রায়সাহেব চিৎকার করে ওঠেন—'বাহাদুর ! কৌন্ সা বাহাদুর ?"

'মোহন থাপা বাহাদুর। হজৌর কা গোলাম, গরিবপরবর !'

রায়সাহেব নাকি আর সহ্য করতে পারেন নি। এই উত্তর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ডাক্তার মৈত্র ওঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। রায়সাহেবের জ্ঞান হয়েছিল পুরো দু-দিন পরে। তার পর থেকেই তিনি অসুখে ভুগছেন।

হেবো সমস্ত বিবরণটা শুনল। অজিতবাবু দাদুকে বললেন—'আপনি ও ঘরের চাবিটা আমাকে দেবেন একবার?'

'না না! ও ঘরে কেউ যাবে না তোমরা! ও ঘরে টেলিফোন আছে।'

দিন-তিনেক পরে কলকাতা থেকে হেবোর মেসো অজিতেন্দ্রবাবুর এক বন্ধু এলেন। উনি নাকি লাইফ ইন্সিওরেন্সের অর্গানাইজার। পলাশপুরে এসেছিলেন নিজের কাজে। অজিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়। অজিতেন্দ্রবাবুই তাঁকে ধরে এনেছেন এ বাড়িতে। ভদ্রলোকের নাম প্রবীর মুখার্জি। তাঁকে দেখে লটুবাবু আরও বিরক্ত হলেন। এ কি, তামাসা দেখতে লোক জুটছে নাকি? কিন্তু অজিতেন্দ্র-বাবু কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

হেবো বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, পাইপমুখো ভদ্রলোকটি বসে ওর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। মাথার চুলগুলি উলটানো। সুট পরে আছেন তিনি। মেসোমশাই বলেন—'এঁকে প্রণাম কর হেবো, ইনি হচ্ছেন…'

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'এস খোকা, আমার নাম প্রবীর মুখার্জি, তোমার মেসোমশায়ের বন্ধু আমি। এদিকে একটা ইন্সিওরেন্স কেসে এসেছিলাম, শুনলাম তোমরা এখানে আছ, তাই ভাবলাম—'

তাঁকে বাধা দিয়ে হেবো বলে—'আপনাকে কি বলে ডাকব? ডিটেকটিভ কাকা?'

ভদ্রলোকের বাক্যস্ফূর্তি হল না। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল শুধু। একটু সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলেন—'সে কি? ও কথা কে বললে? আমি তো ডিটেকটিভ নই! ও রকম অদ্ভুত কল্পনা করলে কেন?'

'কল্পনা?' হাসল হেবো, বললে—'আজ্ঞে না। আমি কল্পনা করে কোন সিদ্ধান্ত নিই না। আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত! আজই একজন গোয়েন্দা এ বাড়িতে আসবেন এটা অনুমান করেছিলাম আমি। মেসোমশাই পুলিসের দারোগা এসব ক্ষেত্রে ডিটেকটিভের উপর তিনি সচরাচর নির্ভর করে থাকেন, কিন্তু এটা তো হচ্ছে অনুমান। আপনি ধরা পড়ে গেলেন দুটি কারণে। প্রথমত মেসোমশাইকে আপনার পরিচয় দেবার সুযোগ না দিয়ে বড় তাড়াহুড়ো করেছেন আপনি। আমার মত বাচ্চা ছেলের কাছে আপনার এ বাড়িতে আসার কৈফিয়ত দেবার তো প্রয়োজন ছিল না। পরিচয়টা গোপন করার জন্য আপনার মনে যে অপরাধ-বোধ ছিল তারই তাগিদে এক নাগাড়ে আপনি অহেতুক অনেক কথা বলে গেছেন। তাছাড়া আপনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেছেন আপনার বুক-পকেট থেকে উঁচু হয়ে থাকা ঐ ম্যাগনিফাইং গ্লাসে। বীমা কোম্পানির লোকের পক্ষে ওটা বেমানান।'

প্রবীরবাবুর চোখের মণিদুটো ট্যারা হয়ে গেল!

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'ওর কাছে লুকিয়ে পার পাবে না, প্রবীর! ও একটি ক্ষুদে গোয়েন্দা! ওর কীর্তির কথা তোমাকে পরে বলব আমি। এখন এস, আলোচনা করা যাক।'

হেবোর মত একটি হাফ-প্যাণ্টধারীর সঙ্গে রহস্যের আলোচনা করতে হবে শুনে প্রবীরবাবু গুম্ মেরে গেলেন।

হেবো বললে—'প্রবীরকাকা, আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আপনার পরিচয়টা পালটান। বীমা কোম্পানীর দালাল নয়, আপনি নিজেকে পামিস্ট বলে পরিচয় দিন।'

'কেন?'

'বীমা কোম্পানির দালালের চেয়ে তাতে অনেক সুবিধা। সন্দেহভাজন যে-কজন লোক আছেন,—লুটুমামা, গোরাবাবু, নটবর, ভবেশবাবু এঁদের হাত দেখার অছিলায় নানান প্রশ্ন করতে পারবেন।'

প্রবীরবাবু হেসে বলেন—'ছেলেমানুষ! তাতে কী লাভ? আসল অপরাধী তো মিথ্যাই বলবে।'

'খুব স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় উল্টোপাল্টা মিথ্যার ভিতর থেকেই ক্লু পাওয়া যায়। তাছাড়া এ কেসে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ধুলোভর্তি বাইরের ঘরের ঐ টেলিফোনটা। ভবিষ্যতে হয়ত ফিঙ্গার প্রিণ্টস্ নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে। পামিস্ট, মানে হস্তরেখাবিদদের পক্ষে তার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার সাহায্যে হাত দেখার অছিলায় আঙুলের ছাপের নকল তুলে নেওয়া সহজ।'

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন, হাফপ্যাণ্ট পরলেও ছেলেটির মাথাটি পাকা।

অজিতেন্দ্রবাবু আর হেবো ছাড়া প্রবীরবাবুর আসল পরিচয়টা আর কেউ জানতে পারল না, এমনকি হেবোর মা-ও নয়। হেবো মনে মনে খুশি হল। মোসা-মশাই তাহলে ওকে ভরসা করতে শুরু করেছেন। অবশ্য এও সে বুঝতে পারে, নিজে-নিজেই প্রবীরবাবুর পরিচয়টা আবিষ্কার করেছিল বলে বাধ্য হয়ে তাকে দলে টেনেছেন মেসোমশাই। সেদিনই প্রবীরবাবু বাইরের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি করালেন। স্থির হল রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ওঁরা তিনজনে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র এসে অজিতেন্দ্রবাবু আর প্রবীরকাকুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন—'কয়েকটা কথা আপনাদের বলতাম। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।'

প্রবীরকাকু বলেন—'কিসের কথা বলছেন আপনি?'

'ঐ টেলিফোনে ভূতের গলার বিষয়ে। আমার মনে হয় কেউ ইচ্ছে করে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'কিন্তু বুড়ো মানুষকে অহেতুক ভয় দেখিয়ে কার কী লাভ ?'

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন—'অহেতুক বলে এটাকে ধরে নিচ্ছেন কেন ? এই করে হয়ত তাঁর মৃত্যুকে আগিয়ে আনা হচ্ছে। রিভলভারের গুলি, অথবা বিষের সাহায্য না নিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।'

অজিতবাবু বলেন—'তা যায় বৈকি। আমি পুলিসে চাকরি করি। অনেক কিছুই দেখেছি আমি। কিন্তু কার স্বার্থ আছে এ বিষয়ে ?'

'শুধু স্বার্থ নয়, স্বার্থ ও সুযোগ। "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি"। কিন্তু সেটা আমার-আপনার পক্ষে বিচার করার চেয়ে কোনও প্রফেশনাল ডিটেকটিভের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় কি ?'

অজিতবাবু বলেন—'বেশ, ভেবে দেখি।'

'আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দুটি কাজ করেছিলাম। তার ফলাফলটা জানিয়ে রাখি। প্রথমত, টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে "অব্‌নক্সাস কল" অথবা "গোস্টস্‌ কল" বলে একটা অনুচ্ছেদ আছে, দেখে থাকবেন। ডাইরেক্টারির নির্দেশ অনুসারে আমি ট্র্যাফিক সুপারকে চিঠি লিখি। তাঁরা এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কোনও সূত্র পান নি। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন লাইনটা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত মনে করছিলাম। সে ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র লুটুবাবু একজন মিস্ত্রি ডেকে সমস্ত লাইনটা পরীক্ষা করুন। লাইন কেউ ট্যাপ করছে না বা লাইনে কোনও ফল্ট নেই। তবে মনে রাখবেন, মিস্ত্রি লাগিয়েছিলেন লুটুবাবু এবং রিপোর্টটাও তাঁরই।'

অজিতবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—'অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন।'

ডাক্তার মৈত্র প্রতিবাদ করেন—'কিছু না, কিছু না। রায়সাহেবকে আমি আমার বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আমি সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত।'

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে অজিতবাবু, প্রবীরবাবু আর হেবো ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে এ ঘরে এলেন। প্রবীরবাবু কলকাতায় একটা টেলিফোন বুক করলেন। অল্প পরেই যোগাযোগ হল। কলকাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

রিসিভারের উপর ফোনটা বসানো রইল। রায়সাহেবকে ঘর বদলিয়ে দূরের একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। যাতে টেলিফোন বাজলেও তিনি শুনতে না পান। রাত্রে আর কিছু হল না। সকালে আর একটা টেলিফোন এল। হেবো ধরল। না, কোনও ভুতের গলা নয়। ডাক্তার মৈত্র টেলিফোনে জানতে চাইলেন, রায়সাহেব কেমন আছেন। হেবো জানায়, ভাল আছেন, ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য টেলিফোনে আর

কোনও বিভ্রাট হল না ! এখানে ওখানে অকারণে চার-পাঁচবার টেলিফোন করা হল। ঠিকমতই কথা বলা গেল। ও-প্রান্ত থেকে কোন ভুতুড়ে গলা শোনা গেল না। না কোন রায়সাহেব, না কোন বাহাদুর। প্রবীরবাবু তাঁর পরিচিত একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে দিয়ে টেলিফোন লাইনটা পরীক্ষা করালেন। না, কোনও গণ্ডগোল নেই লাইনে। কেউ ট্যাপ্ করছে না।'

রায়সাহেব ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আরও তিন চারদিন প্রবীরবাবু থেকে গেলেন, যদিও প্রায় প্রতিদিনই লটুবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—'কি, আপনার পলাশপুরে কাজ মিটল ?'

আর কোন গণ্ডগোল হচ্ছে না দেখে প্রবীরবাবু ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। অজিতেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন—আমার মনে হয় রায়সাহেব যা বলেছিলেন তা হয় মিথ্যা, না হয় তাঁর কল্পনা। ইচ্ছা করে বুড়োমানুষ মিথ্যা কথা বলবেন কেন ? সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভয়ে আতঙ্কে তিনি ভুল শুনেছিলেন। এ ছাড়া এ সমস্যার কোন লজিক্যাল সমাধান হতে পারে না। এই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'এর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা যখন নেই, তখন তাই মেনে নিতে হবে।'

হেবো বললে—'কিন্তু ব্যাখ্যা তো স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় ! প্রথমত, ভুতের কণ্ঠস্বর দাদু একা শোনেন নি, ডাক্তার মৈত্রও শুনেছেন। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন ছাড়াও ভুতের দাপাদাপি এ বাড়িতে হয়েছে। জানালাগুলো আপনা-আপনি খুলে গেছে, রাত্রে কে বা কারা টিনের চালে হেঁটে বেড়িয়েছে। এ তো সবাই বলছে।'

হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকেন লটুবাবু। ধমকে ওঠেন হেবোকে—'না হে ছোকরা, ভুতের দাপাদাপির কথা সবাই বলছে না। আমিও এ বাড়িতে থাকি, এক-দিনের তরেও ভুতের কোন দাপাদাপি টের পাইনি এতদিন।'

তারপর অজিতেন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বলেন—'তবে দিনকয়েক হল ভুতের কিছু উপদ্রব টের পাচ্ছি বটে।'

অজিতেন্দ্রবাবু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে, বলেন—'কদিন হল কী দেখছেন ? দেখছি এই ভূতটিকে। বিচ্ছু ভুত। গভীর রাতে এ ছোকরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। আপনাকে আমি মিনতি করছি অজিতবাবু, রোগীর বাড়ি থেকে এ-সব ছেলে-ছোকরাদের হটান।'

বলেই বেরিয়ে যান তিনি। উনি ঐ রকমই অদ্ভুত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওঁরা তিনজনে ডিসপেন্সারিতে এসে ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে দেখা করলেন। অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'আমরা এবার ফিরে যাব ভাবছি ডাক্তার মৈত্র। আর তো গণ্ডগোল হচ্ছে না !'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'ঐ সঙ্গে রায়সাহেবকেও নিয়ে যান না। কিছুদিন বাইরে

থেকে ঘুরে এলে একটা চেঞ্জ হবে।'

প্রবীরবাবু বলেন—'সেকি!'

লাটুবাবু বললেন—'ওঁকে স্থানান্তর করায় আপনার অনিচ্ছা?'

হেসে ডাক্তার মৈত্র বলেন—'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তো আমার মুখ থেকেই শুনেছেন।'

প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—'টেলিফোনটা সারেণ্ডার করলে কেমন হয়?'

ডাক্তার মৈত্র আপত্তি জানিয়ে বলেন—'আমার তাতে আপত্তি আছে। দুটো কারণে: প্রথমত, লাইন একবার নিজে থেকে কাটিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার পাওয়া আজকাল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, তাহলে রায়সাহেব কোনদিনই নর্ম্যাল হবেন না। টেলিফোনে স্বাভাবিকভাবে ও'কে কথা যেদিন বলাতে পারব সেদিনই বলব উনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।"

প্রবীরবাবু বলেন—'তা ঠিক। তবে আমার মনে হয় ভূতের ভয় কেউ ওঁকে জোর করে দেখাচ্ছে না।'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না প্রবীর বাবু। আপনারা একজন প্রফেশনাল ডিটেকটিভ নিয়োগ করলেই বোধহয় ভাল করতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রায়সাহেবকে কেউ ইচ্ছা করেই ভয় দেখাচ্ছে। "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি" বিচার করে আমি আন্দাজও করেছি আসল অপরাধী কে। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। প্রমাণ তো নেই আমার!'

পরদিন প্রবীরবাবু বললেন—'আর ভূতের খেলা হবে না। আজ আমি ফিরে যাব।'

অজিতেন্দ্রবাবুও আর আপত্তি করতে পারলেন না।

যাবার সময় হেবো প্রবীরবাবুর হাতে একটা বন্ধ খাম এনে দিল। বললে—'আপনি বলছেন এ বাড়িতে আর ভূতের খেলা হবে না। আমার বিশ্বাস—শীঘ্রই তা হবে। দিন সাতেকের মধ্যেই আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। এই খামের মধ্যে একটা চিঠি রইল। কলকাতা পে'ছে চিঠিখানা পড়বেন আপনি। আপনাকে যে দুটি অনুরোধ করছি দয়া করে সে দুটি রাখবেন।

প্রবীরবাবু জানতেন যে ছেলেটি ই'চড়ে পাকা। ডে'পো মস্তান একটি! আন্দাজে একবার একটি আফিং-চোরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল বলে ওর সেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তিনি কোন কথা না বলে বন্ধ খামটা পকেটে ফেলে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

ঘটনাটা ঘটল তার দিন-পাঁচেক পরে। বাইরের ঘর থেকে একটা আর্ত চিৎকার

শুনে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এসে দেখে, রায়সাহেব তাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কোলের উপর পড়ে আছে টেলিফোনটা। বেশ বোঝা গেল দীর্ঘদিন কোন গণ্ডগোল না হওয়ায় সাহস করে দাদু আজ টেলিফোন করেছিলেন। আর তখনই, হয় মোহন থাপা নয় রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক ও-প্রান্ত থেকে টেলিফোনে সাড়া দিয়েছিলেন।

দাদুকে আবার ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর বিছানায়। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছিলেন। বাধা দিলে হেবো, বললে—'না মেসো, ডাক্তার মৈত্র নয়, অন্য কোনও ডাক্তার।'

অজিতেন্দ্রবাবু একটু অবাক হয়ে বলেন—'কেন রে ?'

হেবো বললে—'এ রহস্যের কিনারা হয়ে এল বলে। আপনি বরং অন্য কোনও ডাক্তার ডাকুন।'

লুটুবাবু বলেন—'বেশ তো, ডাক্তার বোস তো পাশেই থাকেন। তাঁকেই ডাকা যাক।'

ডাক্তার বোস এসে দাদুকে পরীক্ষা করে ঔষধ দিলেন। জানালেন—না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ক্রমশ।

ঔষধ দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দাদু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। হেবোর মা তখন হেবোকে আড়ালে ডেকে বলেন—'হ্যাঁরে হেবো, তোর রহস্যের কিনারা হবার কথা কী বলছিলি তখন ?'

মেজদা বলে—'বাদ দাও মা পাগলটার কথা !'

হেবো বলে—আর একটা দিন সবুর কর মা। প্রবীরকাকুকে টেলিগ্রাফ করেছি। কাল সকালেই তিনি এসে যাবেন। তখনই জানতে পারবে সবাই।'

সন্ধ্যাবেলাতেই প্রবীরবাবু এলেন। এসেই জড়িয়ে ধরেন হেবোকে। বলেন—'অদ্ভুত তোমার সত্যান্বেষণ ! কিন্তু কী করে তুমি বুঝলে সব ?"

বিস্মিত হয়ে অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'কী হল ?'

প্রবীরবাবু বলেন সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়ে গেছে ! আর, তা সম্ভব হয়েছে এই ক্ষুদে গোয়েন্দাটির জন্য। কেমন করে আন্দাজ করেছে তা এখনও জানি না, তবে স্বীকার করব—অদ্ভুত ওর ক্ষমতা।'

হেবোর মা বলেন—'তার মানে, আর ভুতের গলা টেলিফোনে শোনা যাবে না ?

প্রবীরবাবু বলেন—'না। কারণ যে ভুত টেলিফোনে ভেল্কি দেখাতো বর্তমানে সে জেল-হাজতে। সত্যি হেবো, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, এ রহস্যের কিনারা তুমি করতে পারবে। কিন্তু এখন স্বীকার করছি তা তুমি করেছ। কী করে যে করেছ—'

অজিতেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বলেন—'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

প্রবীরবাবু বলেন—'দাঁড়ান বুঝিয়ে বলি। এখান থেকে ফিরে যাবার সময় হেবো আমার হাতে একখানা চিঠি দেয়। বন্ধ খাম, উপরে আমার নাম লেখা। আমি ভেবেছিলুম এসব ওর ছেলেমানুষি—'

বাধা দিয়ে হেবো বলে—'একটা কথা। ডাক্তার মৈত্র এখন কোথায় প্রবীরকাকু?

'থানায়।'

'থানায়!' বিস্মিত হয়ে সবাই প্রশ্ন করে একসঙ্গে—'কেন?'

'সেই কথাই তো বলছি। হেবোর চিঠিখানা আমি কলকাতায় গিয়ে খুলে পড়ি। তাতে হেবো আমাকে দুটি অনুরোধ করেছিল। ওর আফিং চুরির কেসটা শোনার পর ওকে আর একেবারে উপেক্ষা করতে পারি নি আমি। তাই ওর কথামত একজন ডিটেকটিভকে পাঠাই এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। আর বিলাতেও একটা টেলিগ্রাফ করি। কাল তার জবাব পেলাম। গত বিশ বছরের ভিতর অতুলকৃষ্ণ মৈত্র নামে কেউ এম. আর. সি. পি. হয় নি। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকেও খবর গেল যে, এখানকার একজন অপারেটর ফণী নাগ রায়সাহেবের টেলিফোনে ভূতের খেলা দেখাচ্ছে। ঠিক তার পরেই পেলাম হেবোর টেলিগ্রাফ। তাই টেলিফোন অপারেটর ফণী নাগ আর ডাক্তার মৈত্রের নামে বডি ওয়ারেণ্ট করিয়ে এখানে চলে এসেছি। ওঁদের দুজনকে এইমাত্র পুলিসের জিম্মায় পেঁছে দিয়ে আসছি। কিন্তু হেবো যে কী করে কি করল তা আমি এখনও জানি না।'

হেবো উঠে দাঁড়ায়। দু-হাত হাফ-প্যাণ্টের দুই পকেটে সে দিয়ে হেসে বলে—'দেখুন প্রবীরকাকু, আমি আন্দাজে কিছুই করি না। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, ভূত আমি মানি না। সুতরাং এ কারও শয়তানি। এখন ভেবে দেখতে হবে, শয়তানি করার স্বার্থ কার হতে পারে? অর্থাৎ অপরাধীর মোটিভটা কী? আমি বিশ্লেষণ করলাম—দাদুর এই দীর্ঘদিনের অসুখে কে লাভবান হচ্ছে? উত্তর একটিই। একমাত্র ডাক্তার মৈত্র। আর কারও কোন লাভ নেই। দাদুর অসুখে একজন মাত্র মানুষ লাভবান হচ্ছেন। ডাক্তার মৈত্র দাদুর জুনিয়র হিসাবে কাজ করছিলেন, দাদু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তাঁর সম্পূর্ণ পশারটা তিনি দখল করেছেন। প্রচণ্ড খাটুনি বেড়ে গেছে তাঁর, এ কথাই আমরা বলাবলি করেছি—ভেবে দেখিনি তাঁর রোজগারটাও বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে। অথচ সব মূলধন দাদুর। ডিসপেন্সারি দাদুর, আলমারিভরা ওষুধ দাদুর, মাইনে-করা কম্পাউণ্ডারগুলি দাদুর, পশারটা দাদুর—মায় সেদিন তিনি যে অম্লান বদনে বললেন—ডাক্তারী ব্যাগ "আমার" গাড়ীতে আছে, সেই "আমার" গাড়িখানাও দাদুর—চলে দাদুর অ্যাকাউণ্টে পেট্রলস্লিপ কেটে! লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—দাদু যতদিন বিছানায় পড়ে থাকবেন, ততদিনই ডাক্তার মৈত্র দু-হাতে টাকা লুটবেন।

'বেশ, এবার ডাক্তার মৈত্রর চরিত্রটাকে দেখি। উনি নাকি একজন বিলাত-ফেরত

এম. আর. সি. পি. ডাক্তার। অথচ প্র্যাকটিস শুরু করলেন একজন মফস্বলের ডাক্তারের জুনিয়র হিসাবে। সত্যি সার্টিফিকেট থাকলে তিনি কি ভাল চাকরি পেতে পারতেন না ?

'এবার দেখা যাক কেমনতর ডাক্তার উনি। আমি লক্ষ্য করে দেখি, তিনি দাদুকে যখন ইনজেকশন দিলেন তখন দাদু বললেন, "উঃ ইণ্ট্রাভেনাস দিলে নাকি ? বড্ড লাগল যে !" উত্তরে তিনি বললেন—'না !' একটা সাধারণ ইনজেকশনে দাদুর এত ব্যথা লাগল কেন ? একজন বিলাত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তারের হাত এত কাঁচা ?

'তৃতীয়ত, লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রবীরকাকু আসার পরেই ডাক্তার মৈত্র সতর্ক হয়ে উঠলেন। পাছে আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে 'অবনক্সাস্ কল'-এর কথা জানাই তাই আগে থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন ওটা তিনি ইতিপূর্বেই করিয়ে রেখেছেন। সন্দেহটা যাতে অন্যখাতে প্রবাহিত হয় তাই উনি "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি"-র প্রসঙ্গ এনেছিলেন।'

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন, 'কিন্তু টেলিফোন ?'

'সেটা তো আরও সোজা। লাইনে যখন গণ্ডগোল নেই—কেউ যখন লাইন ট্যাপ করছে না তখন তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন করলে কে কথা বলতে পারে ? —একমাত্র অপারেটর ছাড়া ?

কিন্তু শুধু রায়সাহেব ফোন করলেই গণ্ডগোল হয়, অন্য কেউ করলে হয় না কেন ? আর কেউ তো ভূতের সঙ্গে কথা বলে নি কোন দিন ?'

'বলেছে। আপনারা ভুলে গেছেন। অথবা ঘটনার পারম্পর্য মন দিয়ে লক্ষ্য করেন নি। ডাক্তার মৈত্র দাদুকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে তিনিও টেলিফোনে ভুতুড়ে কথাবার্তা শুনেছেন। এজন্য ডাক্তার মৈত্রকে আরও বেশি সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি আমি। কারণ দাদু ছাড়া যে দুজন-লোক টেলিফোনে ভূতবাবাজীবনের সঙ্গে কথা বলেছে তার মধ্যে ডাক্তার মৈত্র একজন।'

প্রবীরবাবু বাধা দিয়ে বলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী বললে ? দু-জন ? আবার কে ভূতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে ?'

'আমি বলেছি। মৃত মোহন থাপার সঙ্গে আমারও কিঞ্চিত আলাপচারী হয়েছে টেলিফোনে।'

'সে কি ! কবে ?'

'আপনি যে-রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তার পরদিন সকালে। আপনি কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল করলেন। চার-পাঁচটা কল করলেন। তারপর কথাবার্তা শেষ করে চলে গেলেন। সকালবেলা চুপিচুপি আমি ঘরে ঢুকি। আবার টেলিফোন তুলি এবং ডিসপেন্সারির নাম্বার চাই। ফোন ধরে মৃত মোহন থাপা।'

'কী আশ্চর্য !' বলেন প্রবীরবাবু।

'মোটেই না। আপনারা ঠিক কায়দা করতে পারছিলেন না বলে ভূতের সাক্ষাৎ পাননি। দাদুর সত্তরের কাছাকাছি বয়স—দাঁত পড়ে গেছে। তাই বাবা-মুস্তাফার মত কাঁপা-কাঁপা গলায় নাম্বার চাইলাম। ওপাশ থেকে যেই বলল "হ্যালো", অমনি আমি বুড়োটে গলায় বললাম আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে ? মৈত্র ? জবাব পেলাম—'নেহি বড়া সাব। সেলাম ! ম্যয় বাহাদুর !' আর্তনাদ করে উঠলাম—'কোন সা বাহাদুর ?' ও-প্রান্ত-বাসী বললে—'মোহন থাপা বাহাদুর, গরিবপরবর !'

'আর্তনাদ করে টেলিফোন রেখে দিলাম। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই অপরাধী চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল !'

'দশ মিনিটের মধ্যে ! মানে ! কেমন করে ?'

'তার মিনিট-দশেক পরেই ডাক্তার মৈত্র টেলিফোন করে জানতে চাইলেন রায়সাহেব কেমন আছেন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেলেন।'

'কেমন করে ? এটা তো একটা কয়েন্সিডেন্সও হতে পারত ?'

'না, পারত না। কারণ ডাক্তার মৈত্র জানেন—আজ দু-মাস ধরে এ-বাড়ির বাইরের ঘর তালাবন্ধ। চাবি দাদুর বালিশের তলায় থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা তিনি জানেন এ ঘরে টেলিফোন রিসিভার রাখা থাকে না। তাহলে তিনি কোন্ আক্কেলে অপারেটরের কাছে এ বাড়ির নাম্বার চান ? এ বাড়ির টেলিফোন যে রিসিভারের উপর রাখা আছে—সে কথা জানতাম আমরা মাত্র তিনজন : প্রবীরকাকু আপনি, মেসোমশাই আর আমি—আর ন্যাচারালি টেলিফোন অপারেটর। ডাক্তার মৈত্রের তো সে কথা জানা নয় ! তিনি কোন্ আক্কেলে এ নম্বর চাইলেন ? এ নম্বর তো চিরকাল এনগেজ্ড। সিদ্ধান্ত : হয় তিনিই দশ মিনিট আগে ডিস্পেন্সারিতে মোহন থাপা সেজেছিলেন, অথবা অপারেটর নিজেই বাহাদুরের পার্টটুকু বলে তারপর ডাক্তার মৈত্রকে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে লাইন আবার ব্যবহার করা হচ্ছে, টেলিফোন রিসিভারে রাখা আছে।'

দাদু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। আবার প্র্যাকটিসে বার হচ্ছেন তিনি। ছুটিও ফুরিয়ে এল, হেবোরা এইবার কলকাতায় ফিরবে। যাবার দিন দাদু ওকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন—'ক্ষুদে গোয়েন্দা। এই ক্যামেরাটা তোমাকে দিলাম। তোমার অদ্ভুত সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ।'

হেবো তো আগেই আনন্দে আটখানা হয়েছিল। ক্যামেরাটা পেয়ে সে একেবারে ষোলখানা হয়ে গেল। পকেট লাইকা ! এতটুকু একটা ক্যামেরা—এত ছোট যে মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের বাঘাবাঘা গোয়েন্দার দল যা ব্যবহার করে। দাদু বুঝি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সেটা আনিয়েছেন কলকাতা থেকে

তাঁর ক্ষুদে গোয়েন্দা-দাদুর জন্য!

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এবার যখন ওরা ফিরে এল কলকাতায় তখন হেবোকে দেখে মনে হচ্ছিল পানিপথ থেকে সদ্য ফিরছেন সম্রাট বাবর শাহ! আর মেজদা? তার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল—ইব্রাহিম লোদি দি সেকেন্ড! বন্ধু-মহলে হেবোর সে কী খাতির! এবারকার ঘটনাটাও সংবাদপত্রের কল্যাণে সকলে আগেই জানতে পেরেছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে তার নামে আবার একখানা চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেও বুঝতে পারে কোথা থেকে এসেছে সেটা। এবার নিশ্চয় উনি হেবোর কৃতিত্বে দুটো প্রশংসার কথা লিখেছেন। অধীর আগ্রহে খামটা খুলে ফেলে হেবো। আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক্ খেল বেচারা! চিঠিতে লেখা ছিল:

'কল্যাণীয়েষু,

পলাশপুরের কীর্তিকাহিনী শুনলাম অজিতেন্দ্রর কাছে। তোমাকে বারবার জানিয়েছি অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখনও বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ভুল হবেই। মনে হয় উপদেশে তোমার শিক্ষা হবে না। ঠেকে শিখতে হবে তোমাকে একদিন। উপায় নেই, তাই-ই তোমার ললাট-লিখন। না হলে এত বড় ছুটিতে তুমি একবারও পড়ার বইগুলো খুললে না কেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অল্প আঘাতেই যেন তোমার চৈতন্য হয়। ইতি—'

আচ্ছা তোমরাই বল, এত বড় সাফল্যের পর ঐ রকম একটা প্যানপ্যানে পানসে চিঠি পেলে কেমন লাগে? হেবো উল্টে রাগ করে পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিল। না, সে পড়বে না। পোপোক্যাটিপ্যাটেল কোথায়, হিউ-এন-সাঙ কে, আর জিরাণ্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কাকে বলে না জানলে বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না। সে বিশ্বাস করে না এ কথা। ঐ তো নৃপতি, ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, বইয়ের পোকা একটা। সে পারত এ রহস্যের কিনারা করতে?

পড়ার বইয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক হেবো চুকিয়ে দিল একেবারে।

তারপর হঠাৎ একদিন ওর মনে হল—উনি কেন লিখলেন, অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখনও কোন বড় কাজ করা যায় না, ভুল হবেই। সে কি কিছু ভুল করেছিল? কী ভুল। ওর হঠাৎ মনে হল, তবে কি একা ডাক্তার মৈত্রের কারসাজি ছিল না সেই ভূতের খেলায়? কিন্তু আর কার স্বার্থ থাকতে পারে?

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। সব নষ্টের গোড়া কি তাহলে লুটুমামা? দাদুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তিটা আসবে লুটুমামার হাতে। তাই কি তিনি ডাক্তার মৈত্রকে দিয়ে নিজের স্বার্থে এই কাজটা করাচ্ছিলেন? ডাক্তার মৈত্রও প্র্যাকটিসটা হাতাবার প্রেরণায় সায় দিয়েছিলেন এই ষড়যন্ত্রে? অসম্ভব নয়; অসম্ভব কেন, নিশ্চয় এটা সম্ভব। অথচ শার্লক হেবোর মত বিচক্ষণ গোয়েন্দা আসল

অপরাধীকে না ধরে ধরল তার সহকারীকে ? ছি ছি ছি !

সুযোগ এল পূজার ছুটির সময়। হেবো বলে—'আবার ছুটিতে আমরা পলাশপুরেই যাই না মা ?'

মা বলেন—'সে কি রে ? পলাশপুরে তো এখন ওঁরা কেউ নেই।'

'নেই ? কেন ? তবে দাদু কোথায় আছেন ?'

'জ্যাঠামশাই শরীর সারাতে দার্জিলিঙ গেছেন।'

'লাভলি !—লাফিয়ে ওঠে হেবো 'তবে দার্জিলিঙেই চল না !'

অবিনাশবাবু ইতস্তত করছিলেন ; কিন্তু পরদিনই ঘটনাচক্রে এল দাদুর একখানা চিঠি। লিখেছেন—'প্রিয় অবিনাশ, তোমার কলেজের তো এখন ছুটি ! আমার দাদুদেরও ছুটি হয়েছে নিশ্চয়। এখানে একা-একা আমার দিন কাটে না। উঁচু-নিচু জায়গায় বেশি হাঁটতেও পারি না। লুটু তো দিবারাত্র শুধু ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে। তার দেখাই পাই না। তোমরা সকলে ছুটিটা এখানে কাটিয়ে গেলে খুশি হতাম।'

মেজদা বলে—'কিন্তু ঐখানটা তো বুঝলাম না মা ! লুটুমামা ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে মানে ?'

হেবো বলে—'বাঃ, ভুলে গেছিস ? লুটুবাবু আর্টিস্ট নয় ! ছবি আঁকা আর মডেল গড়া হচ্ছে তাঁর নেশা ! অন্তত ভেকটা তাই ধরেছেন তিনি।'

মা বলেন—'ও আবার কি ধরনের কথা ! লুটু সত্যিই ভাল ছবি আঁকে।'

হেবো উদাস কণ্ঠে বললে—'দুঃখ এই যে চক্ষুকর্ণের বিবাদটা এখনও মেটে নি। স্বচক্ষে তাঁর কোন শিল্পকার্য দেখি নি তো সেবার।'

'বাঃ ! তখন ঐ অসুখের বাড়িতে—'

মেজদা বাধা দিয়ে বলে—'আচ্ছা লুটুমামা দাদুর কোন্ সম্পর্কের ভাগ্নে ?

মা বলেন, 'ঠিক জানি না। শুনেছি সম্পর্ক কি একটা যেন আছে।'

হেবো মনে মনে বলে—'তা তো আছেই ! যম-জামাইয়ের সম্পর্ক !

শেষ পর্যন্ত কিন্তু অবিনাশবাবু অথবা হেবোর মায়ের যাওয়া হল না। হেবোর কাকিমার শরীর খারাপ। তাই ওঁরা রয়ে গেলেন। অবিনাশবাবু বলেন—'তবে জ্যাঠামশাই অত করে লিখেছেন—ছেলেরা বরং যাক।'

আপত্তি করল মেজদা, বলে—'ওকে নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না ! হয় আমি যাই, হেবো থাকুক, অথবা—'

বাধা দিয়ে মা বলেন—'না না, হেবো এবার কোন গণ্ডগোলের মধ্যে থাকবে না।'

বার বার করে তিনি সাবধান করে দিলেন হেবোকে। হেবো স্পিকটিনট্।

দার্জিলিঙে হেবো যে কাণ্ডটা করেছিল সেই গল্পটা বলেই শেষ করব এ

কাহিনী। কিন্তু ঘটনাটা আমি নিজের ভাষায় বলব না। ওর ডায়েরির খানকতক পাতা তুলে দেব শুধু। তা থেকেই ঘটনাটা জানতে পারবে তোমরা।

১৭ই সেপ্টেম্বর
ঘুম।

কাল মাত্র দার্জিলিঙে এসে পৌঁছেছি। আমার জীবনে এই প্রথম শৈলনগরী দার্জিলিঙ ভ্রমণ। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা বর্ণনা করবার জিনিস বটে ; কিন্তু আমার ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য তা নয়। তাই ডায়েরি-পাঠকের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে এই ডায়েরি লিখতে হচ্ছে এজন্যে যে, আমার জীবনে ডাক্তার ওয়াটসনের সাক্ষাৎ আমি এখনও পাইনি। তিনি আবির্ভূত হলেই আমার ছুটি।

দার্জিলিঙে এসেছি আমি আর মেজদা, উঠেছি দাদুর বাড়িতে। আমার দাদু রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কয়েক মাস আগে ভূতের ভয়ে তিনি স্নায়বিক দুর্বল্যে (কথাটা 'দৌর্বল্যে', হেবো বানানটা ভুল করেছে) ভুগছিলেন। আত্মশ্লাঘা করব না, কোন একজন কিশোর গোয়েন্দার বুদ্ধির জোরে তিনি সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন ; কিন্তু এখনও একেবারে স্বাভাবিক হতে পারেন নি। অল্পেতেই তিনি উদ্বিঘ্ন (অর্থাৎ 'উদ্বিগ্ন'—এত ভুল করলে হেবো হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করবে কেমন করে ?) হয়ে পড়েন। মৃত্যুভয়টা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে !

বাড়িটা ঠিক দার্জিলিঙে নয়—দার্জিলিঙের মাইল-কয়েক আগে—বাতাসিয়া ডবল্ লুপের কাছে, ঘুমে। মস্ত বাড়ি ! দাদুর সঙ্গে আছেন ভাগ্নেপ্রবর, অর্থাৎ আমাদের লুটুমামা। আর আছে কিশোর থাপা, মোহন থাপার ছোট ভাই। সব নেপালীর মত তার চোখ দুটি কুতকুতে, মাথায় খাটো, আর তার ডাকনাম—সব সব নেপালীর মত, বাহাদুর। নটবর দাদুর পলাশপুরের বাড়ির তদারক করছে।

আগেই বলেছি, এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আসবার পথের বর্ণনা লিখে ভ্রমণ কাহিনীর পাতা ভরানো চলে—কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক গোয়েন্দার ডায়েরিতে সে সব বাহুল্য। আমি এখানে এসেছি একটা বিরাট রহস্যের কিনারা করতে—তার প্রথম পর্ব খতম করে এসেছি পলাশপুরে। শুনেছি ডাক্তার মৈত্র এখন ডোরাকাটা হাফ-প্যাণ্ট পরে, গলায় নম্বরি তক্তি ঝুলিয়ে কপি বুনছেন। এবার নাটের গুরুকে গেঁথে তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সেই মহাপ্রভুর সন্ধানেই আমার এ অভিযান।

ঘুম।

লুটুমামাকে যেন চেনাই যায় না! পলাশপুরের সেই ভদ্রলোকটিকে এই লুটুমামার মধ্যে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। এখন উনি পুরোপুরি আর্টিস্টের ভেক ধরেছেন। আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে রোজই ভোরবেলা উনি বেরিয়ে যান, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যা করে। কোন্ পাহাড়ের ধারে, কোন্ গাঁয়ের কিনারে, কোন্ ঝরনার পাশে বসে তিনি ছবি আঁকবেন তা বলে যেতেন শুধু বাহাদুরকে। রোজ দুপুরবেলা বিরাট টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার, ফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে সে খাইয়ে আসে তাঁকে। আমি একদিন ওঁর সঙ্গে ছবি আঁকা দেখতে যেতে চাইলাম—কিন্তু ধমক শুনতে হল পরিবর্তে। আশ্চর্য! ভদ্রলোক যে কী আঁকেন তাও দেখাতে চান না! সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে নিজের ঘরে কাগজমোড়া ক্যানভাসটা রেখে, ঘর তালাবন্ধ করে আবার বেরিয়ে যান। ফেরেন গভীর রাত্রে। লুটুবাবুর চলা-ফেরা রীতিমত সন্দেহজনক। উনি আদৌ ছবি আঁকেন কি? দাদুকে একদিন কথার ছলে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি লুটুবাবুর আঁকা কোন ছবি কখনও দেখেছেন কি না।

দাদু হেসে বলেন—'আবার ওর পিছনে লেগেছ? কেন বাপু? তোমরা খাও-দাও ফুর্তি কর। ওকে নিজের মত থাকতে দাও।'

আমি মনে মনে হাসি। তা দিলে আমার চলে কেমন করে? দুনিয়ার তাবৎ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যদি যার-যার নিজের মত থাকতে দেওয়া যায়, তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর দশা কী হবে? আর আশ্চর্য মানুষ ঐ বাহাদুর! সত্যি রক্তমাংসের মানুষ তো ও? ওকে প্রশ্ন করে কোন জবাব পাওয়ার উপায় নেই। কী ট্রেনিংই দিয়ে রেখেছেন ওকে লুটুমামা! লোকটা যেন কথা বলতেই জানে না। লুটুমামা কিসের ছবি আঁকেন জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। শুধু মিটি-মিটি হাসে। খুদে চোখদুটো একেবারে বুজে যায়।

আমার আরও সন্দেহ হয়, বাহাদুরও এ ষড়যন্ত্রের ভিতর নেই তো! লুটুমামার সহকারী নয় তো সে কোনও পাপের কারবারে?

মেজদাকে একদিন এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। এমন মাথামোটা গবেট ওটা, বলে—'নড়েছে?"

অবাক হয়ে বলি—'নড়েছে মানে? কী?'

'পোকা!'

আরও অবাক হয়ে বলি—'পোকা? কোথায় নড়েছে?'

বলে—'তোমার মগজে!'

ওর সঙ্গে পরামর্শ করা বৃথা। যার মগজে নিরেট গোবর সে কেন যায় পরের মগজের খবর নিতে।

২৫শে সেপ্টেম্বর।

কদিন আর ডায়েরি লিখিনি। কারণ নতুন কোন ক্লুর সন্ধান পাইনি এখনও। একটা জিনিস অবশ্য লক্ষ্য করছি—লুটুমামা এ কয়দিন আর আঁকতে বার হচ্ছেন না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে। একেবারে নির্জনে নয় কিন্তু। বাহাদুরও থাকছে ঘরে। ব্যাপারটা রীতিমত রহস্য-জনক। বন্ধ ঘরে কী করছেন ওঁরা দুজনে? মেজদাকে দ্বিতীয়বার বলতে গেলাম কথাটা। মেজদা ধমকে উঠল—'দ্যাখ্ হেবো! এইজন্যই তোর সঙ্গে আসতে চাইনি। তোর সঙ্গে এখানে একসঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না; হয় তুই থাক আমি ফিরে যাই: না হয় আমিই থেকে যাই তুই ফিরে যা!'

মাথামোটা গবেট কোথাকার! এত বড় সোজা কথাটা খেয়াল হচ্ছে না গবেটটার? এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না? সে খেয়াল করে দেখল না যে, লুটুমামা একজন শিক্ষিত বাঙালী যুবক, ওদিকে বাহাদুর ভাল করে বাঙলা কথাই বলতে পারে না। দু-জনের শিক্ষায় দীক্ষায় আশমান জমিন ফারাক! তাহলে এমন কী বিষয়বস্তু থাকতে পারে যা নিয়ে ওঁরা দুদিন ধরে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে আলোচনা করছেন? একে যদি গোপন ষড়যন্ত্র না বলে তবে কাকে বলে?

আজ বিকালে আর সন্দেহ চেপে রাখতে পারলাম না। লুটুমামার ঘরের পিছন দিকের জানলাটা মাটি থেকে ফুট-আষ্টেক উঁচুতে, যদিও একতলায় ঘর। পাহাড়ে জায়গায় এ রকম হয়েই থাকে। জানলা দিয়ে দেখতে হলে আটফুট উঁচু একটা মই চাই। কিন্তু মই পাব কোথায়! বাধ্য হয়ে দু-খানা ছোট হাত-আয়না কিনতে হল। দু-খানা কঞ্চির দু-প্রান্তে আয়নাদুটো লাগিয়ে একটা পেরিস্কোপ বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল আমার। পেরিস্কোপটা উঁচু করে ধরতেই হঠাৎ জানালা থেকে বেরিয়ে এল লুটুমামার একখানা হাত। পেরিস্কোপটা টেনে নিল সেই হাত ঘরের ভিতর। পরমুহূর্তেই জানলার পরদাটা সরে গেল।

এবং তার পরেই লুটুমামা নেমে এলেন নিচে। বলেন—'তোমাকে বলেছি না, আমার পিছনে লেগো না?'

আমি কোন কথা বলি না।

দাদুর কাছেও কথাটা বলেছেন উনি। দেখলাম দাদুও বিরক্ত হয়েছেন। তবে নাকি আমি ওঁর প্রাণদাতা, তাই মৃদু ধমক দিয়ে শুধু বললে—'লুটুর পিছনে লেগো না। আগেই তোমাকে একবার বারণ করেছি, ও আর্টিস্ট মানুষ, লোকজন পছন্দ করে না।'

আমি নিরীহের মত বলি—'আমি তো ওঁকে বিরক্ত করিনি!'

'শুনলাম আয়না দিয়ে কি সব যন্ত্র তৈরি করেছ?'

আমি চুপ করে থাকি।

দাদু বিরক্ত হয়ে বলেন—'এত বড় বাড়ী, খেলবার জায়গার অভাব তো নেই। ওর কাজের খবরদারি না-ই বা করলে।'

রাত্রে দেখি, মেজদা মস্ত চিঠি লিখেছে। এদিকে মাথা-ভরা গোবর, ওদিকে চুক্‌লি কাটার যম !

৩রা অক্টোবর।

ভগবান এত দিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। না হলে মূক বাহাদুর কী করে এমন মুখর হয়ে ওঠে ? কাল বিকালে লটুমামা বেরিয়ে যাবার পর বাহাদুর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বাতাসিয়া ডবল্ লুপের দিকে বেড়াতে গেলাম আমরা। নির্জনে এসে বাহাদুর আমাকে খুলে বললে তার সমস্যার কথা। ভাঙা-ভাঙা হিন্দির মধ্য থেকে যে কাহিনীটা উদ্ধার করলাম, তা এই :

বাহাদুরের বাড়ি এই দার্জিলিঙ পাহাড়েই। গয়াবাড়ি টী এস্টেটে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে একটা পাথরের মূর্তি পেয়েছে। কোন তিব্বতী লামার কাছ থেকে ওর ঠাকুর্দা এনেছিলেন বুঝি। বাহাদুর সেটাকে নিত্যপূজা করে। লটুমামার নজর পড়েছে ঐ মূর্তিটার উপর। তিনি বাহাদুরকে পীড়াপীড়ি করছেন মূর্তিটা তাঁকে বিক্রি করে দিতে। প্রথমে নগদ পাঁচ টাকা দর দিয়েছিলেন—বাহাদুর আপত্তি করায় দরটা বাড়িয়ে দশ-বিশ-পঁচিশ করতে করতে করতে নগদ একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছে ! অথচ বাহাদুরের ইচ্ছে নয় দেবমূর্তিকে সে বিক্রয় করে। ওকে গররাজি দেখে লটুমামা আজ ওকে বলেছেন নগদ দুশো টাকা দেবেন তিনি। বাহাদুর ইতস্তত করছে এখন। দুশো টাকা কম নয়। অথচ ঠাকুর্দার আমল থেকে ওদের বংশে মূর্তিটার পুজো হচ্ছে। দেবতাকে বিক্রয় করতেও মন উঠছে না। আজ বাহাদুরের আবার ভয় হয়েছে—লটুমামা ঐ মূর্তিটা পাওয়ার জন্য যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন, তাতে মনে হয়, সোজাপথে ওটা না পেলে বাঁকা পথের আশ্রয় নিতেও তিনি পিছপাও হবেন না।

বুঝতে পারি, যে-কোন কারণেই হোক মূর্তিটা অত্যন্ত মূল্যবান। কী হতে পারে ? মূর্তিটা দেখতে চাইলাম। বাহাদুর আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কনকনে শীত পড়েছে। ওর ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালল বাহাদুর। আউট-হাউসে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। প্রদীপের আলোয় ঘরখানা ভাল করে দেখি। ছোট ঘর—একদিকে বাহাদুরের বিছানা পাতা, চৌকির উপর। চৌকির নিচে আছে কালো রঙের একটা ট্রাঙ্ক। অপর পাশে একটা বাক্স-মত কিছু কাপড় দিয়ে ঢাকা। সামনে একটা কাঠের বেদীর উপর বসানো আছে বাহাদুরের দেবমূর্তি। ফুটখানেক উঁচু। শ্বেতপাথর খুদে বানানো। একটা রাক্ষস যেন হা হা করে হাসছে ! এ আবার কেমন দেবমূর্তি ? যাই হোক মূর্তিটার

চোখদুটো দেখবার মত! প্রদীপের আলোয় চোখদুটো জ্বলে উঠল। কী দিয়ে তৈরি চোখদুটো? হীরে নয় তো? না হলে এই সামান্য পাথরের মূর্তিটার জন্য এত দাম দিতে চাইছে কেন লুটুমামা? পাথরের মূর্তিটা ফাঁপা নয় তো? ওর ভিতরে কোন নবাবজাদার হারানো কমলমণি হীরে অথবা কোন মহারানীর নেকলেস লুকানো নেই তো? তিব্বতী লামাদের নিয়ে অনেক রহস্যজনক গল্প পড়া আছে। তিব্বতী লামা যে গল্পে ঢুকবে সেই গল্পেই রহস্যজনক একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানেও নিশ্চয়ই তেমন কিছু আছে।

বাহাদুরকে অত কথা কিছু বললাম না। তাকে শুধু বলি যে, কোন দামেই যেন সে দেবমূর্তিটা বিক্রয় না করে। তাহলে দেবতার রোষ পড়বে তার উপর। বাহাদুর বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারে। ঘাড়টা নাড়ে বার-দুই। আধবোজা চোখদুটো একেবারে বন্ধ করে কি যেন মন্ত্রপাঠ শুরু করে।

ওর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন লুটুমামা। তার চোখদুটো জ্বলছে ঐ মূর্তিটার মতই। আমাকে দেখে বলেন—'আবার বাহাদুরের পিছনে লেগেছ?'

আমি বলি—'আমি তো দেখছি আপনিই আমার পিছনে লেগেছেন।'

'বটে! তা এখানে কী মনে করে?'

আমি গম্ভীরভাবে বলি—'বাহাদুর ঐ মূর্তিটা বিক্রি করবে শুনেছিলাম—তাই দেখতে এসেছি।'

'তুমি কিনবে বুঝি? কত দাম জান ওটার?'

'জানি, এবং এ-ও জানি আপনি যা আন্দাজ করেছেন তার চেয়ে বেশী।'

একটু থতমত খেয়ে যান লুটুমামা। বলেন—'কত দাম বল তো?'

'আমি বাহাদুরকে তিনশো টাকা দাম দিয়েছি।'

একেবারে হকচকিয়ে যান লুটুমামা। আমতা আমতা করে বলেন—'অত টাকা তোমার কাছে আছে?'

আমি একটা মোক্ষম চাল চালি। বলি—'না নেই, তবে জানা খদ্দের আছে, যে ওর চেয়েও বেশি দামে আমার কাছ থেকে ওটা কিনে নেবে।'

অনেকক্ষণ লুটুমামা কোন জবাব দিলেন না। তারপর গুটি-গুটি দাদুর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে মেজদা আমাকে ডেকে বললে—'আর তো পারি না তোর জ্বালায় হেবো! আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিস তুই? দ্যাখ, এভাবে আমার পোষাবে না, হয় আমি থাকি তুই চলে যা—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—'অথবা তুমি থাক আমি চলে যাই, কেমন

না ? কিছু ভাবতে হবে না মেজদা, তুমি আমি দু-জনেই থাকব। যেতে হয়, যাবে ঐ কংসমামাই ?'

৫ই অক্টোবর।

আজ সকাল থেকে দেখি লুটুমামার ঘর তালাবন্ধ। কোথায় গেছেন তিনি। আমার চোখ এড়িয়ে কিছু হবার জো নেই। একটু সন্ধান নিতেই বুঝতে পারলাম লুটুমামা গিয়ে প্রবেশ করেছেন আউট-হাউসের ঐ খাপরার ঘরখানায়। সকাল তখন আটটা। সমস্ত সকালটা নজরে নজরে রেখেছি তাঁকে। কী আশ্চর্য, উনি যখন ঐ আউট-হাউসের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তখন সকাল এগারটা। সাড়ে তিনঘণ্টা ধরে ঐ খাপরার ঘরে দু-জনে মিলে কিসের পরামর্শ করেছিলেন, লুটুমামা আর বাহাদুর ? ওঁর ঘরে কেন যে পরামর্শ-সভাটা আর বসছে না তা উনিও জানেন, আমিও জানি। কাল বিকালে উনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে।

পেরিস্কোপের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার পর আমি নিশ্চিন্ত থাকিনি। কাল বিকালে লক্ষ্য করে দেখলাম, পিছনের পাহাড়ে একটি স্থান আছে যেখানে যেতে পারলে ঐ ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে ঘরটা দেখা যাবে। কিন্তু দূরত্বটা বড় বেশি। অন্তত পাঁচশো ফুট তো বটেই। অত দূর থেকে ঘরের ভিতর কি হচ্ছে দেখা যাবে না। তাই 'গুরুবিদায়'-কেসে পাওয়া বাইনোকুলারটা নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। অনেক কায়দা করে হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গাটায় পেঁছে যেই বাইনোকুলার দিয়ে তাক করতে যাব অমনি জানলার পর্দাটা কে যেন টেনে দিল। উনিও কি ঘর থেকে বাইনোকুলার নিয়ে জানলা থেকে লক্ষ্য করছিলেন আমার পর্বতারোহণ ?

তা সে যাই হোক দুপুরবেলা বাহাদুর এসে আমাকে চুপি-চুপি খবর দিয়ে গেল লুটুবাবু আজ সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন। ভদ্রলোক সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন যে, শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বেশি কিছু কায়দা করা যাবে না। সারাটা দুপুর ধরে মামাবাবু বাঁধাছাঁদা করলেন, আমি ভালমানুষের মত আড়চোখে শুধু দেখেই গেলাম। কী হতে পারে ? যদিও বুঝছি গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে—তবু ষড়যন্ত্রটা কি জাতীয় যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ প্রতিষেধক প্রয়োগ করি কেমন করে ?

লুটুমামা আদৌ ছবি আঁকেন না এটা বুঝতে পেরেছি। এ সত্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কী প্রমাণ ? বলছি। লেখকরা লিখে থাকেন, গায়করা গান শেখেন, চিত্রকররা ছবি আঁকেন, অভিনেতারা পার্ট মুখস্থ করেন। কেন ? লেখা, গান শেখা, ছবি আঁকা বা পার্ট মুখস্থ করা তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন লেখক-গায়ক-চিত্রকর-অভিনেতারা সাক্ষাৎ পান সমঝদারের। লেখকের চাই পাঠক, গায়কের শ্রোতা,

চিত্রকরের দর্শক এবং অভিনেতার হাউস-ফুল বিজ্ঞপ্তির। লটুমামা কিন্তু ব্যতিক্রম। তিনি ছবি আঁকেন, কিন্তু কাউকে দেখতে দেবেন না। পাছে আমরা দেখে ফেলি, পাছে আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি। বুঝেছি মশাই, এ আপনার স্রেফ ধাপ্পাবাজি!

তবে কেন অমন ঢং ধরেছেন? রঙ-তুলি-ইজেলের বোঝা নিয়ে কেন এত ভণ্ডামি? তাও জানি। যে পাপ কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, তাতে পাহাড়ে পর্বতে সারাদিন ওঁকে টো টো করে ঘুরতে হয়। তার জন্য একটা ভড়ং চাই। কী? না—আমি আর্টিস্ট; আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই এভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার। তোমরা রোজ-রোজ আমাকে এমনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে মনে কোনও সন্দেহ পোষণ কোরো না। কারণ আমি আর্টিস্ট। আমি ছবি আঁকবার জন্যই এ কৃচ্ছ্রসাধন করছি। এটা বোঝা সহজ। তাহলে বাহাদুর সে কথা প্রকাশ করে দেয় না কেন? এর একটিমাত্র জবাব হতে পারে, বাহাদুরও ঐ পাপ কাজের ভাগীদার। না হলে ঐ নিরক্ষর নেপালীটার সঙ্গে অর্গলবন্ধ ঘরে তিনি তিনদিন ধরে কিসের কনফারেন্স করলেন? কিন্তু বাহাদুর যদি মামার সাকরেদই করবে তবে সে মূর্তিটার কথা আমাকে বলে দিল কেন? এরও একটা সম্ভাব্য জবাব আছে। চোরে চোরে যখন মাসতুতো ভাই তখন নেক-এ নেক-এ ভাব। আবার চোর যখন চোরের উপর বাটপাড়ি করে তখন সহযোগী চোরের নেক-এ ছুরি চালাতেও দ্বিধা করে না! এইভাবেই লটুমামা ডাক্তার মৈত্রকে ফাঁসিয়েছিল এবং ডাক্তার মৈত্রও লটুমামাকে ফাঁসাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত বড়-বড় ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে তাদের মূলেও এই একই কথা।

বাহাদুরকেও ডেকে সাবধান করে দিলাম। বললাম, অন্তত আজকের দিনটা সে যেন ঐ রাক্ষস মূর্তিটা সামলে সামলে রাখে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশদা একবার একটা মূর্তির ভিতর থেকেই কমল হীরে আবিষ্কার করেছিলেন; হিচককের নর্থ-ওয়েস্ট-এও দেখা গেছে মূর্তির ভিতর লুকিয়ে গোপন খবরের 'টেপ' পাচার করা যায়। শার্লক হোমসের একটি গল্পে পাথরের মূর্তির ভিতর থেকে রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল! এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এই ধরনের কিছু হচ্ছে। না হলে এই সামান্য মূর্তিটার জন্য লটুমামা চারশো টাকা দর দেবেন কেন? ওহো, ভুলে গেছি, আমি তিনশো টাকা দর দেবার পর মামাবাবু নিলামের দর আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুরোপুরি চারশো টাকাই দেবেন তিনি। শুরু করেছিলেন পাঁচ টাকা থেকে। কেমন যেন রোখ চেপে গেছে। সে কিছুতেই বিক্রয় করবে না মূর্তিটা। না, চারশো টাকা পেলেও নয়!

বাহাদুরকে বলি, মূর্তিটা যেন আজকে সামলে রাখে। কারণ আজ অতর্কিতে ওটা চুরি যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দেখলাম বাহাদুরও সেটা আশঙ্কা করেছে।

ওর খুদে-খুদে চোখদুটো আরও ছোট হয়ে গেল। বলে—'চুরি যানে সে—হুঁ!' হাত দিয়ে নিজের গলার কাছে জবাই করার আড়াই-পোঁচ ভান করে। কী সর্বনাশ! শেষকালে খুনোখুনি কাণ্ড হবে নাকি একটা? বিচিত্র নয়! লুটুমামা যদি ওটা অন্যায়ভাবে নিয়ে সরে পড়তে চান তবে বাহাদুরের ভোজালিটাও হঠাৎ রক্ত-পিপাসু হয়ে উঠতে পারে!

কিন্তু সারাদিন যাবার উদ্যোগই করলেন লুটুমামা—গেলেন না। সন্ধ্যাবেলায় দেখি দাদুকে বলছেন—'একটা কাজ বাকি আছে। আজ রাতে সেটা সেরে কাল ভোরের গাড়িতে যাব আমি।'

আমি মনে-মনে হাসি। মনে-মনেই বলি—'হে সম্রাট কংসমামা! জানি, আপনার কোন্ মহৎ কর্মটি অসমাপ্ত আছে। বাহাদুরের হীরকখচিত মূর্তিটির অপহরণ-পর্ব! কিন্তু আপনি তো জানেন না শ্রীমান শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি গোকুলে বাড়ছে! শার্লক হেবো থাকতে ওটা অপহৃত হবে না! হতে পারে না!'

তৎক্ষণাৎ খবরটা বাহাদুরকে দিলাম। ওকে খুব সাবধানে থাকতে বললাম আজকের রাত্রিটা।

* * *

মজার কথা এই যে, হেবোর ডায়েরিতে এর পর মাস দুই-তিন আর কিছু লেখা নেই। আমি তো অবাক! এমন একটা মারাত্মক জায়গায় এসে হঠাৎ ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন সে? আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছিল। তোমাদেরও হচ্ছে নিশ্চয়—নয়? শেষ পর্যন্ত ওর মেজদার কাছ থেকে বাকি অংশটা আমি উদ্ধার করেছিলাম:

হেবো লক্ষ্য করল যে লুটুমামা প্রতিদিনের মত সেদিন আর সন্ধ্যায় কোথাও বার হলেন না। সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে দরজায় খিল দিলেন। হেবো সতর্ক হয়ে জেগে রইল। 'ঘুম'-এর কন্‌কনে হাড়-কাঁপানো শীত। 'ঘুম'-এর দেশের ঘুম ওর চোখে জড়িয়ে ধরেছে। হেবো প্রতিজ্ঞা করেছিল এই কালরাত্রে সে কিছুতেই ঘুমোবে না। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ওকে বলে দিচ্ছিল যে শেষ রাত্রে লুটুমামা ঐ রাক্ষস মূর্তিটা অপহরণ করে ভোরের গাড়িতে কলকাতা পালাবেন।

...মেজদা পাশেই লেপ মুড়ি দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। কী মজা ওদের! দুনিয়ার যত ঠগ বদমায়েশ তোমাদের আশেপাশে সর্বনাশের জাল পাতে, আর তোমরা মোষের মত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোও! আর সর্বনাশ যখন হয়ে যায় তখন সকালবেলা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হাঁউমাউ করে কাঁদতে বস!

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রাদেবী এসে হেবোর চোখে পরিয়ে দিলেন ঘুমের কাজল। হঠাৎ ভোর রাতে কিসের আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে শুনলে মেজদার নাক ডাকছে 'ফৎ, ফৎ, ফত্যুর্‌র্‌র্‌!'

ধক্ করে উঠল হেবোর বুকের মধ্যে—ওদিকেও কি সব ফতুর হয়ে গেল নাকি ? লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হেবো। রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটায় (যেটা সে আফিং-চোর ধরে প্রাইজ পেয়েছিল) দেখে, ভোর পাঁচটা। অর্থাৎ সকাল হয়ে এল প্রায়। আলনা থেকে সোয়েটার, ওভারকোট, মোজা, মাফলার একে-একে গায়ে চড়াল হেবো। তারপর পা টিপে-টিপে বার হয়ে এল ঘর থেকে। মেজদা তখনও ঘুমোচ্ছে অঘোরে। ক্যালকাটা রোডের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। পাশেই লুটুবাবুর ঘর। আশ্চর্য ! তাঁর দরজা খোলা। অথচ ঘর অন্ধকার। হেবো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। বাঁ হাতের টর্চটা জ্বালতেই লক্ষ্য হল সুটকেস বিছানা সব একপাশে গোছানো আছে—অথচ লুটুবাবু নেই। টর্চ নিবিয়ে হেবো বেরিয়ে আসে বাগানে। দ্রুত পদে বাগানটা পার হয়ে এসে পেঁছয় বাহাদুরের ঘরে। দরজা বন্ধ। পিছন দিকে গিয়ে দেখে একটা জানলা খোলা আছে। চমকে ওঠে হেবো। এই শীতে কেউ জানলা খুলে শোয় ? জানলা দিয়ে ভিতরে একবার উঁকি মেরে দেখতে পারলে হত ! মূর্তিটা যেখানে থাকে সেটা জানলার ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া উচিত। হেবো একবার স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু জানলাটা বেশ উঁচুতে। হেবো নাগাল পেল না। পেরিস্কোপটা বেহাত হয়ে গেছে—না হলে এ সময়ে সেটা কাজে দিত। তবে উদ্যোগী পুরুষসিংহের অসাধ্য কাজ নেই। হেবো উঠে পড়ল পাশের কমলালেবু গাছটায়। গাছের নিচের দিকেই একটা ডাল বার হয়েছে। তার উপর উঠে হেবো উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। ভিতরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। হেবো টর্চটা জেবলে ঘরের ভিতর আলো ফেলল—ঠিক যেখানে মূর্তিটা রাখা ছিল !

হঠাৎ এক ঝলক আলোয় হেবো যা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে ওঠে। হাত থেকে প্রথমেই টর্চটা গেল পড়ে। তারপর ঠক্-ঠক্ করা হাঁটুদুটো আর হেবোর দেহভার রাখতে পারল না। মাথা ঘুরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে।

হেবোর দোষ নেই। ও তো ছেলেমানুষ, বড়রা কেউ ও দৃশ্য দেখলেও অজ্ঞান হয়ে যেতেন। হেবো একঝলক আলোতেই স্পষ্ট দেখে নিয়েছিল—বেদীর উপর মূর্তিটা নেই। তার বদলে ঠিক সেই জায়গায় একটা পেতলের থালায় রাখা আছে বাহাদুরের ছিন্ন মুণ্ডু।

একনজর মাত্র দেখেছে সে, কিন্তু ভুল হেবোর হয় নি। হতে পারে না। আদালতে হলফ্ নিয়ে হেবো সনাক্ত করতে পারে যে মুণ্ডুটা গয়াবাড়ি টী এস্টেটের কিশোর থাপার। সেই চ্যাপটা নাক, খুদে খুদে চোখ, ভ্রূর উপর কাটা দাগ, মাথায় তখনও সেই তার টিপিক্যাল টুপিটা, আর গলার নিচে ধড় নেই। ঘরে ও প্রান্তে খাটানো মশারির তলা থেকে বাহাদুরের একখানা ঠ্যাং বেরিয়েছিল। অর্থাৎ ধড়টা চাপা দেওয়া আছে মশারির তলায়। ধড় থেকে মুণ্ডুর দূরত্ব—তা অন্তত দশ ফুট।

মিনিট-দুয়েক সময় লাগল উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু না, সে ভয় পায় নি! জন্ম-ডিটেকটিভ সে, বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস্! ভয় পেলে চলবে কেন? তবে ওর জীবনে এটাই প্রথম ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস তো! কাটা লাশ এর আগে দেখা ছিল না বলেই হাঁটু দুটো ঐ একটু ইয়ে-মত হয়ে গিয়েছিল, ভয় পায় নি। হেবো মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। এবার আর জেল নয়, অপরাধীকে ধরতে পারলে তাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হবে। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস! হত্যাকারী এখনও বাড়িতেই আছে। চকিতের মধ্যে মনে হল, বাড়িতে শক্তসমর্থ লোক কেউ নেই। দাদু বৃদ্ধ, সে ছেলেমানুষ, মেজদাটা ক্যাবলা আর বাহাদুরের ধড়-মুণ্ডুর মধ্যে দশ ফুটের ফারাক। সুতরাং হত্যাকারী ভাগ্নেপ্রবরকে বলপ্রয়োগে ধরা যাবে না। না যাক। বল তুচ্ছ, বুদ্ধিই বড়! শার্লক হেবোর বুদ্ধি খুলে গেল চট করে। সবার আগে ঐ ট্যাক্সিটাকে কায়দা করে সরাতে হবে। ওটার সাহায্য না পেলে আততায়ী বেশি দূরে যেতে পারবে না। ওটা ক্যালকাটা রোডে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয় লুটুবাবুর অপেক্ষায়।

সদর দরজা খুলে পাহাড়ি ছাগলের মত লাফাতে লাফাতে হেবো নেমে এল পিচমোড়া কার্ট রোডে। ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় তখন প্রথম আবিরের প্রলেপ লেগেছে। লাগুক, হেবোর সে সব নজরে পড়ে না। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে—'আমাকে এক্ষুনি ঘুম স্টেশনে নিয়ে চল—'

ড্রাইভার বলে—'লেকিন উ বাবুকা ক্যা হুয়া? লাট্টুবাবু?'

'হাঁ-হাঁ, ঐ লাট্টুবাবুই তো আমাকে পাঠালেন; বললেন—'ঘুম স্টেশন থেকে একগাছা লেত্তি নিয়ে আয়। গলায় জড়াবো!'

'লেত্তি কৌন চীজ? কম্পাটার?'

'না সর্দারজী! সে মোম দিয়ে পাকানো মোক্ষম জিনিস! তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমাকে স্টেশনে নিয়ে চল দিকিনি!'

ড্রাইভার ওকে বাড়ির দরজা খুলে নেমে আসতে দেখেছিল। তাই আর আপত্তি করে না। ঘুম স্টেশনে হেবো আবিষ্কার করল দু-জন পুলিস কনস্টেবলকে। হেবো তাদের সব কথা খুলে বলল সংক্ষেপে। যদিও প্ল্যাটফর্মেই ওদের ডিউটি ছিল, তবু মানুষ খুন হয়েছে শুনে ওরা দু-জনেই ওর সঙ্গে আসতে রাজি হল। ওদের মধ্যে একজন আবার কিশোর থাপাকে চেনে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হেবোরা ফিরে এল অকুস্থলে। হেবোর নির্দেশমত সেই কনস্টেবলটা উঠল কমলাগাছের উপর। হেবো ঘরের মধ্যে পাঁচ সেলের টর্চের আলো ফেলতেই ধপ্ করে পড়ে গেল পুলিসটা। তার মুখে তখন শুধু—"রাম-রাম-রাম!"

হেবো ধমক দিয়ে ওঠে—'রাম নাম পরে জপ কোরো। কাটামুণ্ডু দেখেছ?'

'জী-হাঁ, রাম-রাম!'

'মুণ্ডুটা নেপালীর ?'

'জী হাঁ, রাম-রাম !'

'ওকে চিনতে পারলে ?'

'জী হাঁ, কিশোর থাপা ! রাম রাম !'

'ব্যস্। তবে এস। হত্যাকারী এখানেই আছে !'

ওরা তিনজনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল লুটুবাবুর ঘরের সামনে। হেবো উঁকি মেরে দেখল, দরজার দিকে পিছন ফিরে লুটুমামা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন। তাঁর গায়ে একটা সার্জের শার্ট, নিম্নাঙ্গে শুধুমাত্র আণ্ডার-ওয়্যার। প্রস্থানের প্রস্তুতি। হেবো সন্তর্পণে দরজাটা টেনে আলগোছে তুলে দিল শিকলটা। একটা শব্দ হল। লুটুমামা সচকিত হয়ে বলেন—'কে ?'

হেবো বললে—'কংসমামার যম !'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন লুটুমামা—'এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটে বদমায়েশ ! দরজা খোল্ শিগগীর !'

হেবো প্রাণ খুলে হাসল। চিল্লাও যত পার ! বাঘ এখন বন্দী !

রাম-রাম পুলিসকে দরজায় পাহারায় বসিয়ে হেবো তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়ে থানার উদ্দেশে। যাবার আগে বার-বার করে রাম-রাম পুলিশকে সতর্ক করে যায় —থানার দারোগা আসার আগে সে যেন কোন কারণেই শিকল না খোলে। তাহলে খুনী আসামী পালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে তার ঘাড়ে। পুলিসটা রাম-নাম জপ করতে করতেই ঘাড় নেড়ে জানায়, নির্দেশটা সে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

ট্যাক্সি করে থানা-অফিসারকে নিয়ে আসতে সময় লাগল প্রায় আধ ঘণ্টা। ততক্ষণে বেশ সকাল হয়ে গেছে। ওরা এসে দেখে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে রাম-রাম অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সকলে, মায় আশপাশের বাড়ির অনেকেই গণ্ডগোল শুনে এসে হাজির হয়েছেন। পথ-চল্তি লোকও জমে গেছে বেশ। ভিতর থেকে লুটুমামা আপ্রাণ চিল্লাচ্ছেন—'এ সেই পাজি বদ্মায়েশ বোম্বেটেটার কাজ ! আমার ট্রেন ফেল হয়ে গেল ! মামা তুমি খুলে দাও দরজা !'

দাদুও রাম-রামকে বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন—'লক্ষ্মী মানিক আমার, এইবার দরজা খুলে দাও, কিন্তু রাম-রামের তখন অন্য মূর্তি ! একে সকাল হয়ে গেছে, তায় লোকজন অনেক এসেছে। আর তার ভূতের ভয় নেই। সে গোঁফে তা দিয়ে শুধু বলছে—মাপ কিজিয়ে ! বড়া-সাব থানাসে আ রহে হৈঁ। বিনা হুকুম ম্যয় কেওয়ারি নেহি খুলুঙ্গা !'

থানা-অফিসার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোমর থেকে রিভলভার বার করে লুটুমামার উদ্দেশ্যে বললেন—'আমি এ থানার ও-সি ! আমি দরজা

খুলে দিচ্ছি। বেরিয়ে এস। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করব। আমার হাতে পিস্তল।'

দরজা খুলে দেওয়া হল। বেরিয়ে এল অসমাপ্ত বেশে লুটুমামা। গোঁফজোড়াটা তাঁর ঝুলে পড়েছে। বলেন—'এর মানে কী?'

হেবো বললে—'মানেটা, আপনি ধরা পড়ে গেছেন লুটুবাবু!'

লুটুবাবু চীৎকার করে ওঠেন—'চোপরাও, বজ্জাত বোম্বেটে ছোকরা!'

প্রাণখোলা হাসি হাসল হেবো।

দারোগা বলেন—'আপনাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। অবশ্য ফুলপ্যাণ্টটা পরে নিতে পারেন আপনি।'

লুটুমামার পরনে তখনও সেই সার্জের শার্ট, নীল নেকটাই আর আণ্ডার-ওয়্যার। তিনি বলেন—'থানায়? কিন্তু কেন?'

'আপনাকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করছি আমি।'

লুটুমামা চমকে উঠে বলেন—'খুন? কে করেছে? কাকে খুন করেছে?'

হেবো বলে—'অভিনয় আপনার নিখুঁত কংসমামা—কিন্তু ওতে কোন কাজ হবে না! খুন হয়েছে বাহাদুর—গতকাল রাত্রে। তার রাক্ষসমূর্তিটাও চুরি গেছে। চুরি ঠিক যায়নি অবশ্য—আপনার জিনিসপত্র সার্চ করলেই সেটা পাওয়া যাবে। আর, কে খুন করেছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? খুনীর নাম, নটোরিয়াস আর্টিস্ট লুটুমামা দি গ্রেট।'

লুটুমামার বাক্যস্ফুর্তি হয় না। চোখদুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে শুধু।

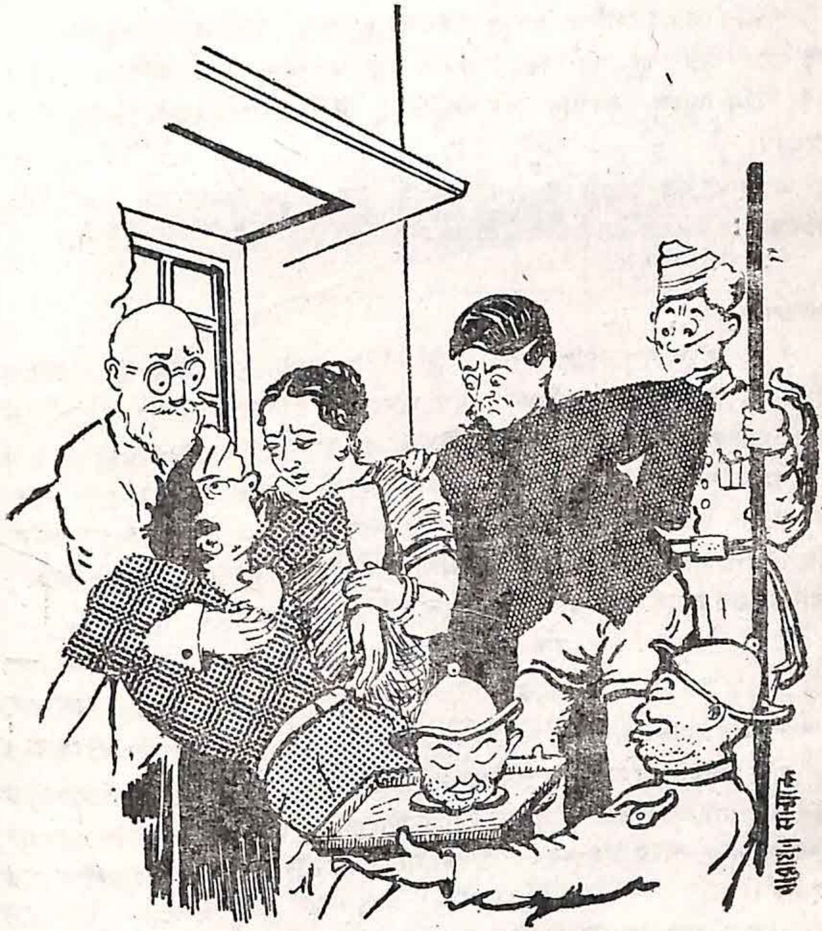
দাদু বললেন—'কে খুন হয়েছে? বাহাদুর? কিশোর থাপা?'

'হ্যাঁ দাদু! নৃশংস হত্যাকাণ্ড! তার কাটা মুণ্ডু পড়ে আছে তার ঘরে!' ঠিক এই সময়ে একটা বজ্রপাত হল যেন! ঘটনাটা এমন ভয়ঙ্কর যে, স্বয়ং শার্লক হেবোর মত দুঃসাহসী গোয়েন্দাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার মাথার মধ্যে টলে উঠল। চোখের উপর ভেসে উঠল যোজন-বিস্তৃত ফুলে ভরা সরিষার ক্ষেত।

সংজ্ঞা হারিয়ে কাটা কলাগছের মত দাদুর কোলে লুটিয়ে পড়ল হেবো।

গুরুতর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে—ঠিক সেই সময়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিল শ্রীমান কিশোর থাপা। তার মুণ্ডুটা ছিল গলাবন্ধ কোটের উপর—স্বস্থানেই। তবে তার হাতে ধরা ছিল একটা পিতলের থালা এবং তার উপর কিশোর থাপার আর-একটি মুণ্ডু। রক্ত-মাংসের নয়—মাটির। বিচিত্র হেসে বাহাদুর লুটুমামাকে এই সময় বলে ওঠে—'হাঁ সাব! মেরা শিরঠো আপ ভুল গয়ে থে! ম্যয় লায়া হুজৌর কো ওয়াস্তে।'

দারোগার প্রশ্নের জবাবে বাহাদুর তার জবান বন্দীতে বলেছিল, গত এক সপ্তাহ ধরে লুটুমামা তাকে সামনে বসিয়ে তার একটা হেডস্টাডি করছিলেন, কাল রাত্রে সেটা তিনি নিয়ে আসতে ভুলে যান। আর তার রাক্ষসমূর্তিটা ? না, সেটা খোয়া যায় নি। গতকাল রাত্রে সেটা ট্রাঙ্কে তুলে রেখেছিল সাবধানতা অবলম্বন করে। আর মুণ্ডুটা পেতলের থালায় বসিয়ে ও রেখে দিয়েছিল জানলার ধারে।



লুটুবাবু বাহাদুরের ভুলটা শুধরে দেন। বলেন—'ওটা রাক্ষস-মূর্তি নয় মোটেই—ওটা হচ্ছে লাফিং বুদ্ধ। চীনা ধরনের একরকম বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয়, চীনা আর নেপালী ভাস্কর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে নাকি ঐ শিল্পনিদর্শনাটিতে। তাই তিনি সেটা বাহাদুরের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলেন। বাহাদুর রাজি না

হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয় নি।

দাদু হেবোকে পরীক্ষা করে বললেন—'শক্ পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মূর্ছা ভাঙতে দেরি হবে।'

মেজদা ভয়ে ভয়ে বলে—'ওষুধ দেবেন না কিছু ?'

দাদু বলেন—'না, ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে দাও ওকে। কেউ ওর ঘরে যাবে না।'

বিচক্ষণ ডাক্তার মৌলিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বুঝেছিলেন, এমন কোনও ঔষধ নেই যাতে বেলা এগারোটা সতের মিনিটের আগে হেবোর মূর্ছা ভাঙানো যায়। তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন যেন লুটুবাবু ঐ এগারোটা সতেরর ট্রেনটা ধরতে পারেন।

এবার ছুটির শেষে কলকাতায় ফিরে এসে হেবো কাকে যেন একটা চিঠি লিখেছিল :

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার উপদেশ কর্ণপাত করি নাই বলিয়া আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। শিক্ষা আমার হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ছাত্রজীবনে আর গোয়েন্দাগিরি করিব না। ডিটেকটিভ বই পড়িব না, বাজে সিনেমা দেখিব না। বাবা, হেডমাস্টারমশাই এবং আপনার এত উপদেশেও যে প্রতিজ্ঞা করি নাই, আজ কেন তাহাই করিতেছি, তাহা জানিতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হইতেছে। মার্জ্জনা করিবেন—সে লজ্জার কাহিনী আমি বলিতে পারিব না। তবে দেখিবেন—আমার কথার নড়চড় হইবে না। আশীর্বাদ করুন যেন সত্য রক্ষা করিতে পারি।

ইতি—

আশীর্বাদভিক্ষু

শুধু হেবো।

খবর পেয়েছি হেবো তার প্রতিজ্ঞা এ-পর্যন্ত রক্ষা করে চলেছে। ডিটেকটিভ বই দেখলে নাকের ডগাটা আজকাল তার কেমন যেন কুঁচকে যায়—নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধে যেমন হয় পরম বৈষ্ণবের। গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে বাক্সবন্দি করে রেখেছে।

একমনে শুধু পড়াশুনাই সে করছে আজকাল। সামনে হায়ার সেকেণ্ডারির বিরাট কোর্স। সে পরীক্ষায় তাকে স্কলারশিপ পেতেই হবে।

তা হেবো পাবে। এতদিন অবশ্য ফাঁকি দেওয়াতে গোড়াটা কাঁচা রয়ে গেছে। তবু এত বুদ্ধি ওর, এত খাটছে···পাবে না ?

তোমরা কী বল ?



আজ স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু ছেলেবেলায় আমার অবস্থাটাও ছিল ঐ রকম,
'আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে, ছিল মনে।' ছেলেবেলায় জীবনের লক্ষ্য ছিল একটা
মহাকাব্য রচনার। বাল্মীকির যেমন রাম, বেদব্যাসের যেমন অর্জুন, আমারও তেমনি
হাতের কাছে ছিল ভুতোদা। রামের অয়ন যদি 'রামায়ণ' হতে পারে, তবে ভুতোদার
কীর্তিকাহিনী নিয়ে আমার 'ভুতায়ন' কাব্যই বা চলবে না কেন?

এখন সেসব কথা মনে পড়লেও হাসি আসে। ছেলেবেলার সেসব দিনগুলো
কোথায় হারিয়ে গেছে। যে ভুতোদা ছিল আমার গুরুদেব, আমার ধ্রুব নক্ষত্র, সে
এখন কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা, তাই খবর রাখি না। ছেলেটার অনেক
দোষ ছিল, তবু তাকে আমরা সবাই ভালবাসতাম। ছেলেবেলায় তার কীর্তিকাহিনী-
গুলির কিছু কিছু আমার এখনও বেশ মনে আছে। তা থেকেই তোমাদের দু'একটা
উপহার দিই। আশা করি, তোমরাও ক্রমশ ভুতোদাকে ভালবেসে ফেলবে।

ভুতোদা ছিল আমাদের ক্লাসের সেরা ছেলে। 'সেরা' মানে ফার্স্টবয় নয়, যাকে
বলে লীডার আর কি। না, ভুল বললাম,—ক্লাসটা তো আমাদের নয়। ক্লাসটা
ভুতোদারই। আমরাই বরং এ বছর ভুতোদার ক্লাসে উঠেছি প্রমোশন পেয়ে। আগের
বছরও এ ক্লাসটা ছিল ভুতোদার, নিঃসন্দেহে পরের বছরও তাই থাকবে। মাত্র একটি
বছরের জন্য ওর ক্লাসে বসবার অনুমতি সে দিয়েছে আমাদের ক্লাসসুদ্ধু ছেলেকে।

সত্যিই স্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার ঐ ঘরখানায় শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্যের ছিল
মৌরসী-পাট্টা। একেবারে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের হাত থেকে পাওয়া চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত কিনা জানি না, কিন্তু ভুতোদা যখন বলত, 'ওরে এই ভুশণ্ডি-বায়সের বয়স

নিয়ে তোরা রসিকতা করিস না। এই ত্রিকালজ্ঞ মানুষটা অক্ষয় বটের মতো অনেক কিছু দেখেছে, আবার অনেক কিছু দেখবেও। এ ক্লাস ঘরের সুমুখে, ক্লাস টেন নয়, ফার্স্ট ক্লাস লেখা থাকত একসময়, বুঝলি ? তখন এ পাড়ায় আমার গতায়াত ছিল, তা জানিস অকালকুষ্মণ্ডের দল ?—তখন কেন যেন অবিশ্বাস করতে ভরসা হত না। অবশ্য বাড়তে বাড়তে ও যখন বলতে শুরু করে, 'কলকাতায় তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত, বুঝলি ?—' তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখ নিচু করে হেসে ফেলত।

আর রক্ষে নেই। ভুতোদা গর্জন করে ওঠে, হাসে কে ?

নেপাল হাসি চেপে বলে, হাসিনি তো ভুন্দা। আচ্ছা বিদ্যাসাগর মশাই যেবার আমাদের স্কুলে প্রাইজ দিতে আসেন, সেবার তুমি যেন কোন্ ক্লাসে পড়তে ?

সব সাবজেক্টে ফেল হলেও ভূতোদা বুঝতে পারে, এটা নেহাৎ চ্যাংড়ামি। কথার প্যাঁচে ওকে ল্যাং মারার প্রচেষ্টা। তাই উদাস হয়ে জবাব দেয়, তোদের সিরিয়াসলি



—"শিবুকে বলব একে একটা চান্স দিতে।"

কিছু বললে তো বিশ্বাস করবি না, শুধুমুধু চ্যাংড়ামি করবি। বিদ্যাসাগর মশাই কি আজকের মানুষ ? তাঁর আমলে আমি তো ছাড়, আমাদের এই কলেজিয়েট স্কুলটাই জন্মায় নি। তবে হ্যাঁ, স্যার আশু মুখুজ্জেকে একবার দেখেছিলাম। এই স্কুলেই। হ্যাঁ, রিয়াল রয়েল বেঙ্গল টাইগার যাকে বলে ! ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফ ! প্রাইজ দিতে এসেছিলেন এই স্কুলে। হেডমাস্টার মশাই আমার নাম ডাকতে আমি তো গুটি গুটি এসে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। দু-হাত তুলে নমস্কার করলাম। এক নজর তিনি দেখে নিলেন আপাদমস্তক, তারপর বললেন, বেশ প্রমিসিং চেহারা তো ছোকরার। ভালো গোলী হবে। শিবুকে বলব একে একটা চান্স দিতে।

নেড়া বলে, শিবু কে ভুন্দা ?

—তোরা চিনিস না। শিবদাস ভাদুড়ী। মোহনবাগান যেবার প্রথম আই. এফ.

শীল্ড পায়, সেবার—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি।

হেসে ভুতোদা বলে, নামই শুনেছিস, খেলা তো আর দেখিসনি।

গজেন চ্যালেঞ্জ করে, তুমি দেখেছ ?

ধ্যানী বুদ্ধের মত ভুতো শুধু হাসলে। জবাব দিলে না।

গজেন আবার বলে, কত সালের কথা বল তো ?

গজেনটা আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট‌বয়। কথায় কথায় সাল-তারিখ এনে হাজির করা ওর বাতিক। কোন কথাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। আসলে বিদ্যা জাহির করা আর কি। ভুতোদা কিন্তু সাল-তারিখ এড়িয়ে বলে, ওরে হতভাগা, সাল-তারিখই যদি মুখস্থ রাখতে পারব, তাহলে কি আর আমার এমন দশা হয় ? তা পারলে তো এ্যাদ্দিনে ইস্কুলে এসে তোদের পড়াতাম ; কিংবা পড়ানো শেষ করে রিটায়ার্ড লাইফে নাতিপুতি নিয়ে ঘরে বসে আরাম করতাম। নেহাৎ এই ফার্স্ট ক্লাসটার উপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে, তাই রয়ে গেছি এখানে—

ক্যাবলা ফোড়ন কাটে, এটা আর এখন ফার্স্ট ক্লাস নয় ভুদ্দা, এটা এখন ক্লাস টেন।

—তবেই দ্যাখ, ক্লাসটা ইস্তক কালে-কালে পালটে গেল, তবু তোদের এই ত্রিকালজ্ঞ ভুশণ্ডি-কাকের কোন পরিবর্তন হল না।

আমি বলি, সে আমলে তুমি বুঝি ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতে।

খ্যাক্‌খ্যাক্ করে শেয়ালী-হাসি হেসে ভুতোদা বলে, নরেনটা কী গাড়োল দ্যাখ ! আরে গিদ্ধড়, ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হলে হাঁটুর বয়সী এই সব ছানাপোনারা কি আমার নাগাল পায় ? কবেই পাশ করে বেরিয়ে যেতাম না ?

আমাদের সবাইকে হাটুর বয়সী বলায় আমরা অবশ্য কিছু মনে করিনি। বস্তুত ভূতনাথ ভট্টাচার্যের ঐ নী-কাপ-পরা হাঁটুজোড়া নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ও দুটো ভূতোদার সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং সাল শতাব্দীর হিসাবে সে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের জন্মলগ্নের অনেক অনেক আগে। কিন্তু তাই বলে এক নিশ্বাসে আমাকে গাড়োল আর গিদ্ধড় বলবে ? আমি বলি তবে যে এখুনি তুমি বললে—স্যার আশুতোষ তোমাকে প্রাইজ দিয়েছিলেন ?

—দিয়েছিলেনই তো ! তবে সেটা ফার্স্ট হবার জন্য নয় রে বোকচন্দ্র, প্রাইজ দিয়েছিলেন ম্যাক্সিমাম্ অ্যাটেন্‌ড্যান্‌স-এর জন্যে।

আবার বোকচন্দ্র ! আমি চটে উঠে বলি—ও ! সে আমলে ভুদ্দা বুঝি আজকালকার মত মাসে বাইশ দিন কামাই করতে না ?

বনবেড়ালের মত খ্যাক্‌খ্যাক্ করে হেসে ওঠে ও। বলে, আরে দ্যাখ্ তোরা, হাঁদারামের বুদ্ধির দৌড়টা দ্যাখ্ ! আরে ছুছুন্দর। হপ্তায় এক, মাসে চারদিনের

বেশী কোন ভদ্দরলোক ক্লাসে আসে ?

—তবে যে তুমি বললে বেস্ট-অ্যাটেন্‌ড্যান্‌স্‌ প্রাইজ পেয়েছ ?

—নাঃ ! বাঁকিয়ে মারলে দেখছি ! গোড়া থেকে না বললে এ অনড্বানটার মস্তিষ্কে কোন বার্তা গৃহ-প্রবেশ করবে না !

আমরা বুঝতে পারি, এটা হচ্ছে ভূতোদার ভূমিকা। ওর ভাষায় 'অবতরণিকা'। মেজাজ খোশ হলেই ভূতোদা গালভারি সংস্কৃত-ভাষা ব্যবহার করে। গল্প শুনবার জন্য আমরা ওকে প্রায়ই উসকে দিতাম। মনে মনে ভূতুড়ে গল্প বলবার জন্য যতই ইচ্ছা থাক, মুখে সে ভারি বিরক্তি প্রকাশ করত। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটি ভূমিকা, মানে 'অবতরণিকা', সেরে আষাঢ়ে গল্পের সরোবরে অবগাহন করত।

ভূতোদা বলতে থাকে : অনুলেকে চিনিস্‌ ! চিনিস না ? প্রফেসর অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, রিপন কলেজে পড়ায়। রিপন তো নয়, এখন আবার কি সব নতুন নতুন নাম হয়েছে কলেজগুলোর। তা সে যাক্‌গে-মরুক্‌গে —ঐ অনুলে হচ্ছে আমার ভাইপো। খুড়ো-ভাইপো তখন একই ক্লাসে পড়ি ! অনুলেটা ছিল, যাকে বলে এ্যাক্কেরে গুডবয়। ঐ গজাটার মত বইয়ের পোকা। ক্লাসে ফার্স্ট হত। এনট্রান্সে স্কলারশীপ বাঁধা !

এনট্রান্স মানে ? কতদিন আগেকার কথা বলছ ?—বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে বসে গজেন।

ওর দিকে একজোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি মেলে ভূতোদা বলে, তোরা আজ যাকে ম্যাট্রিক বলিস, তোদের বাপ-জ্যেঠারা তাকেই 'এনট্রান্স' বলতেন, বুঝেছিস ? আমরাও সে-আমলে তাই বলতাম। আই. এ. কে বলতাম 'ফার্স্ট-আর্টস', সিনেমাকে বলতাম 'বাইস্‌কোপ', সিগারেটকে বলতাম 'বার্ডস-আই', বুঝলি ? তা যাগ্‌গে-মরুগ্‌গে ! গল্পটা শোন। সামনে প্রাইজ। অনুলে ভাইপো হয়ে প্রাইজ পাবে, আর আমি খুড়ো হয়ে পাব না ? এটা কি রকম কথা ? বললাম সব কথা খুলে হেডমাস্টার মশাইকে। হেডমাস্টার মশাই ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে আমলে বয়সের সত্যিই একটা মর্যাদা ছিল। সব কথা শুনে হেডমাস্টার মশাই বললেন—'কথাটা তো ঠিক বলেছ, বাবা ভূতনাথ, কিন্তু এ তো স্পোর্টস্‌ নয়, এখানে তোমাকে কী প্রাইজ দেব বল ?' তা আমি বললাম—'কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনি একটু ইচ্ছে করলেই আমাকে 'ম্যাক্সিমাম অ্যাটেন্‌ড্যান্‌স্‌' প্রাইজটা পাইয়ে দিতে পারেন। আপনি গত পাঁচ-বছরের হাজিরার খাতা তলব করুন। দেখুন, ভূতনাথ ভট্টাচার্য ফার্স্ট-ক্লাসে কতবার 'প্রেজেন্ট-স্যার' হয়েছে।' আনা হল খাতা। কিছু পুরানো খাতা অবশ্য উইপোকায় খেয়ে ফেলেছিল, তা যাগ্‌গে-মরুগ্‌গে, তবু দেখা গেল, মাসে বাইশ দিন কামাই করেও গত পাঁচ বছরে ভূতনাথ ভট্টাচার্যের নাম তিনশ'র উপর 'পি' ! কেরানিবাবু টোটাল দিয়ে—'থ্রি

হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ফার্টি টু।' আমি মাথা চুলকে একটু লাজুক-লাজুক মুখে বলি, 'বলুন থ্রি হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ফার্টি টু নট-আউট! আমি এখনও ঐ ফার্স্ট ক্লাসেই আছি, ঈশ্বর জানেন, আরও কত বছর থাকব! হক্ কথা! প্রাইজ না দিয়ে যাবে কোথা? আমার স্কোর তখন স্যার ব্রাডম্যানের হাইয়েস্ট টেস্ট স্কোরকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

গজেন হতভাগা আবার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, ইণ্ডিভিজুয়াল ইনিংসে হাইয়েস্ট টেস্ট-স্কোরার কিন্তু ব্র্যাডমান নন—

শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সকলেই কেষ্ট ঠাকুর নয়, অন্তত আমাদের ভুতোদা নয়। একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ভুতোদা। বলে, তুই চুপ করবি জিবেগজা? যে জিনিস বুঝিস না, তা নিয়ে তর্ক করিস না। এ তোর অঙ্ক ভূগোল-ইতিহাস নয়, এ হল স্পোর্টস-সাম্রাজ্য! এখানে আমিই অথরিটি!

গজেন সবচেয়ে ক্ষেপে যায় তাকে জিবেগজা বললে। তখন ওর আর জ্ঞান থাকে না। ক্ষেপে ওঠে সে, নিজেকে তুমি সব বিষয়েই অথরিটি ভাবতে পার, কিন্তু টেস্টে হাইয়েস্ট স্কোরার হচ্ছেন গারফিল্ড সোবার্স। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের।

—আরে চুপ যা তুই! আমি যে আমলের কথা বলছি তখন সোবার্স টেস্ট-খেলা শুরুই করে নি। সোবার্স তো কালকের ছেলে, লেন হাটনও তখন ভাঙে নি স্যার ব্রাডম্যানের রেকর্ড!

আমরা ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বলি, ওসব নাবালক চ্যাংড়ার কথায় কেন কান দাও ভুতদা? তারপর কি হল বল?

কিন্তু মুড একবার নষ্ট হয়ে গেলে ভুতোদা আর মুখ খোলে না। পকেট থেকে ছোলাভাজার ঠোঙাটা বার করে চিবুতে চিবুতে রওনা দেয় মাঠের দিকে। অর্থাৎ আমাদের গল্পটাও ঐ সঙ্গে মাঠে মারা গেল আর কি!

আমরা সবাই খেপে উঠি গজাটার উপর। ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে বলে সকলের মাথা কিনে রেখেছে নাকি? কি দরকার ছিল এমন জমাটি আসরটা ভেঙে দেবার? কিন্তু গজেনও অত সহজে হার মানবার ছেলে নয়। সাল-তারিখ দিয়ে সে তার যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করতে যায়। হাতপা নেড়ে বোঝাতে চায় সে কিছুই ভুল বলে নি। গজা চেঁচায়, বারে! তোমরা আমার কথাটাই শুনছ না। স্যার ব্র্যাডম্যান ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, মারা যান ১৯২৫শে, আর স্যার আশুতোষ টেস্ট রেকর্ড করেন ওভালে ১৯৩০ সালে। এ থেকে কি প্রমাণ হয়?

ন্যাপলা ওর চাঁদিতে মুস্তাক আলির স্টাইলে একটা নিখুঁত লেট-কাট হাঁকিয়ে বলে: প্রমাণ হয় স্যার জিবেগজা ইতিহাসে ডক্টরেট পান খৃষ্টপূর্ব পঞ্চান্ন সালে।

সত্যি গজাটা কী গাড়োল ! কেমন করে অত অত নম্বর ও হতভাগা পায় পরীক্ষার খাতায় ? গবেটটা কি ভাবে, ভুতোদা এ গল্পগুলো আমাদের বিশ্বাস করাবার জন্য বলে ? ও বলে আনন্দ পায়, আর আমরা পাই শুনে। এর মধ্যে সাল-শতাব্দী কেন রে বাবা ?

আসলে ওসব কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, ভুতোদার বয়সটা কিছু বেশী। সে-আমলে অর্থাৎ আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন ক্লাস টেন্‌টাই ছিল স্কুলের শেষ ধাপ। তা সেই শেষ ক্লাসের পক্ষেও ওর বয়সটা ছিল কিছু বেমানান ধরনের। আর হ্যাঁ, এ ক্লাসের ঐ শেষ বেঞ্চটায় সে দীর্ঘদিন ধরে বসছে। অন্তত আমি নিজে ক্লাস-ফাইভে যখন এ স্কুলে এসে ভর্তি হই—তখন থেকে ওকে ঐখানেই বসতে দেখেছি।

ভুতোদাকে প্রথম দিন থেকেই আমি চিনতাম। না চিনে উপায় নেই। সে ছিল আমাদের স্কুলের চাম্পিয়ান প্লেয়ার। এ তল্লাটের সবচেয়ে নামকরা গোল-কীপার। সত্যিই প্রাণ দিয়ে খেলত সে। একবার আমাদের ক্লাসে বি. টি. ট্রেনিং-এর একজন কম-বয়সী মাস্টার মশাই পড়াতে আসেন। প্রায় ভুতোদারই সমবয়সী। ভুতোদার কি একটা দুষ্কর্মে তিনি চটে উঠে বলেছিলেন, হোয়াট্‌স্‌ য়োর নেম ? য়ু শ্যাল হ্যাভ টু পে হেভি পেনাল্টিস্‌ ফর য়োর ইন্সোলেন্স্‌।

ভুতোদা দাঁড়িয়ে উঠে একগাল হেসে বলেছিল, মাই নেম ইজ্‌ পেনাল্টি-ঈটার স্যার।

মিথ্যা কথা বলেনি ভুতোদা। সত্যিই ঐ খেতাব আমরা ওকে দিয়েছিলাম। ভুতোদা যে টীমের গোলকী সে টীম আজ পর্যন্ত পেনাল্টিতে গোল খায় নি। আন্‌ব্রোকন রেকর্ড ওর। গ্রাস-কাটিংই হোক অথবা রেনবো সটই হোক—কপাৎ করে ধরে ফেলত ভুতোদা প্রতিটি পেনাল্টিকীক্‌ ! অনেকে ফল্‌স্‌ স্টেপিং নিয়েও দেখেছে—কিন্তু ভুতোদাকে কাৎ করতে পারে নি। মানে কাৎ ভুতোদা হয়েছে, কিন্তু বে-কাৎ হয় নি ! যে কাতে বল সেই কাতেই কেতিয়েছে ভুদ্দা, বেকাতে ক্যাতায়নি ! শেষ দিকে এমন অবস্থা হয়েছে যে ভুতোদাকে গোলে দাঁড়াতে দেখলে বাঘা বাঘা সেন্টার ফরোয়ার্ডও নার্ভাস হয়ে আউটে বল মারে। ভুতোদা হেসে বলত—আমাকে যে পেনাল্টিতে গোল দেবে সে মাতৃগর্ভে। নেটের পিছনে দাঁড়ালেও পারবে না। এই কন্দর্পকান্তি চেহারাখানা দেখেই ওরা নার্ভাস হয়ে আউটে বল মারে।

আর শুধু কি ফুটবল ? সব খেলাতেই সে অদ্বিতীয়। দৌড়ে মিল্‌খা, হকিতে ধ্যান, ক্রিকেটে কানিকাইয়া। ভলিবলে ঐ ন্যাড়া তালগাছ প্রমাণ একানড়েটি যখন নেটে দাঁড়ায় তখন বিপক্ষের নেটম্যান পারে তো মাথায় একটা হেলমেট পরে। দু-একবার লাফ দেবার পরেই সে বেচারি আর নেট দেখতে পায় না, বল দেখতে পায় না—সে শুধু দেখে যোজন-বিস্তৃত ফুলে-ভরা একটা সর্ষে-ক্ষেত ! অদ্ভুত চৌখস

ভুতোদার নেটের খেলা। থার্ডলাইন থেকে আলতো করে বলটাকে কোনক্রমে নেটে ফেলে দাও। ব্যস্ আর দেখতে হবে না। ভুতোদা একটা জ্বলন্ত হাউই-এর মতো উঠবে আর নামবে—নেট ছোঁবে না, ক্রশ করবে না, প্রচণ্ড স্ম্যাসে বেড়ে যাবে একটা পয়েণ্ট। নির্ঘাত! প্রতি তৃতীয় স্ম্যাসের সঙ্গে রেফারীর চোখ এড়িয়ে ওপক্ষের নেটম্যানের ব্রহ্মতালুতে চালায় একখানা মুস্তাকি লেট-কাট্! এটা নাকি ভুতোদার নিজস্ব অবদান।

এ হেন ভুতদাকে লীডার করব না তো কি ঐ মেনীমুখো পিলে-ডিগ্-ডিগ্ বই-পোকা জিবেগজাকে করব?

তোমরাই বল?

একমাত্র লেখাপড়া ছাড়া আর সব বিষয়েই ছেলেটার অদ্ভুত প্রতিভা। স্পোর্টসের দিনে এক গাদা কাপমেডেল নিয়ে বাড়ি যায়। সারা বছর খেলার মাঠে সে হাজির। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত—একদিনও কামাই নেই। ছোট ছেলেদের অতি যত্ন নিয়ে শেখাত খেলা। তাছাড়া খুব ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারত সে। প্রতি বছর আমাদের প্রাইজের দিন ভুতোদা ম্যাজিকের খেলা দেখাত। মফঃস্বল শহরের এই সরকারী স্কুলের প্রাইজ-উৎসবে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই আসতেন। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, কলেজের প্রিন্সিপাল। সকলের চোখের সামনে দিয়ে সে রুমালকে বানাতো পায়রা, ব্লটিং কাগজকে দশটাকার নোট। যেটাতে মন দেবে তার চরম করে ছাড়বে। এমনি ছিল ওর অধ্যবসায়। ওর কাকা ছিলেন স্থানীয় ওভারসিয়ার-স্কুলের ড্রইং-টিচার। তিনি বলতেন—ওর মাথা নাকি খুব সাফা। পড়লে সে নাকি এঞ্জিনীয়ারিংও পাশ করত। শোনা যায় হেডমাস্টার মশাই নাকি ওকে ডেকে একবার বলেছিলেন, বাবা ভুতনাথ, মন দিয়ে পড়লে তুমি পাশ করতে পার না, এটা তো আমার বিশ্বাস হয় না বাবা।

ঘাড় চুলকে লাজুক লাজুক মুখে ভুতোদা উত্তরে বলেছিল, ঐ জন্যই তো আমি মন দিয়ে পড়ি না স্যার।

দুরন্ত বিস্ময়ে হেডমাস্টার মশাই বলেছিলেন, কেন বাবা! তাহলে কি হবে?

—পড়লেই আমি পাশ করে যাব। আর আমাদের স্কুল টীমটা একেবারে কানা হয়ে যাবে। স্যার গুরুদাস চ্যালেঞ্জ শীল্ডটা হিপ্-হিপ্-হুররে করে নিয়ে যাবে ঐ সি. এম. স্কুল।

গম্ভীর প্রকৃতি হেডমাস্টার মশাই নাকি হেসে ফেলেছিলেন ওর কথা শুনে।

কিন্তু আমরা হাসিনি। হাসির কথা নয় বলেই হাসিনি। স্যার গুরুদাস চ্যালেঞ্জ শীল্ড আমরা পর পর চার বছর ঘরে আনছি। প্রতিবারই ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী স্কুল, বা সংক্ষেপে সি. এম. এস. হয় রানার্স-আপ। কতবার কত ভাবে

যে সে স্কুলের সম্মান রক্ষা করেছে তা আর কহতব্য নয়। এককালে স্যার আশুতোষ বলতে নাকি বোঝাত বিশ্ববিদ্যালয়কে আর বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝাত স্যার আশুতোষকে। আশ-পাশের পাঁচটা স্কুল টীমও তেমনি কলেজিয়েট স্কুল বলতে বোঝে ভূতনাথ ভট্টাচার্যকে আর ভূতনাথ বলতে বোঝে আমাদের স্কুলের পেনাল্টি-ঈটার গোলী, উইকেটকীপার-কাম সেঞ্চুরি ব্যাট এবং নির্ভুল স্ম্যাসার নেটম্যানকে।

এ বছরও শীল্ড ফাইনালে যথারীতি ওদিক থেকে উঠেছে সি. এম. স্কুল আর এদিক থেকে উঠেছেন আমাদের আদি-অকৃত্রিম ভূতোদা আরও দশটা ছানাপোনা নিয়ে! ফাইনালের খেলাটা যাতে জমজমাট হয় তাই কর্তৃপক্ষ আমাদের এই দুটি সেরা স্কুলের টীমকে দু-দিকে গ্রুপে রেখে নকআউট প্রোগাম ছকতেন। এবার ফাইনাল খেলা প্রথম দিন গোললেস্ ড্র হয়েছে। সেদিন আমি মাঠে যাইনি। এই অপরাধে ভূতোদা প্রথমেই তো আমাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ধমকালো। তাই দ্বিতীয় দিন ঠিক সময়ের আগেই গিয়ে মাঠে হাজিরা দিলাম।

মাঠের একপাশে সামিয়ানা খাটানো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন সস্ত্রীক! স্যার গুরুদাস চ্যালেঞ্জ শীল্ড আর রুপোর কাপগুলো চক্‌চক্ করছে পড়ন্ত আলোয়। আগের দিন গোলহীন ড্র হয়েছে। বাড়তি সময় খেলিয়েও কোন হিল্লে হয়নি। আজ তাই উৎসাহ উদ্দীপনা আরও বেশী!

এ বছর অবশ্য সি. এম. স্কুলের জিতবার সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের গত বছরের ফুল টীমের চার চারটে ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে গেছে। অথচ ওদের গত বছরের ফুল-টীমটাই এসেছে দেখছি। একটা বছরে ছেলেগুলো মাথায় বেড়েছে, গায়ে-গতরেও মজবুত হয়েছে আরও। তাছাড়া বোঝাপড়াটা আরও বেশী হয়েছে—হাফ-লাইনের সঙ্গে উইংসের, উইংসের সঙ্গে ইনের, স্কোরারের। ছোট-ছোট পাসে খেলতে শিখেছে ওরা, বেশীদিন একটীমে খেললে যা হয়। শুনলাম আগের দিন ড্র হয়েছে বটে, কিন্তু সারাক্ষণই ওরা চেপে রেখেছিল। ন্যাপলা খেলা দেখেছিল, বললে—হাফমাঠের ওপাশে বল গেছে কিনা সন্দেহ। ক্রমাগত আমাদের গোলে বল কীক্ করেছে ওরা। ভূতোদা অন্তত আধ ডজন একেবারে অব্যর্থ গোল বাঁচিয়েছে; তার ভিতর একটা পেনাল্টি! ন্যাপলার মতে 'সিক্স-টু-নিল' রেজাল্ট হওয়া উচিত ছিল।

আগের দিন জয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে গেছে ওরা। আজ তাই পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে এসেছে। খেলা শুরু হবার আগে ভূতোদা আমার কাছে এসে কানে কানে বললে,—কাণ্ডটা দেখেছিস নরেন, ওরা লরী ভাড়া করে এনেছে শীল্ড নিয়ে যাবে বলে! দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওদের সারা স্কুলটাই এসেছে মাঠে। মাস্টার মশাইরা সব্বাই এসেছেন, মায় বেয়ারা-দপ্তরী-দরোয়ান ইস্তক! আর আমাদের

স্কুলের ? গুণে দ্যাখ—বিশটা বাছুরও আসে নি।

রাগ হবারই কথা। নেপাল, নেড়া, ক্যাবলা, গজেন, গোবিন্দ আর আমি। ক্লাশ টেনের বেয়াল্লিশটা ছেলের মধ্যে কুল্লে এই পঞ্চপাণ্ডব হাজির। অক্ষৌহিণীর বাদ বাকি বেপাত্তা। অন্যান্য ক্লাসেরও ঐ একই হাল! গোটা স্কুলের যে কটি ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি তা দু-হাতের দশটা আঙুলে গোনা যায়। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলি, দোষ আর কাকে দেব বল ভূদ্দা ? আগের দিনের খেলার নমুনা দেখেই সবাই বুঝে নিয়েছে পাক্কা পাঁচ-সাত গোলে হারব আমরা আজ। জেনেশুনে কে আর তা দেখতে আসে বল ?

ভূতোদা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে—উদ্‌বেড়ালের মত কথা বলিস না নরেন! খেলায় হারজিত থাকবেই। তাই বলে মাঠে আসবে না ? এই তো আমি। আমি তো জানিই ফেল্লু মারব, তবু বছর বছর পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি না ? কিছুই তো করতে হবে না বাপু। সেরেফ আমাদের ফরোয়ার্ড লাইন যখন বল নিয়ে ছুটবে তখন একটু প্রাণ খুলে চিল্লাবি, একটু এন্‌কারেজ করবি। তাও পারিস না ? দ্যাখ নরেন, চেয়ে দ্যাখ। একমাঠ অচেনা মুখ। মনে হচ্ছে, যেন এ গোয়াড়িগঞ্জ নয়, যেন টিটিকাকাতে অলিম্পিক খেলতে এসেছি।

গজেন অমনি টুক্ করে বলে বসে, টিটিকাকাতে কিন্তু কোনদিন অলিম্পিক হয়নি ভূতোদা।

ভূতোদার পাতা-না-পড়া চোখ দুটো যেন রাতের ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল। নেড়া তাড়াতাড়ি কোন রকমে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নেবার চেষ্টা করে। বলে, আহাহা, তোরা কথা বুঝিস্ না কেন ? ভূতোদা তো বলে নি যে টিটিকাকাতেই কখনো অলিম্পিক হয়েছে। ও একটা কথার কথা। এতদিন হয় নি বলে ভবিষ্যতেও যে কোনদিন হবে না তার তো কোন স্থিরতা নেই।

ভূতোদার জ্বলন্ত চোখ দুটো শান্ত হয়ে আসে। আমাদেরও ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে। গজাটার যেমন বুদ্ধি! এই ক্রিটিক্যাল মোমেণ্ট, খেলা শুরু হবার ঠিক আগেই পণ্ডিতী ফলাতে গিয়ে ভূতোদার মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছিল আর কি। টিটিকাকা নামটা কদিন আগে ভূগোল মাস্টার মশাইয়ের কাছে শুনছিলাম মনে হচ্ছে। বেশ জুতসই নামটা—

কিন্তু আমাদের বরাত খারাপ। মারে কেষ্ট রাখে কে ? হতভাগা এর পরেও বলে বসে, না—ভবিষ্যতেও কোন দিন টিটিকাকাতে অলিম্পিক হবে না—

নেড়া, গোবিন্দ আর আমি তিনজনে একসঙ্গে খেঁকিয়ে উঠি, কেন হবে না ? আলবৎ হতে পারে। রোমে হতে পারে, হেলসিঙ্কিতে হতে পারে, বার্লিনে হতে পারে, টোকিওতে হতে পারে, আর শুধু টিটিকাকাতেই পারে না ?

—না পারে না! কারণ টিটিকাকা কোন দেশ বা শহর নয়। ওটা দক্ষিণ-

আমেরিকায় অবস্থিত একটা হ্রদের নাম। চিল্কা, বৈকাল অথবা মানস-সরোবরে কি অলিম্পিক হতে পারে।

যেন শুনতেই পাইনি আমরা কেউ। তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিতে বলি, যাগ্‌গে মরুগ্‌গে, ভুন্দা তুমি কিছু ভেব না। মাথার উপর ভগবান আছেন—

নেড়া আর এক কাঠি বাড়িয়ে বলে, এবং গোল-পোস্টের সামনে ভুতোদা আছেন।

ভুতোদা কোন জবাব দেয় না। হাতের গ্লাভাস্‌টা খুলতে খুলতে মাঠে নেমে পড়ে।

আমি বলি, গ্লাভস্‌টা আবার খুলছ কেন এখন? এখনি তো খেলা শুরু হবে।

ভুতোদা হেসে বলে, নরেনটা একটা আস্ত অনড্বান! আমি তো ক্যাপ্টেন? দস্তানা পরে শেকহ্যাণ্ড করা এটিকেট-বিরুদ্ধ, তাও জানিস না বলিবর্দ।

মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। নেড়া আর গোবিন্দও লক্ষ্য করেছে গালাগাল দুটো। নেড়া আমার কানে কানে বলে, একে অনড্বান তাই বলিবর্দ। আজ আগুন ছুটিয়ে খেলবে ভুন্দা।

আমি তা জানি। মুড ভাল না থাকলে ভুতোদা কখনও সংস্কৃতে গাল দেয় না। যত মুষড়ে পড়ে ততই ওর ভাষাটা হয়ে পড়ে চাষাড়ে—গাড়োল গিন্ধড়! মেজাজ একটু খুশ হলেই ঐ সব গালাগালের সঙ্গে সংস্কৃত-প্রত্যয় যুক্ত হতে থাকে —গাধেশ্বর, উষ্ট্রচন্দ্র, জিরাফানন্দ। আর মন-মেজাজ যখন বিলকুল শরিফ, তখন নির্ভেজাল সংস্কৃত গাল দেবে সে—সেগুলো ওর খুব মিষ্টি আদরের গাল—বলিবর্দ, ছুছুন্দর, দণ্ডবায়স, পেচকানন, মার্জারমুখী; অর্থাৎ গালাগালগুলোই হচ্ছে ভুতোদার মেজাজের ব্যারোমিটার। তাই হঠাৎ নিখাদ জোড়া সংস্কৃত গাল শুনে আন্দাজ করি—টিটকাকা যে হ্রদ এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা প্রফেসর অনিলচন্দ্রের কাকার কর্ণগোচর হয় নি।

খেলা শুরু হল। প্রথম থেকেই সি. এম. স্কুল চেপে থাকে আমাদের গোল এলাকা। মুহুর্মুহু আমাদের গোলে আসতে থাকে একের পর এক তীব্র শট। কিন্তু চীনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে একবারও বলটা গোলে ঢুকতে পারে না। গোল-পোস্ট দুটোর মাঝের ফাঁকটা যেন নিরেট পাথরের দেওয়ালে গাঁথা। প্রতিটি শটই প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। হাফটাইমের আগে তিন তিনটে কর্ণার-কিক পেল ওরা, কিন্তু গোল হল না। রাইট আউটের একটা কর্ণার কিক থেকে অনিবার্য একটা গোল হতে হতে হল না।

হাফটাইমের দীর্ঘ টানা হুইস্‌ল্ বাজল। আমরা লেবু-বরফ নিয়ে ছুটে গেলাম মাঠে। জড়িয়ে ধরি ভুতোদাকে। নেড়া বলে, দেখেছ ভুতোদা, ওরা ব্যাণ্ড-পার্টি

ভাড়া করে এনেছে। লরীর উপর মাইক ফিট করছে, ঐ দেখ। শীল্ড নিয়ে প্রশেসন করবার সব রকম ব্যবস্থা ওরা করছে নিশ্চিন্ত মনে, যেন খেলা জেতা হয়েই আছে। ওরা একেবারে স্যাঙ্গুইন।

খুন চেপে যাওয়া এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ তুলে ভুতোদা এক নজর দেখে নিল ওদের আয়োজনটা। ব্যাণ্ড-পার্টি সত্যিই অপেক্ষা করছে। পাতাবাহার পাতা জড়িয়ে লরীটাকে সাজাচ্ছে ওরা। পর পর চার বছর রানার্স-আপ হয়ে আজ তারা বিজয়লক্ষ্মীর নিশ্চিন্ত আশীর্বাদের স্বপ্ন দেখছে। ভুতোদা বলে, কুছ পরোয়া নেহি, ওরা স্যাঙ্গুইন তো আমরাও স্যাঙ্গুইনারি :

গোবিন্দ বোধ করি ধরতে পারে না ব্যাপারটা, বলে, স্যাঙ্গুইনারি আবার কি ?

ভুতোদা বলে, ঐ পেঙ্গুইনটাকে জিজ্ঞাসা কর। গ্রামারের এসব কূটকচালি ওর ঠোঁটস্থ।

গজেনকে দেখিয়ে দেয় সে। গজেনকে ভুতোদা মাঝে মাঝে আদর করে পেঙ্গুইন বলে ডাকে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে বেচারির পিলেটা একটু বড় বলেই বোধকরি এই নামকরণ। কিন্তু সে যাক্। ভুতোদা কি বলতে চায় ? শেষ পর্যন্ত সত্যিই একটা খুনোখুনি রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে নাকি ?

হাফ-টাইম শেষ হতেই আমরা আবার ভুতোদার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার চাপ পড়তে শুরু করল আমাদের গোল এলাকায়। মাঝমাঠের ওদিকেও যে আধখানা ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে সে খবরটা যেন বলটাকে কেউ বলে দেয় নি। সি. এম. এসের ছেলেরা এবার একটা নূতন কায়দা শুরু করল। ওরা বুঝতে পেরেছে যে আমাদের গোলকীপারকে চটাতে না পারলে চলবে না। রেগে মেগে যদি ভুল পজিসন না নেয় ভুতোদা—তাহলে কিছুতেই গোলে বল ঢুকবে না। খেলার প্রথম থেকেই তো ক্রমাগত হো-হো করছিল সবাই মিলে, এখন একেবারে নতুন কায়দায় শ্লোগান দিতে আরম্ভ করে। আমরা মাত্র জনাবিশেক ক্ষীণজীবী প্রাণী। তাই ওদের মাঠজোড়া স্টিমারের ভোঁ-র কাছে আমাদের এক পয়সার তালপাতার ভেঁপু যেন বাজলই না। আমাদের গলার আওয়াজ ডুবে গেল নিঃশেষে। সারা মাঠখানাকে ওরা মাতিয়ে তুলল এই নতুন শ্লোগানে। মাঠের এপ্রান্ত থেকে জনা পঞ্চাশ ছেলে একসঙ্গে সুর করে বলে : বাবা ভু—তোর ব-য়-স ক-ত ?

ও গোলপোস্টের পিছন থেকে শত খানেক ছেলে জবাব দেয় : বায়ো—কি ত্যায়ো।

এ প্রান্ত বলে : বা-বা কি বলে ?

ও প্রান্ত বলে : বা-বা বলে আ-ও-ও কম !

এ প্রান্ত বলে : আর মা কি বলে ?

ও প্রান্ত বলে : মা বলে আও-ও-ও-ও কম ! !

আচ্ছা তোমরাই বল, এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কেউ মাথা ঠাণ্ডা করে গোল ঠেকাতে পারে ? বিশেষত যদি তার বয়স আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে কিছু সত্যিই বেশী হয় ? ওদের প্রশ্ন আর উত্তর চালাচালিতে মাঠটা গমগম্ করছে; বলটা তখন আমাদের গোলপোস্টের এ কিনারা থেকে ও কিনারে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। জালে আটকানো বড় রুই মাছ যেমন ঘাই দিয়ে ওঠে, বলটাও তেমনি ওদের ফরোয়ার্ড কজনের মাথায় মাথায়, পায়ে পায়ে ঘাই মারছে অনবরত, গোলের ভিতর না ঢুকে পড়া পর্যন্ত যেন তার নিস্তার নেই। কিন্তু ভুতোদার জাল ছেঁড়া অত সহজ নয়। ক্রমাগত কিক করে, হেড করে, পাঞ্চ করে ক্লিয়ার করে যাচ্ছে নির্ঘাত গোল। একবারও ভুল হচ্ছে না পজিসান নিতে। চটেনি ভুতোদা। ওরা তাকে চটাবার জন্য 'মা কি বলে' প্রশ্নটার জবাবে 'ও'-টাকে আরও লম্বা করে সুর টেনে টেনে বলছে : আ ও-ও-ও-ও কম ! তা বলুক ! হিমালয় পাহাড়কে কি বিদ্রূপে টলানো যায়।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটল। খেলা শেষ হবার আর মিনিট তিনেক বাকি। ভুতোদার ক্লিয়ার করা একটা শট একেবারে আকাশমার্গে গিয়ে পড়ল ওদের হাফ-লাইনের কাছে। ফাঁকা মাঠ। ওদের স্টপার পর্যন্ত ছেড়ে এগিয়ে এসেছে গোল দেবার উত্তেজনায়, নিজেদের গোল সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে। আমাদের রাইট ইন চিরঞ্জীবটা দৌড়োয় ভাল। চমৎকারভাবে অফসাইড বাঁচিয়ে বলটা পায়ে রেখে এগিয়ে গেল। ড্রিবল্ করে একজন—দুজনকে কাটিয়ে নেয়, ব্যস্ আর কেউ নেই সামনে। শুধু ওদের গোলকী আর আমাদের চিরে। কোনক্রমে। কোনক্রমে একবার গোলে বলটা মারলেই আমাদের চিরঞ্জীব সত্যিকারের চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। আমরা চীৎকার করে উঠি—এবার গোলে মার চিরে।

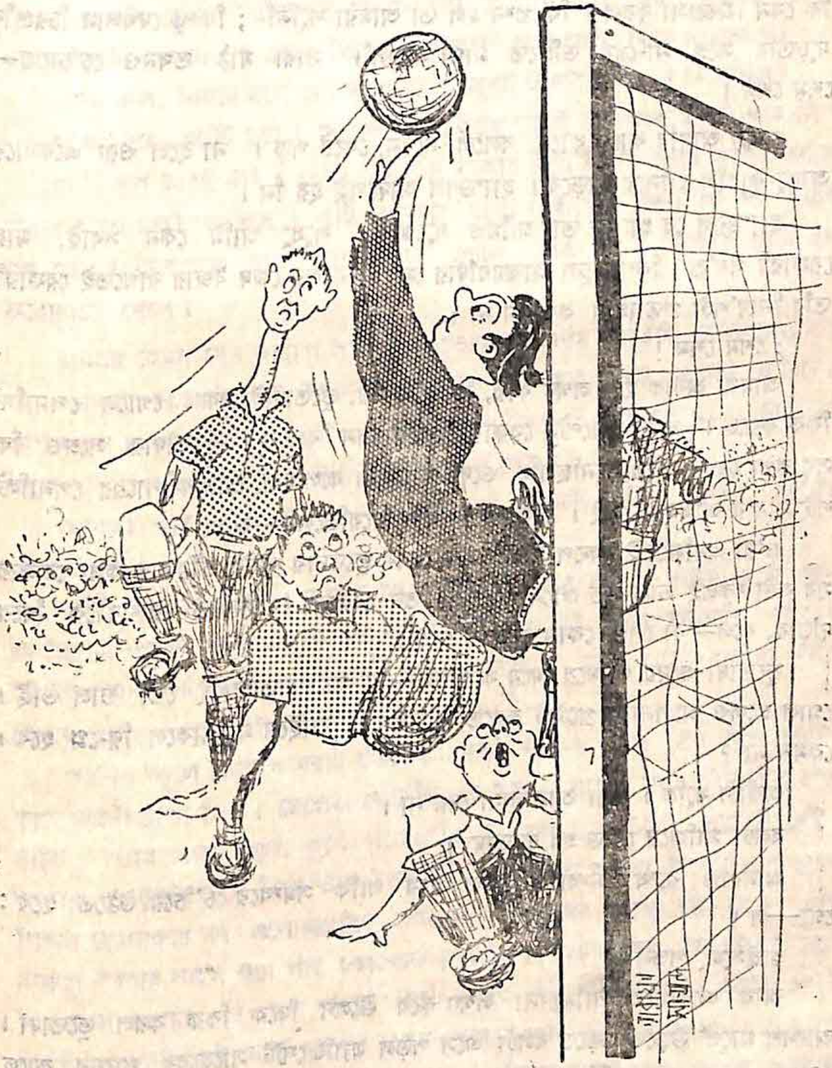
কিন্তু না, চিরঞ্জীব এ চান্স কোনক্রমেই মিস্ হতে দেবে না। উল্কার গতিতে সে বল নিয়ে এগিয়েই চলে। কাছে—আরও কাছে—আরও কাছে। ওদের গোল-কীপার নার্ভাস্ ! চিরেটা তখন গোলপোস্ট থেকে মাত্র দশ গজ দূরে। আপ্রাণ দৌড়ে এতক্ষণে ওদের লেফ্‌ট্ ব্যাক এসে নাগাল পেল চিরেটার। দিলে মোক্ষম একটা সাইড-পুশ্। কী-যেন হল, ভাল দেখা গেল না, রেফারী হুইস্‌ল দিল।

অফসাইড ? ফাউল ? না, হ্যাণ্ডবল ? কার ? কিছুই কেউ বুঝতে পারি না। আসলে রেফারী নিজেও পড়ে গিয়েছিল বহু পিছনে। সে যখন এসে পৌঁছালো ঘটনাস্থলে তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। ওদেরই হ্যাণ্ডবল হয়েছে। লেফট্ ব্যাকের। পেনাল্টি এলাকায়। পেনাল্টি !

আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠি। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্য রকম। মাঠে তীব্র উত্তেজনা। ওদের খেলোয়াড়ের হাতে নাকি বলটা আদপেই লাগে নি। লাইন্‌স্‌ম্যান সেটা দেখেছিল। অযাচিত ছুটে এল সে—কী যেন বলল রেফারীকে। ওদের সারা স্কুলের ছেলেরা তখন রেফারীকে ঠেঙাবার আয়োজন করছে। রেফারী

কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। একবার সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছেন, আর প্রত্যাহার করবেন না।

বলটা সাজানো হল পেনাল্টি কিকের চিহ্নিত স্থানে।



ক্রমাগত কিক করে, হেড করে, পাঞ্চ করে ক্লিয়ার করে যাচ্ছে নির্ঘাত গোল।

সারা মাঠে তখন চীৎকার—শেম, শেম, পার্সিয়ালিটি! ঘুষ খেয়েছে! রেফারীকে দেখে নেব।

চিরঞ্জীব শটটা মারবার জন্য প্রস্তুত হয়। হুইস্‌ল্‌ পড়লেই সে পেনাল্টিকিক্‌ করবে। কিন্তু আমোদের ক্যাপ্টেন ভূতোদা তার সাড়ে চার ফুট লম্বা উটপাখির মত পা ফেলে উল্কার বেগে এসে পেঁছালো সেখানে। চিরঞ্জীবকে ডেকে ভূতোদা কি যেন জিজ্ঞাসা করল। কি প্রশ্ন হল তা আমরা শুনিনি; কিন্তু দেখলাম চিরঞ্জীব দৃঢ়তার সঙ্গে না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। সারা মাঠ তখনও চেঁচাচ্ছে— শেম শেম!

নেড়া আমার কানে কানে বললে, নরেন, কেটে পড়। না হলে ওরা একেবারে আলু-কাবলি বানিয়ে ছাড়বে। হ্যাণ্ডবল আদপেই হয় নি।

হ্যাণ্ডবল যে হয় নি তা আমিও বুঝেছি। শুধু আমি কেন সবাই, মায় রেফারী পর্যন্ত। কিন্তু ভুল আত্মমর্যাদার মোহে নিজের জেদ বজায় রাখতেই রেফারী তাঁর নির্দেশটা প্রত্যাহার করলেন না।

: শেম শেম!

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, চিরঞ্জীব নয়, ভূতোদাই স্বয়ং গোলে পেনাল্টি কিক করছে। ওদের ক্যাপ্টেন রেফারীকে কি যেন বললে। ভূতোদার সঙ্গেও কি সব কথা হল। পরে শুনেছিলাম, ওদের ক্যাপ্টেন বলেছিল, গোলকীপারের পেনাল্টি শট্‌ মারার অধিকার নেই। রেফারী নির্দেশ দিয়েছিলেন—আছে।

ও'রা এমনিতেই ক্ষেপে ছিল, তার উপর ভূতেদার শটের তীব্রতার কথা জেলার সব কটা স্কুলই ভাল মত জানে। ওদের তিন চারজন খেলোয়াড় রেফারীকে ঘিরে দাঁড়ায়, বলে—না নেই, কোন আইনে নেই।

ভূতোদা ওদের থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—না থাকে, তাহলেই তো ভাল ভাই। গোল হলেও আপনারা প্রটেস্ট করতে পারবেন। আইনে না থাকলে রি-প্লে হবে। কেমন না?

অকাট্য যুক্তি। ওরা আর বাধা দেয় না।

বলটা সাজিয়ে রেডি হয় ভূতোদা।

আমরাও রুদ্ধ নিশ্বাসে রেডি হয়ে থাকি সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হবে: গো—ল!

হুইস্‌ল্‌ পড়ল।

আর একেবারে সামিয়ানা লক্ষ্য করে উল্টো দিকে কিক করল ভূতোদা। আকাশ মার্গে উড়তে উড়তে বলটা এসে পড়ল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পায়ের কাছে শীল্ডটা যেখানে সাজানো আছে তার কাছ বরাবর।

সারা মাঠ স্তম্ভিত! এ কি তালকানা রে বাবা! শুধু হাততালি দিচ্ছেন সস্ত্রীক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

ড্র হয়ে গেল আবার।

খেলার শেষে বৃষ্টি নামল ঝেঁপে! আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়লাম। নেড়া, ক্যাবলা, গজেন আর আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম ক্রিশ্চান পাড়ার একটা চায়ের দোকানে। নেড়া কোঁচার খুঁটে মাথাটা মুছতে মুছতে বলে, ভুন্দার কাণ্ডটা দেখলি? নিশ্চিত জেতা-খেলা ড্র হয়ে গেল ফের। এতবড় তাল-কানা দেখেছিস কখনও? কোন দিকে গোলপোস্ট আর কোন দিকে মারলে শট!

আমি বলি, আমার মনে হয়, ভুন্দা ইচ্ছে করেই উল্টোদিকে শট মেরেছিল।

গজেন বলে, বটেই তো! শেয়াল যেমন ইচ্ছে করেই টক আঙুর ফল খায় নি।

আমি চুপ করেই যাই। নেড়া বলে, কি দরকার ছিল বাপু তোর সর্দারি করতে যাবার? গোলকী আছিস্। তাই থাকনা বাপু। আবার পেনাল্টি শট মারার শখ কেন? চিরেটাকে চান্স দিলে ঠিক গোল করত সে। হাজার হোক সে ফরোয়ার্ডে খেলে।

আমার কেমন যেন খারাপ লাগে। ভুতোদাকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম। ওকে নায়ক করে 'ভুতায়ন-মহাকাব্য' লিখব এই ছিল তখন আমার জীবনের এ্যাম্বিশান। ওর কাছে ম্যাজিকও শিখতাম লুকিয়ে। আড়ালে ওকে ডাকতাম 'গুরুদেব'। গুরুনিন্দা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ক্যাবলা বলে, দেখ না, কাল ক্লাসে কী কাণ্ডটা করি। ভুন্দার সর্দারি ভাঙতে হবে।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাই। আমি মনে মনে ভাবছিলাম—কেন এমন তাল-কানার মত উল্টো দিকে শট মারল ভুতোদা? অনেক ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারি না। গুন্‌গুন্‌ করে গান ধরলাম বাড়ি ফেরার পথে—"গুরু তোমার অন্ত পাওয়া ভার।"

পরদিন স্কুলে গিয়ে আমরাই হতভম্ব। দশটা তখনও বাজে নি। স্কুল গেটের কাছে একটা চাপা ভিড়। ছেলেরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পারছে না। পিকেটিং হচ্ছে নাকি? তার মানে স্কুল হবে না? কিন্তু ভুলটা ভাঙলো পরমুহূর্তেই। দারোয়ানের টুলটা টেনে নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে ভুতোদা বক্তৃতা দিচ্ছেন: গাড়োল গিধ্‌ধড় কোথাকার সব এসে জুটেছে এখানে! তোমাদের লজ্জা হয় না? এসব মস্করা করবার সাহস ওরা পায় কোত্থেকে? এ্যাঁ? তোমাদের ক্যাপ্টেনের বয়স 'বায়ো না ত্যায়ো, মা বলে আয়ো কম'—এসব কী ইতরামো? ওদের গোটা স্কুলটাই খেলার মাঠে যেতে পারে। কেন তোমরা পার না? তোমরা মানুষ না বাছুর? বাছুর হলে তবু কাজ হত, মাঠে গিয়ে কিছু হাম্বা হাম্বা করতে পারতে।

বুঝতে পারি, কালকে পেনাল্টি ফস্‌কে যেতে মর্মান্তিক চটেছে ভুতোদা। একটা সংস্কৃত গাল নেই ওর মুখে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন হেডমাস্টার মশাই। ডাকেন, বাবা ভুতনাথ।

টুপ করে টুল থেকে নেমে পড়ে ভুতোদা। আমচুরের মত কাঁচুমাচু মুখে বলে, স্যার ?

হেডমাস্টার মশাই ভুতোদাকে কখনও ধমক দিতেন না। মিষ্টি করে বলেন, এসব কী হচ্ছে বাবা ভূতনাথ ? তুমি নিজে পড়াশুনা না করতে চাও ক্ষতি নেই, কিন্তু এইসব সুকুমারমতি ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন বাপ ?

ভুতোদা ঘাড়টা চুলকে আমতা আমতা করে, ঘণ্টা এখনও বাজেনি স্যার।

—বেজেছে বাবা। তাণ্ডব নাচতে নাচতে ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমার কানে যায় নি। তাছাড়া তোমার ঘণ্টা তো এ স্কুলে বাজবে না বাবা। তোমার ঘণ্টা বেজেছে স্বর্গে ! কয়েক বছর ধরেই তা বেজে চলেছে।



তোমরা মানুষ না বাছুর ?

সবাই মুখ টিপে হাসছে। দারুণ অপমানিত হয়েছে ভুতোদা। মহিষাসুরের মত মুখটা থমথম করছে তার। আমরা ক্লাসে ঢুকে পড়ি। ভূতদাও গিয়ে বসে ওর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এজমালি ভূখণ্ডে, থুড়ি—কাষ্ঠখণ্ডে। লাস্ট-বেঞ্চির কোণায়। আমাদের কারও সাহস হয় না ভুতোদাকে কিছু বলার। ফার্স্ট পিরিয়ডে ছিল ট্রানস্লেশন ; ঘণ্টা পড়ে গেলে ন্যাপলা একবার সাহস করে ভাববাচ্যে বললে, ও ! কাল ভুদ্দা যা খেলেছিল একেবারে আগুন ছুটিয়ে !

ভুতোদা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকায় নেপালের দিকে। ভাগ্যে এ কলি যুগে ব্রহ্মতেজে মানুষ ভস্ম হয়ে যায় না। না হলে ন্যাপলা এতক্ষণে যাকে বলে সেই 'গো-ওয়েণ্ট-গন্' !

আমাদের আর কারও সাহস হল না ভুতোদাকে ঘাঁটাবার। পর পর দুটো পিরিয়ড

কেটে গেল নির্বিঘ্নে। শেষ পর্যন্ত টিফিনের লম্বা ঘণ্টা বাজল। আমার টিফিন বাক্সে ছিল কুচো গজা আর ল্যাংচা। আমি জানতাম, ল্যাংচা বস্তুটা ভুতোদার খুব প্রিয়। ওর দিকে টিফিন বাক্সটা বাড়িয়ে ধরে বলি, কাল ভুন্দার খেলা দেখে মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই ডালহৌসির ডেভিসকে। আর সেই ইয়র্কশায়ার টিমের সেই সাতফুট লম্বা গোলকীটাকে—কি যেন তার নাম ভুন্দা?

ডালহৌসি টিমে ডেভিস বলে সত্যিই কোন গোলকীপার কস্মিনকালে ছিল কিনা তা আমার জানা নেই—ইয়র্কশায়ার টিমের খেলাও আমি জীবনে দেখিনি। নামগুলো ভুতোদার কাছে শুনে শুনে আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ভুতোদা নিঃশব্দে ল্যাংচাটা তুলে নিল টিফিন বাক্স থেকে। তা নিক, কিন্তু কথাই বলে না যে। অবশেষে আধখানা ল্যাংচা আমার হাতে গুরুপ্রসাদ ভেঙ্গে দিয়ে মুখভঙ্গি করে চিবোতে থাকে। ল্যাংচার পর নিজেই একমুঠো কুচোগজা তুলে নিল; কিন্তু না, কোন কথা নেই তার মুখে। গোবিন্দ আর কি করে, নিজের টিফিন বাক্স থেকে একটা পেয়ারা বের করে ভুতোদার হাতে দেয়। এটাও গ্রহণ করে ভুতোদা। মটর বলে, ছুরি দেব ভুন্দা? কেটে কেটে খাবেন?

পেন্সিলকাটা একটা ছুরি সে পকেট থেকে বের করবার উপক্রম করে! ভুতোদা ধমকে ওঠে, তুই চুপ কর মর্কট!

মর্কট! কথাটা বাংলা না সংস্কৃত? কানে কানে প্রশ্ন করি গজাকে। গজা বলে, সংস্কৃতই হবে রে। মনে নেই সেদিন পণ্ডিতমশাই তোকে মর্কট বলেছিলেন? পণ্ডিতমশাই কখনও বাংলা গাল দেন না।

আমাকে মর্কট বলে গাল দিয়েছিলেন? গজাটা কি ডাহা মিথ্যুক রে বাবা! কিন্তু না, নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে কেস খারাপ করবার সময় এখন নয়। ভুতোদার মুখে সংস্কৃত বুলি যখন শোনা গেছে, তখন ফাঁড়া এ যাত্রায় কেটে গেছে বুঝতে হবে।

সুতরাং আর ভয় নেই। সবাই মিলে চেপে ধরি ভুতোদাকে। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। ভুতোদার ভাষায় সে সব কথা এখন যাগ্‌গে-মরুগ্‌গে'! এখন আমাদের কি করতে হবে ভুতোদা বলুক। আমরা লীডারের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

শেষ পর্যন্ত ভুতোদা উঠে দাঁড়ায়। প্রশংসায় ভুত পর্যন্ত ভক্তের কথা শোনে, তা এতো ভুতনাথ, মানে আশুতোষ। টিচারের টেবিলটার কাছে উঠে গিয়ে শুরু করে বক্তৃতা: খেলার জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। সেটা কিছু বৃহৎ কথা নয়! কিন্তু ঐ দন্ধানন বালখিল্য বাহিনী রাসভকণ্ঠে তোমাদের ক্যাপ্টেনকে চিপিটক নিষ্পেষণ করতে চায়, এ অপমান অসহ্য! কেন? আমাদেরও কি গলা নেই, আমরা কি নিষ্কণ্ঠক কবন্ধ?

আগুন ছুটিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে ভূতোদা। নির্ভেজাল সংস্কৃত বুলি। আমরা দু-তিন জনে জিবেগজাটার মুখ চেপে ধরে থাকি। 'চিপিটক নিষ্পেষণে' যে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা আর 'নিষ্কণ্ঠক' মানে যে কণ্ঠহীন, তা আমরা ঠিকই বুঝে নিয়েছি। শুধু ভয় ঐ গজাটাকে, কখন হয়ত বলে বসবে, সমাসটা ঠিক নয়, আর অমনি ফ্লো আটকে যাবে ভূতোদার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে দুর্ঘটনা ঘটতে পারল না আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায়।

ভূতোদা একনাগাড়ে বলে চলেছে—পণ্ডিতমশাই কি বলেন শুনিস নি ? যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি, স্টোভে সিদ্ধতি খলু !' তার অর্থ কি ? আর্থাৎ কিনা এক হাঁড়ি ভাত যদি সিদ্ধ করতে চাও তাহলে হাঁড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে বাপু-বাছা করলে কিচ্ছুটি হবে না ! স্পিরিট ঢাল, স্টোভ জ্বাল, পাম্প কর—ব্যস্ ! আর দেখতে হবে না, বাঁশমতী চালও দশমিনিটে সিদ্ধ হয়ে যাবে। এর তাৎপর্য কি ? না—কষ্ট কর কেষ্ট পাবে, বসে বসে চিন্তা করলে কিচ্ছুটি হবে না !

কিছু একটা বলার জন্যে ছটফট করতে থাকে গজা। কিন্তু আমরা চেপে ধরে থাকি তাকে। নেড়া বলে, বেশ হুকুম কর। আমাদের ক্লাসে বেয়াল্লিশটা ছেলে আছে তুমি যদি চাও, আমরা সবাই যাব। চাইকি অন্যান্য ক্লাসেও গিয়ে ক্যানভাস করে আসতে পারি।

ভূতোদা বলে, দরকার নেই ও মেষযূথে। দ্বা-চল্লিশই যথেষ্ট। আমি মন্ত্র বলে ঐ দ্বা-চল্লিশকেই দশগুণ বাড়িয়ে ফোর-ফার্টি করে দেব।

বলে কি ভূতোদা ? মন্ত্র বলে সে এক টাকার নোটকে দশ টাকার নোট করতে পারে বলে বেয়াল্লিশজন ছেলেকে দশ গুণ বাড়িয়ে চারশ-চল্লিশজন করে দেবে ! বিস্ময়ে একটু অভিভূত হয়ে পড়ি আমরা। গজার মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে হাতটা আলগা হয়ে গেছে। আর তৎক্ষণাৎ ঘটে গেল সর্বনাশ ! গজা সুযোগ পাওয়ামাত্র বলে বসে, বেয়াল্লিশকে দশ দিয়ে গুণ করলে চারশ চল্লিশ হয় না ভুদ্দা—

ভূতোদা গর্জে ওঠে, আলবৎ হয়। ম্যাজিশিয়ান না পারে কি ?

গজাও ক্ষেপে ওঠে, অঙ্ক শাস্ত্রকে নস্যাৎ করতে। আমি বলছি বেয়াল্লিশকে দশ-গুণ করলে চারশ কুড়ি হওয়ার কথা।

ভূতোদা এঁড়ে তর্ক শুরু করে, না তা হয় না। তা যদি হত তাহলে কাল পেনাল্টিতে গোলও হত।

গজা বলে, হেত্তোর ? কী আবল-তাবল বকছ। আমি বলছি অঙ্কের কথা। ফার্টিটু-ইনটু টেন ইজ্ ইকোয়্যাল টু—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভূতোদা বলে, ফোর-ফার্টি।

গজাও গর্জে ওঠে, আজ্ঞে না ! কষে দেখ—ফোর টোয়েণ্টি !

আর যায় কোথায় ! ভুতোদা যেন দক্ষযজ্ঞের আসরে নামল, কি বললি ? আমি ফোর-টোয়েণ্টি ! মানে জোচ্চোর ?

আস্তিন গুটিয়ে উঠে আসে ভুতোদা, কেন ? চোরাই পেনাল্টি গোলে মারিনি বলে আমি ফোর-টোয়েণ্টি ? আয় তুই কত সড় জিবেগজা দেখি । না চিবিয়ে গিলেই আজ খাব তোকে ।

অনেক কষ্টে আমরা সবাই মিলে তাকে থামাই । গজাটারই দোষ । আমরা ক্লাশশুদ্ধ ছেলে জানি ফোর-টোয়েণ্টি বললে ভুতোদা খুব ক্ষেপে যায়, আর ও হতভাগাটা তা জানে না ? ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল। সতীশবাবু ক্লাস নিতে এলেন । এসেই বলেন, ভুতনাথ, অত চীৎকার করছিলে কেন? যাও সীটে গিয়ে বস ।

ভুতোদা একটু নরম হয়ে বলে, আমাকে ছুটি দিন স্যার, বাড়ি যাব ।

—কেন ? বাড়ি যাবে কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

—হয় নি কিছু । সের খানেক ময়দা কিনে রেখেছি, আঠা বানাতে হবে ।

—আঠা বানাবে ? কি হবে এত আঠা দিয়ে ?

—আজ বিকেলে যে আমাদের ফাইনাল খেলা !

সতীশবাবু অবাক হয়ে বলেন, কিছুই বুঝলাম না । তোমারই মাথা খারাপ না আমার ? ফাইনাল খেলার সঙ্গে ময়দার আঠার কি সম্পর্ক ?

—সে স্যার আপনি বুঝবেন না । আমি যাই বরং । হেডমাস্টার মশাইকে কিছু বলবেন না ; আমি কিন্তু স্যার আপনার অনুমতি নিয়েই যাচ্ছি ।

বিস্মিত সতীশবাবু কিছু বলার আগেই বইখাতা নিয়ে দিব্যি চলে গেল ভুতোদা ।

আমরা কেউ হলে নিশ্চিত বেত খেতে হত ; কিন্তু ভুতোদার সাত খুন মাপ । সবাই জানে সে একটু পাগলাটে গোছের । ও যেন নিয়মের ব্যতিক্রম । দিব্যি পেয়ারা চিবোতে চিবোতে বাড়ি চলে গেল সে ।

বিকেল বেলা মাঠে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের সবাই এসেছে । অবশ্য আমরা সর্বসমেত জনাপঞ্চাশ আর ওরা অন্তত দুশ । গলাবাজিতে জিতবার কোন আশাই নেই । ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক এসে বসলেন । তিন দিন ধরেই আসছেন তিনি । মেমসাহেবই পুরস্কার বিতরণ করবেন ।

আমাদের দলের দশজন খেলোয়াড় এসে গেছে । কিন্তু ভুতোদা কই ? কী কেলেঙ্কারী ! আসল লোকই গরহাজির ! সময় হয়ে গেছে । রেফারী হুইসল্‌ দিল । দুটো টিম মাঠে নামল ; আমাদের দশজন ।

এমন সময় একটা সাইকেলে চেপে এসে পেঁছালো ভুতোদা । তার পিছনে পিছনে এল একটা সাইকেল রিকশা । তাতে এক রিকশা-বোঝাই কাগজের

চোঙা। আমরা তো অবাক। এত চোঙা এল কোথা থেকে? আর কোন্ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধেই বা লাগবে এগুলো?

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ভূতোদা এক লহমায়। অদ্ভুত ওর বুদ্ধি। ওর কাকা হচ্ছেন ওভারসিয়ার কলেজের ড্রইং টিচার। ড্রইং পরীক্ষার বড় বড় কাগজ ছিল কাকার হেপাজতে। আগের আগের বছরের পরীক্ষার খাতা। ভূতোদা ময়দার আঠার সাহায্যে তাই দিয়ে বড় বড় চানাচুরের ঠোঙা বানিয়েছে।

ভূতোদার ম্যাজিক অব্যর্থ। ফর্টি'টু ইনটু টেন ইজ্ ইক্যোয়াল টু ফোরফর্টি'। ওরা দু'শ ছেলে যতটা চীৎকার করে আমরা পঞ্চাশ জনে করলাম তার ডবল—চোঙার গুণে দু-দশ মিনিটেই ওদের গলা গেল বসে। আগের দুদিনও ওরা এক নাগাড়ে চিল্লেছে। আর কত পারবে? চোঙামুখো আমরা পঞ্চাশজনেই মাঠখানাকে সরগরম করে রাখলুম। ওরা একবার করে গোল মিস্ করে আর ন্যাপলা চোঙা ফোঁকে: সি. এম. এস. কটা গোল মিস্ করল?

আমরা সমস্বরে বলি: বায়ো কি ত্যায়ো!

যে ছেলেটি এইমাত্র গোল মিস্ করেছে তার নাম ধরে ন্যাপলা বলে: জগাই কি বলে?

আমরা সকলে একযোগে সুর করে বলি: জগাই বলে আ-ও-ও বেশী!

আমাদের চোঙার চিল্লানিতে ওরা একেবারে ঠাণ্ডা। একশ জোড়া ওয়েট-ক্যাট। ওদের ফরোয়ার্ড লাইনের সব কটা খেলোয়াড় এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ে। তালকানার মতো এলোপাথাড়ি আউটে মারতে থাকে বারে বারে। গোল-পোস্ট গুলিয়ে যায়। আর আমরা তৎক্ষণাৎ 'ক' টাকে আরও দীর্ঘায়িত করে তান ধরি: জগাই বলে আ-ও-ও-ও বেশী!

শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে কেউ আর সাহস করে বলটাকে গোলে মারতেই চায় না। পাছে মিস্ করলে আমরা তার নাম ধরে বিদ্রূপ করি। গোলের কাছাকাছি এসে ফরোয়ার্ড দেয় ইনকে—ইন দেয় আউটকে আউট ব্যাক পাশ করে হাফকে। আমাদের ডিফেন্সকে আর কষ্ট করতে হয় না। ওরা নিজেরাই পায়ে পায়ে বলটাকে পিছিয়ে নেয়। আমরা ওদের সে দশা দেখে হেসে বাঁচিনে।

শেষ পর্যন্ত আবার গোললেস ড্র হয়ে গেল।

স্থির হল ছ-মাস করে থাকবে শীল্ডটা এক এক স্কুলে। দু দলই যুগ্মবিজয়ী। প্রাইজ দেবার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, কোন পক্ষই যে গোল করতে পারে নি, এতে আমি খুশীই হয়েছি। দু দলেরই কৃতিত্ব সমান সমান। কে আগে শীল্ডটা রাখবে সেটা আমি 'টস্' করে স্থির করব।

ভূতোদা তার কন্দর্পকান্তি বপুখানিকে এক পা বাড়িয়ে বলে, আমি একটা কথা বলতে পারি স্যার?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন, হ্যাঁ, বলো—বলো।

—আপনি টস্ করবেন না স্যার।

—টস্ করব না ? তাহলে কাকে প্রথমে শীল্ডটা দেব ?

—আমি বলব স্যার ? আপনি সি. এম. এস-এর ক্যাপ্টেনকেই প্রথম ছ' মাসের জন্য শীল্ডটা দিন।

ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী অবাক হয়ে বলেন, কিন্তু কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ ?

ভূতোদা বলে, শীল্ডটা আমরা চার বছর ধরে রাখছি। আজ যদি আমরা সমান সমান হয়ে থাকি তাহলে কৃতিত্বটা তো ওদেরই। তারপর ধরুন স্যার (ভূতোদা কথা বলছিল কিন্তু মেমসাহেবের দিকে ফিরেই) ওরা ব্যাণ্ড পার্টি এনেছে, লরি এনেছে ; আমরা তা আনিনি। আজ শীল্ড না পেলে ওরা দুশ'জন ছেলে হতাশ হবে, আর আমরা মাত্র পঞ্চাশজন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুশী হয়ে ওর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে বলেন, ঠিক আছে, তাই হোক।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন, আমি শুধু একথা বলব, ফুটবলটা শুধু পা দিয়ে খেলার না, হৃদয় দিয়ে খেলার। তোমরা দেখেছ গতকাল রেফারী একটা পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছিলেন। দর্শকদের মতে নির্দেশটা ঠিক হয় নি। কিন্তু রেফারীর নির্দেশ, তা সে ঠিকই হোক আর ভুলই হোক মেনে নিতেই হবে। এই হচ্ছে খেলার আইন। নিয়মানুবর্তিতা খেলার একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সত্য ধর্মের স্থান তারও উপরে। দুর্গেশ দুমরাজের গল্প নিশ্চয় জান তোমরা। আমাদের ভূতনাথও কাল ঐ রকম একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। খেলার ধর্ম আর সত্য ধর্মের দ্বন্দ্ব যে চমৎকারভাবে মিটিয়ে দিয়েছিল উল্টোদিকে বলটাকে কিক্ করে। সে দেখিয়ে দিয়েছে খেলোয়াড়ি মনোভাব কাকে বলে। আমি আজ তিন বছর এই জেলায় আছি। বহুবার আমি শ্রীমান ভূতনাথের খেলা দেখেছি। শুনেছি তোমরা ওকে একটি খেতাব দিয়েছ—পেনাল্টি—ঈটার। আমি আজ শ্রীমান ভূতনাথকে আর একটা নতুন খেতাব দিলাম—দুর্গেশ দুমরাজ দি সেকেণ্ড !

মিসেস্ ডি. এম. কি বুঝলেন তা তিনিই জানেন। তিনিই হাততালি দিলেন সবচেয়ে বেশী।

নিশ্চিত হারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ভূতোদা আগেই আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল। নতুন খেতাব পেয়ে সে যেন ষোলোখানা হয়ে গেল !

খেলাধুলো ছাড়া আরও একটা বিষয়ে অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল ভূতোদার। চমৎকার ম্যাজিকের খেলা দেখাতো সে। আমি ছিলুম ওর সাকরেদ। ছোটখাটো অনেক ম্যাজিক সে আমাকে শিখিয়েছিল। এখন তার অনেকগুলো ভুলে গেছি। তবু

আজও যখন কোন ম্যাজিক শো'তে গিয়ে পুরানো খেলাগুলো দেখি সব মনে পড়ে যায়। তা বলে কখনও কোন ম্যাজিসিয়ানের কায়দা সর্বসমক্ষে ধরে দিই না। ভূতোদা শিখিয়েছিল—ম্যাজিক-জগতে তা নিষেধ। ওর সাকরেদি করতে করতে যখন হাত-সাফাই বেশ কিছুটা অভ্যাস হয়েছে, তখনই একদিন ভূতোদা আমাকে ডেকে বলেছিল, ম্যাজিক-ওয়ার্ল্ডে কতকগুলো অলিখিত আইন আছে, বুঝলি নরেন। সেগুলো কখনো লঙ্ঘন করিস না।

আমি বলি, সেগুলি কি? তুমি গুরুদেব, আমাকে শিখিয়ে দাও।

এই গুরুদেব ডাকটা ভূতোদার ভারি পছন্দ। অমনি খুশী হয়ে ওঠে। সাদা বাঙলা ছেড়ে অমনি সংস্কৃত বুলি শুরু হয়ে যায়, বলে, হ্যাঁ, তোকে এখন একে একে সব কথা বলা দরকার। এখন তুই নিজেও একজন ছোটখাট মাদারী হয়ে উঠেছিস্। শৃণু! যখন দেখবি কোন ম্যাজিসিয়ান খেলা দেখাচ্ছে, তখন নির্বাক্যে ধ্যানী-বুদ্ধের মতো চুপচাপ বসে থাকবি। না কুরু টুঁ শব্দং! আর যদি দেখিস তোকেই বোকা বানাতে চায় তখন নিচু গলায় বলবি: মাদারর্যাহমপি!

আমি অবাক হয়ে বলি, মাদার্যাহমপি? মানে?

—সন্ধি বিচ্ছেদ কর। মাদারী + অহম্ + অপি! অর্থাৎ কিনা আমিও একজন মাদারী! বুঝলি?

ঠিক এই কাণ্ডই একবার ঘটেছিল ভূতোদার জীবনে। আমার সামনেই। আমি ছিলুম উপস্থিত ওর এ্যাসিস্‌টেণ্টরূপে। ব্যাপারটা বলি—

আমাদের জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, সেই যিনি ভূতোদাকে দুর্গেশ দুমরাজ খেতাব দিয়েছিলেন—তিনি বদলি হয়ে যাচ্ছেন। অফিসার্স ক্লাব থেকে তাঁকে বিদায় ভোজে আপ্যায়ন করা হবে। ভূতোদাকে ওরা আমন্ত্রণ করল নৈশ ভোজের আসরে আনন্দ পরিবেশন করতে। খরচ যা পড়বে তা ওরা দেবে, তাছাড়া রাত্রে শো'র পর ওখানেই ভালমন্দ খ্যাঁটের ব্যবস্থা। মুরগীর রোস্ট, চিংড়ির পোলাও, ভেটকির ফ্রাই আর আইসক্রীম! আমি তো সাকরেদ হিসেবে এক পায়ে খাড়া। ফুলপ্যাণ্ট একটাই ছিল। আর্জেণ্ট কাচতে দিলাম। ধোপদুরস্ত না হলে কি অমন ভোজ-সভায় যাওয়া যায়!

সন্ধ্যাবেলায় আমরা দুটি বন্ধু সেজেগুজে হাজির হলাম অফিসার্স ক্লাবে। একটা কালো রঙের ঝোলা ঝোলা জোব্বার মতো বেঢপ পোশাক ছিল ভূতোদার। সেটাই চড়ালো গায়ে। পাখির পালক দেওয়া পাগড়ি ছিল একটা। নাগরা দিলে পায়ে। ঐ কন্দর্প কান্তি চেহারায় সে সব সাজপোশাকে যা খোলতাই বাহার হল তা আর কহতব্য নয়! সে বছর ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন এস. ডি. ও.—নর্থ। তিনি সকলের কাছে ভূতোদার পরিচয় দেবার উদ্‌যোগ করতে মিসেস্ ডি. এম. বলে ওঠেন, উই অল নো হিম। ভালো খেলোয়াড় আছে। আচ্ছা! তুমি ম্যাজিকও

দেখাইতে পার ?

ভুতোদা বলে, নট মাচ। থোড়া থোড়া।

শুরু হল খেলা। তাসের খেলা। এমন খোলা জায়গায় তাসের হাতসাফাই ছাড়া আর কি দেখানো সম্ভব ? স্টেজ নেই, স্ক্রীন নেই, চারিদিক ঘিরে লোক বসেছে। তবু ওরই মধ্যে চমৎকার কতকগুলো খেলা সে দেখালো। মেমসাহেব খুব খুশী। ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছেন তিনি। শেষে ভুতোদা শুরু করল একটা নতুন খেলা। তাসগুলো মেমসাহেবের সামনে উপুড় করে মেলে ধরে বলে, যে কোন একখানা টেনে নিন। আমাকে দেখাবেন না, অন্য সকলকে দেখান।

মেমসাহেব বললেন, অপর কাহাকে টানিতে বল। আমি নহে—

—না না, আপনিই নিন।

মেমসাহেব ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। দুজনের চোখে চোখে কি যেন কথা হল। শেষে মেমসাহেব নীচু গলায় বলে, আই নো এফ. সি.।

সর্বনাশ ! মেমসাহেব খেলাটা জানে ! এফ. সি. মানে হচ্ছে ফোর্সিং কার্ড। খেলাটা আর কিছুই নয়, ম্যাজিসিয়ান কায়দা করে একখানা তাস দর্শকের হাতে গুঁজে দেয়। যে তাস টানে সে বুঝতে পারে না, ভাবে বাণ্ডিল থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একখানা নিল সে। আসলে যেটা নেয় সেটা ম্যাজিসিয়ানের পরিচিত তাস— কায়দা করে গছিয়ে দেওয়া আর কি।

ভুতোদা বলে, কই টানুন।

কী আপদ ! ভুতোদা কি মেমসাহেবের ইঙ্গিত বুঝতে পারে নি ? আমি তার তলপেটে অলক্ষ্যে একটা খোঁচা মেরে কানে কানে বলি, মেমসাহেব ক্রুতে— মাদার্য্যমপি !

আমার এমন নিখুঁত সংস্কৃত মন্ত্রতেও কাজ হল না। ভুতোদা হয় কালা নয় সংস্কৃত ভুলে গেছে। বললে, তাতে কি ? আবার মেমসাহেবের সামনেই তাসের গোছা মেলে বলে, কই নিন !

মেমসাহেবেরও এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি হয়। হাজার হোক ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া রক্ত তো ! বললে, অলরাইট। তোমার তাস আমি বাম হস্তে লইব না, রাইট হ্যাণ্ডে লইব। দাও তাস।

বাঁ হাতের দুটি আঙুলে একটি বিশেষ তাসকে চেপে ধরে মেমসাহেব ডান হাতে টেনে নেয় একখানা। ভুতোদা একেবারে চুপসে যায়। বলে, আচ্ছা, আর একবার। ...

আবার নতুন ভাবে তাসগুলো মেলে ধরে।

মেমসাহেব হেসে বলে, একবার নয়, একশ বার ! কিন্তু ও কায়দাটাও আমার

জানা আছে। ওকে বলে ব্যাক-হ্যান্ড পুশিং।

বাঁ হাতে প্যাকেটটির সবচেয়ে নিচের তাসখানা চেপে ধরে বলে, শ্যাল আই টেক নাউ? নিব এইবার?

ভূতোদার অবস্থা তখন ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি! পরপর চার পাঁচ বার চেষ্টা করে সে। চার-পাঁচ ধরণের। সাইড-থ্রাষ্ট, লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ড-ম্যানেজ, আন্ডার-হ্যান্ড পুশিং। কিন্তু না: ! কিছুতেই কাবু করা যায় না মেমসাহেবকে। ভদ্রমহিলা সব কয়রকম ফোসিং-এর সঙ্গেই পরিচিত। শেষে তিনি বলেন, ফোসিং কার্ডের নয়রকম ভ্যারাইটি আছে, আমি নয়টি কায়দাই জানি। সময় নষ্ট করিয়া কি হইবে, তুমি অন্য খেলা দেখাও।

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। এত বড় অপমান ভূতোদার জীবনে হয়নি। একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যায় সে। মেমসাহেব যেন একটা গুগ্‌লি বলে মিড্‌ল্‌-স্টাম্পটা উপড়ে নিয়েছে ওর। তবু চালু ছেলে তো, তা সত্ত্বেও মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব ফুটিয়ে বলে, আপনি সত্যই যত্ন নিয়ে ম্যাজিক শিখেছেন দেখছি। কিন্তু এই মাত্র আপনি একটা ভুল কথা বললেন। ফোর্সিং কার্ড দশ রকমের হয়, নয় রকমের নয়।

ভ্রূ-কুঞ্চিত হল মেমসাহেবের। বলেন, এ্যাবসার্ড! আমি সবরকম ম্যাজিকের বই পড়িয়া দেখিয়াছি। এটাই আমার হবি।

ভূতোদা একটা ঢোক গিলে বলে, হতে পারে। ইংরেজী বইতে নয় রকম ফোসিং কর্ডের কথা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ দশম নিয়মটা একেবারে ভারতীয় কায়দা। আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে: দশমস্তমসি!

মেমসাহেব বলেন, তার অর্থ?

—'তম' মানে অন্ধকার, আর সী' মানে সমুদ্র। অর্থাৎ শাস্ত্রকার বলেছেন এই দশ নম্বরের কায়দাটা খুব গভীর। সমুদ্রের মতো অতল অন্ধকারাচ্ছন্ন!

মেমসাহেব সেসন-জজ দাশ-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনাদের শাস্ত্রে এই কথা আছে?

দাশ-সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ, পণ্ডিতমানুষ বলে পরিচিত। তিনি একটা গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, ঐরকম একটা কথা ভারতীয় দর্শনে আছে বটে, তবে তার এমন শঙ্করভাষ্য আমার জানা ছিল না।

তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে ভূতোদা বলে, তবেই দেখুন, উনি পর্যন্ত এ ব্যাখ্যা জানেন না। এই দশম কায়দাটা একেবারে ভারতীয় কায়দা। হুডিনিও জানতেন না। গণপতি জানতেন, পি. সি. সোরকার জানেন, আর জানেন...

এবার 'বাও' করে বাকিটুকু অনুক্ত রাখল সে। ভাবখানা, আর জানেন এই শর্মা!

সকলে মুখ টিপে হাসে ওর ডেঁপোমিতে। মেমসাহেব গালে হাত দিয়ে ওর চালবাজি লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। এবার বলেন, তুমি সেই দশম কায়দায় আমাকে ফোর্স করিতে পার?

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে ভুতোদা বলে, পারি তবে আজ তো হবে না। এজন্য আমাকে দুদিন হঠযোগ করতে হবে। আপনারা যে কালই চলে যাচ্ছেন, না হলে পরশু সে খেলা আপনাকে দেখাতাম।

মেমসাহেব বলেন, তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমরা পরশুর পরের দিন যাইব। তুমি পরশুই আমাকে সে খেলা দেখাও। হঠযোগ আর নো হঠযোগ, আমাকে যদি তুমি ফোর্স করিতে পার তাহা হইলে আমি একশত টাকা বাজি হারিব। কেমন রাজি?



পি. সি. সরকার জানতেন, হুডিনি জানতেন, আর...

ভুতোদার চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ে। কোনক্রমে ঢোক গিলে বলে রাজি তো হতেই পারি, তবে কি জানেন, আমার কেমন যেন বিবেকে বাধছে।

—কেন? তোমার বিবেকে বাধিতেছে কেন?

—এ যেন ছেলেমানুষের হাত থেকে মোয়া কেড়ে খাওয়া! মনে করুন আপনার সঙ্গে কেউ বাজি রাখতে চায় যে আগামীকাল সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে। সে বেটিং অ্যাকসেপ্ট করতে আপনার বিবেকে বাধবে না?

ভুতোদা যতই সপ্রতিভ ভাব দেখাক, মেমসাহেব ওর চালাকি ধরে ফেলেছেন। এবার সবাইকে সম্বোধন করে বলেন—পরশু সন্ধ্যায় আপনারা সকলে এখানে চা খাইতে আসিবেন। অতি অবশ্যই। আপনাদের নতুন ডি. এম-ও কাল আসিতেছেন। আপনারা হঠযোগী ফোর্সিং দেখিয়া যাইবেন। যে খেলা স্বয়ং হুডিনিও জানিতেন

না, আশা করি সে খেলা দেখিতে আপনারা সকলেই খুব উৎসুক !—তারপর ভূতোদার দিকে ফিরে বলেন, ইজ্ দ্যাট্ ও. কে. ?

ভূতোদা একটা ম্যাজিসিয়ানি 'বাও' করে বলে, পারফেক্টলি মাদাম ।

পাশের ঘরে টেবিল পেতে আমাদের দুজনকে নিরিবিলিতে খেতে দেওয়া হল । আড়ালে পেয়ে বলি, গুরুদেব ! হটযোগী ফোর্সিং আবার কি ?

গুরুদেব কোন জবাব দেয় না । চোখ বুজে ঠ্যাঙ চিবোতে থাকে কড়মড় করে । কিন্তু আমার খাওয়া তখন মাথায় উঠেছে । বলি, ও গুরুদেব ?

চোখ বুজেই ভূতোদা বলে, আরে খেয়ে নে । চাল মারতে গিয়ে লেঙ্গি খেয়েছি ।

—কি চাল মারতে গিয়েছিলে ?

—আরে দূর ! আমাকে কে যেন বলল, ওরা কাল সকাল বেলাতেই চলে যাবে । তাই—

—কিন্তু তুমি যে বললে একশ' টাকা ঠকিয়ে নিতে তোমার বিবেকে বাধছে !

—তা তো বলতেই হবে । না হলে মুখ রক্ষা হত না কি ?

—তা এখন কি করবে ?

—কি আবার করব ? মুর্গীর রোস্ট দিয়ে পোলাও সাঁটব ।

কী দুর্জয় সাহস ! আমি বলি, সে তো এখন । তারপর ? কাল বাদ পরশু !

এঁটো হাত দুটোই জোড় করে ভূতোদা বলে, এখন একটু মৌজ করে খেতে দে বাবা । পরশুর কথা পরশু ।

পরদিন ক্লাসে এসে বন্ধুদের সব কথা খুলে বলতে নেড়া আর ক্যাবলা তো হেসেই বাঁচে না । আচ্ছা জব্দ হয়েছে ভূতোদা । গজেন বলে, পীরের কাছে মামদোবাজি ! মেমসাহেব ভূদ্দার নাকে এবার স্রেফ তালঝামা ঘষে দেবে । আজ আসুক না ভূদ্দা ক্লাসে ।

কিন্তু কোথায় ভূতোদা ? স্কুলেই এল না সে ।

তা বলে আমার তো একটা দায়িত্ব আছে । আমি হলুম গিয়ে তার সাকরেদ । ছুটির পরে ছুটি তার বাড়ি পানে । কিন্তু বাড়িতেও ভূতোদা নেই । ওর বোন নেড়ি বললে, দাদা কলকাতা গেছে ।

গজেন বলে, শেষ পর্যন্ত মেমসাহেব ভূদ্দাকে একেরে দেশান্তরী করে ছাড়ল র‍্যা ?

ক্যাবলা বলে, অতঃ কিম্ ? এখন কি করা যায় ?

নেড়া বলে, আয় আমরা ক'জন ভূদ্দার মহাপ্রস্থানে দু-মিনিট সাইলেন্স অবসার্ভ করি ।

কিন্তু না । পরদিন বিকালের লালগোলায় চেপে ঠিক ফিরে এসেছে সে । আমি

বলি, গুরুদেব ! আর একটা দিন কোনক্রমে গা-ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দিলেই পারতে। আজ আবার মরতে এলে কেন ? কলকাতা গিয়েছিলে কিজন্যে ?

ভূতোদা গম্ভীর হয়ে বলে, উবেরয়ে ব্যাটের অর্ডার দিতে।

—ব্যাট ? কি ব্যাট ?

—ক্রিকেট ব্যাট। আগামী বুধবারে গিয়ে ডেলিভারী নেব। ফার্স্ট-ক্লাস একটা ব্যাট পছন্দ করে এসেছি। পঁচাত্তর টাকা দাম।

আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না দেখে বলে—আরে বুঝলি না, আজ রাত্রেই তো নগদ একশ টাকা পাচ্ছি।

আমি বলি, তার মানে ? তুমি কি এখনও আশা করছ ঐ ধুরন্দর মেমসাহেবকে ফোর্সিং করতে পারবে ?

উত্তরে ও বলে, না হলে পঁচিশ টাকা এ্যাডভান্স করে আসি ?

আমাদের উপস্থিত হতে কিছু দেরি হয়েছিল। তার আগেই সকলে জমায়েত হয়েছেন। আমরা আর আসব না এটাই বোধহয় ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন, কারণ আমরা ঘরে ঢুকতেই সমস্বরে সকলে বলে ওঠেন : এই তো ওরা এসেছে।

লক্ষ্য করে দেখি দুটি নতুন মুখের আমদানি ঘটেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এঁরা হচ্ছেন নতুন ডি. এম. আর তাঁর স্ত্রী। অল্প বয়স। বেশ স্ফূর্তিবাজ মনে হল।

ভূতোদা একটা 'বাও' করে বলে, প্রথমেই একটা নতুন খেলা দেখাচ্ছি—

বাধা দিয়ে মিসেস ডি. এম. বলেন, না-না, আজ আমাদের সময় কম। তুমি শুধু তোমার যৌগিক ফোর্সিং কার্ডের খেলাটাই দেখাও।

ভূতোদা সসম্ভ্রমে বলে, বেশ স্যার ! তাই হবে, কিন্তু এঁরা আমার কোন খেলাই দেখেন নি। অন্তত এঁদের অনারে একটা খেলা আমাকে দেখাতে দিন।

মেমসাহেব 'স্যার' সম্বোধনে বিচলিত হলেন না, বললেন,—বেশ দেখাও। কিন্তু ঐ একটা খেলাই।

ভূতোদা পকেট থেকে চকচকে একটা তাসের প্যাকেট বার করে মেমসাহের হাতে দিয়ে বললে, চারটে টেক্কা আমাকে বার করে দিন।

মেমসাহেব তাসের প্যাকেট থেকে চারখানা টেক্কা বার করে ওর হাতে দিলেন। ভূতোদা বাকি তাসগুলো প্যাকেট বন্ধ করে পকেটে পুরল। তারপর সে চারখানা টেক্কা চারজনকে দিল। বললে, টেক্কাগুলো আপনারা সাবধানে রাখবেন, আমি চাইলেই ফেরত দেবেন।

চারজন অফিসার যে যার পকেটে তাসগুলো লুকিয়ে রাখলেন। মুন্সেফবাবু, সিভিল সার্জেন, আর দুজন ডেপুটি।

ভূতোদা এবার আগের ডি. এম.-এর দিকে ফিরে বললে, স্যার, গচ্ছিত ধন কেউ যদি ফেরত না দিতে চায়, তাহলে আইনে তার শাস্তির ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়ই ?

ডি. এম. বলেন, নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে কথা কেন ?

—তাহলে স্যার, আমি এঁদের চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি। সর্ব সমক্ষে এঁদের আমি চারখানা তাস রাখতে দিয়েছি, এঁরা আমাকে তা ফেরত দিচ্ছেন না।

সিভিল সার্জেন আঁতকে উঠে বলেন, তুমি তো সাংঘাতিক লোক হে, ফেরত দেব না কেন ? চাইলেই দেব, এই নাও।

তাজ্জব কাণ্ড ! সিভিল সার্জেন তাঁর কোটের পকেট হাতড়ালেন, মুন্সেফবাবু তাঁর পাঞ্জাবীর পকেট তল্লাস করলেন—কাকস্য পরিবেদনা ! টেক্কা চারখানা বেমালুম গায়েব। কারও পকেটে তাস নেই।

ডি. এম. হেসে বলেন, সে সব জানি না মশাই ; এ ছোকরা আপনাদের তাস রাখতে দিয়েছে, আমরা সবাই সাক্ষী। গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কঠিন অপরাধ। তাস ফেরত দিতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে।

মুন্সেফবাবু বলেন, খুব জানি। আমার কোর্টে আজ তো এই রকমই একটা কেস চলল সারাদিন।

সিভিল সার্জেন হেসে বলেন, কী গেরো ! তা দিন শাস্তিই দিন। হারিয়ে যখন ফেলেছি তখন শাস্তিই ভোগ করি। বুড়ো বয়সে ঘানি ঘোরাই !

ভূতোদা মিটিমিটি হাসছে তখন।

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, আমি ডিস্ট্রিক্টের চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি। ফলে নূতন কালেকটারকেই অনুরোধ করছি সুবিচার করে এঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

নবাগত ডি. এম. বয়সে তরুণ। রসিক ব্যক্তি। খুব এক চোট হেসে নিয়ে বলেন, নতুন জেলার চার্জ নিয়েই আমার চার চারজন সহকর্মীর শাস্তির ব্যবস্থা করতে আমার কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। তাই আমি মামলা আমার স্ত্রীর আদালতে ট্রান্সফার করে দিলাম। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলেন, যা শাস্তি দেবার তুমিই দাও।

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী এতক্ষণ মুখ টিপে হাসছিলেন বসে। হঠাৎ এ অনুরোধে বিব্রত হয়ে পড়েন। গুছিয়ে নিয়ে কিছু একটা বলবার উপক্রম করতেই হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসে ভূতোদা। হাত দুটি জোড় করে সবিনয়ে বলে, না স্যার, তা হবে না। ওঁর এজলাসে মামলা ট্রান্সফার করা চলবে না। বাদীর তাতে ঘোরতর আপত্তি !

নতুন ডি. এম. বিস্মিত হয়ে বলেন, কেন ?

—স্যার, উনি দিব্যি ভাল মানুষটির মত বসে আছেন বটে, কিন্তু আমার খবর—বামাল উনিই পাচার করেছেন। বিশ্বাস না করেন ওঁর ভ্যানিটি-ব্যাগ তল্লাস করার হুকুম দিন।

কী কেলেঙ্কারি! টেক্কা চারখানা সত্যিই পাওয়া গেল নবাগত মিসেস্ ডি. এম.-এর ভ্যানিটি-ব্যাগের ভিতর থেকে। ভদ্রমহিলা তো অপ্রস্তুতের একশেষ।

নতুন ডি. এম. আবার তার উপর রসিকতা করে বলেন, এ হে হে। সহকর্মীদের তঞ্চকতায় হতাশ হয়েছিলাম আমি, কিন্তু সহকর্মী দূরের কথা, স্বয়ং সহধর্মিণীই যে শেষ পর্যন্ত—

হঠাৎ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাঝ পথেই থেমে পড়েন উনি।

হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই।

ভূতোদা এবার টেক্কা চারখানা টেবিলের উপর রেখে আবার বার করলে পকেট থেকে বাকি প্যাকেটটা। বললে, আর কোন খেলা দেখতে চান?

মেমসাহেব ব্যস্ত হয়ে বলেন, না, না, এবার তোমার সেই যৌগিক ফোর্সিং কার্ড।

প্যাকেটের তাসগুলো বার কয়েক শাফ্‌ল করে নিয়ে ভূতোদা বললে, বেশ কথা। আমি আপনাকে চিঁড়িতনের গোলাম ফোর্স করব, আগেই বলে দিলাম।

ভূতোদা একটা লম্বা শ্বাস নিল। দম বন্ধ করে আধ-বোজা চোখে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মেমসাহেবের দিকে। যন্ত্রচালিতের মত মেলে ধরলে উপুড় করা তাসগুলো। মেমসাহেব তো ছার, আমিই বুঝতে পারলুম কোন তাসখানা সে গুজে দিতে চাইছে। প্যাকেটের তলা দিয়ে সেই তাসখানা সরসর করে এগুচ্ছে আর পিছুচ্ছে। মেমসাহেব হাসল। সেই চিহ্নিত তাসখানা এড়িয়ে অন্য একটা তাস সন্তর্পণে টেনে নিলেন তিনি। আমি ভাবলুম, যাঃ, সেরেছে।

কিন্তু চিৎ করতেই দেখা গেল সেটা আর কিছু নয়, চিঁড়িতনের গোলাম!

মেমসাহেব অবাক বিস্ময়ে শুধু বললে, স্ট্রেঞ্জ!

হুস্ করে শ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে হঠযোগী ভূতোদা চোখ মেলে তাকায়। সকলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, কি হল? চিঁড়িতনের গোলামই তো বটে? কেউ আর কথা বলে না? মেমসাহেবই শেষ পর্যন্ত বলেন, আমি বাজি হারিয়াছি।

ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে একশ টাকার একখানা করকরে নোট বার করে সেটা তিনি টেবিলের উপর রাখলেন। ভূতোদা সেটা কপালে ছুঁইয়ে বুক পকেটে তুলে রাখল সযত্নে। মেমসাহেব বোধ করি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বলেন, খেলাটি তুমি আর একবার দেখাইবে?

ভূতোদা বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। টানেন।

দীর্ঘশ্বাস টেনে আধবোজা নেত্রে ধ্যানস্থ ভূতোদা আবার মেলে ধরে তাসের গোছা। মেমসাহেব অনেক বুদ্ধি বিবেচনা করে অনেক বেছে বেছে সট করে একটা তাস টেনে নেয়।

ক্যা তাজ্জব কী বাৎ! এবারেও সেই চিড়িতনের গোলাম।

মেমসাহেব বলেন, ইটস্ রিয়ালি ওয়াণ্ডারফুল। এ পদ্ধতিটি হুডিনিও জানিতেন না?

ভূতোদা বললে, ক্যামন করে জানবেন বলুন? এটা যে পিওর ভারতীয় যৌগিক পদ্ধতি!

—এই দশম পদ্ধতিটি তুমি আমাকে শিখাইয়া দিবে? আমি তোমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিব।

ভূতোদা বলে, আর পারিশ্রমিক লাগবে না! আপনি তো এইমাত্র নগদ একশ টাকা দিলেন।

—আমাকে কি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে?

—আজ্ঞে না! এই দেখুন—খেলাটা জলবৎ তরলং।

তাসের গোছা সে টেবিলের উপর চিৎ করে বিছিয়ে দেয়। হরি বোল! দেখে আমারও চক্ষুস্থির। প্যাকেটের বাহান্নখানা তাসই চিড়িতনের গোলাম!

ভূতোদা বলে, খেলাটা কিছু ব্যায়সাধ্য। পাইকারী হারে তিপ্পান্ন প্যাকেট একই রকম তাস কিনতে হবে। যে প্যাকেট থেকে আপনাদের চার টেক্কার খেলা দেখালাম সেটা এ প্যাকেট নয়।

পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করে বলে, সেটা এইটা। এটুকুই হাত সাফাই। বাকিটা আগেই বলেছি—জলবৎ তরলং।

মেমসাহেব মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বলেন, ও! য়ু নটি বয়!

তখন বয়স ছিল কম, তাই বুঝতুম না। ভূতোদাকে দেখতে মোটেই ভাল ছিল না। তালগাছের মত ঢ্যাঙা, বড়ির মত নাক, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। পড়াশুনাতে তো সে ছিল স্বয়ং বৃহস্পতি। তবু সবাই তাকে ভালবাসতো। মাস্টার-মশাইরা সকলেই ওকে স্নেহ করতেন। আমরা ভাবতুম তার কারণ ও খেলাধুলায় চৌখস ছিল বলে। এখন বুঝতে পারি, সে জন্য নয়। তাকে সবাই ভালবাসত কারণ ঐ কুৎসিত-দর্শন মানুষটার হৃদয় ছিল বড়। ভূতোদা ছিল যাকে বলে আউট-এ্যণ্ড-আউট স্পোর্টসম্যান। খেলতে বসে কেউ যদি বলে—তুমি জুয়াচুরি করেছ, অমনি সে খেপে উঠত। ওর মতে সবচেয়ে বড় গালাগালি হচ্ছে "চারশ বিশ" অর্থাৎ ফোর-টোয়েণ্টি!

একবার ওকে চারশ-বিশ বলায় কি কাণ্ড ঘটেছিল এবার তাই বলব। আগেই বলেছি, আমি ছিলুম ওর ম্যাজিকের সাকরেদ।

শহরের সবচেয়ে নামকরা উকিল কালিচরণবাবু। উকিলপাড়ায় মস্ত তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন। তাঁরই বড় মেয়ে উমার বিয়েতে ডাক পড়ল ভূতোদার। ঠিক

বিয়ের মধ্যে নয়। অষ্টমঙ্গলাতে বর-বউ ফিরে এলে হল এই আনন্দ-অনুষ্ঠান। চক্‌মেলানো দালান। কালিচরণবাবু শহরের অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আসলে ওঁর বড় ছেলে শিবু ব্যবস্থা করেছিল একটা ভ্যারাইটি এণ্টারটেন্‌মেণ্টের। কিছু নাচ-গান-বাজনা আর সবশেষে ভূতোদার ম্যাজিক। কালিচরণবাবু ভূতোদাকেও বলেছিলেন তার বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনকে বলতে। ভূতোদা নেড়া, ক্যাবলা, গোবিন্দকে আসতে বলেছিল। আমি তো সাকরেদ হিসাবে আসবই। গজাকেও বলেছিল। কিন্তু সে ভাল ছেলে। বলে, না ভাই সন্ধ্যাবেলা আমার পড়া আছে। কাল আবার সংস্কৃত শব্দরূপ।

ভূতোদা রাগ করে বলে, বেশ বাবা বেশ। তোকে ম্যাজিক দেখতে হবে না। তুই বরং সারাটা সন্ধ্যাবেলায় হাহা শব্দরূপ মুখস্থ করিস, হাসা-হাহৌ-হাহাঃ!

চকমেলানো উঠোনের একপ্রান্তে আমরা কয়জনে মিলে চৌকি জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা স্টেজ বানালাম। তারপর টানা দিয়ে স্ক্রীন করা হল। একপাশে পর্দা দিয়ে বানালাম গ্রীনরুম। ম্যাজিক দেখাতে গেলে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই নেপথ্য কাজটা গোপনে করতে হয়। কিন্তু বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের কৌতূহল ঐ ঘেরটোপ ঘরখানার দিকে। ওখানে আমরা আগেভাগে কী-সব লুকিয়ে রাখছি তাই দেখা চাই ওদের। ভূতোদা আর আমি বারেবারে বললাম: এ রকম করলে আমরা খেলা দেখাতে পারব না। আমরা তেড়ে উঠলেই ওরা কেটে পড়ে—আবার কখন গুটিগুটি ঘনিয়ে আসে। উঁকি মারে পর্দার এপাশে। শেষ পর্যন্ত ভূতোদার নির্দেশমত আমি কালিবাবুকেই গিয়ে বললাম, জ্যাঠামশাই, ওরা যদি এই রকম করে, তাহলে কিন্তু আমরা খেলা দেখাতে পারব না।

কালিবাবু এসে কড়া ধমক লাগালেন বাচ্চাদের। বললেন, ফের যদি কেউ ওখানে উঁকি মারতে যাও তাহলে আমি তাকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দেব—ম্যাজিক দেখতে দেব না।

এতক্ষণে কাজ হল। ওরা সব্বাই মুখ কাঁচুমাচু করে পালালো। কিন্তু নতুন জামাইয়ের তাতেও হুঁশ হল না। তিনি তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ফিরে এসে উঁকি মারতে থাকেন। ভূতোদা দু-একবার রুখে উঠল। উনি হে-হে করে হেসে ওঠেন। যেন নির্লজ্জের মত হেসে উঠতে পারলেই সাত খুন মাপ।

আমি বলি, বল ভুদ্দা, আবার গিয়ে বলি কালিজ্যাঠাকে?

ভূতোদা বলে, তাতে কোন লাভ নেই। নতুন জামাই তো আর বাচ্চা ছেলে নয়, যে তাকে তালাবন্ধ করে রাখবার ভয় দেখানো চলে।

নতুন জামাইয়ের নাম অমলেন্দু। চৌখস ছেলে। চোখে মুখে কথা। কলকাতার মানুষ, তাই মফঃস্বলের ছেলেদের দিকে তাকাবার ভঙ্গিটা এরোপ্লেনের যাত্রী যেমন তাকায় নিচের দিকে। শিবুর জামাইবাবু বলে আমি একটু আলাপ করতে

গিয়েছিলাম প্রথমটায়। কিন্তু ওঁর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম : কলকাতার কোন্ অঞ্চলে থাকেন প্রশ্ন করায় বললেন, গ্যাঁড়াতলায়।

বললাম, সেটা আবার কোথায় ?

—গাঁয়ের মানুষ তোমাকে আমি কেমন করে বোঝাব বাওয়া ?

ম্যাজিকের কথায় আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, এই সব গাঁইয়া ম্যাজিকও বসে বসে দেখতে হবে ? বলে স্বয়ং পি সি সোরকারের ম্যাজিকই আমি চটপট ধরে দিই—

তারপর বেশ জমিয়ে শ্যালীবাহন সম্রাটের মত আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেন। কবে নাকি উনি নিউ এম্পায়ারে একেবারে হৈ-হৈ-কাণ্ড রৈ-রৈ-ব্যাপার করে তুলে-ছিলেন। ম্যাজিসিয়ান যে ম্যাজিক দেখায় অমলেন্দুবাবু পটাপট তা ধরে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত ওদের ম্যানেজার এসে অমলেন্দুবাবুর একেবারে হাতে পায়ে ধরতে থাকে। বলে, মশাই, গোটা সিজ্নের জন্য আপনাকে একটা বক্সের পাশ দিয়ে দিচ্ছি —এভাবে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙবেন না।

কালিবাবুর ছোট মেয়ে সীমা ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলে, কেমন করে আপনি বুঝতে পারলেন নতুনদা ?

—পিওর কমন সেন্স ! তাছাড়া আমিও ছেলেবেলায় ম্যাজিক শিখেছিলাম।

ভুতোদা আর থাকতে পারে না। পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে বলে, তাহলে আমি বলব, আপনি অন্যায় করেছিলেন। ম্যাজিসিয়ান কখনও অপরের খেলায় বাধা দিতে আসে না। ম্যাজিসিয়ানদের এটাই এটিকেট্।

অমলেন্দুবাবু খ্যাঁক খ্যাঁক করে খানিক হেসে নিয়ে বলেন, বুঝেছি ভাই, বুঝেছি। আচ্ছা বেশ, তোমার ম্যাজিক না হয় হাতেনাতে ধরে দেব না।

ভুতোদা বলে, না দেওয়াই উচিত যদি আপনি ম্যাজিসিয়ান হন। আর যদি পিওর কমনসেন্স দিয়ে ধরতে পারেন তাহলে ধরবেন।

শিবু ভুতোদার পক্ষ নিয়ে বলে, ভুতোদা দুর্দান্ত ম্যাজিক জানে নতুনদা, ওর সঙ্গে চালাকি চলবে না।

জামাইবাবু আবার হেসে ওঠেন, ভুতোদা ? ওর নাম কি ভুতো ? বাপস্ ! তাহলে তো সামলে কথা বলতে হবে। শেষকালে ভুত না লেলিয়ে দেয়।

ভুতোদা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমার পিতৃদত্ত নাম। আমার স্বোপার্জিত নয় আপনার 'নতুনদা' নামের মত।

—কেন নতুনদা নামটা খুব নতুন লাগছে বুঝি ?

ভুতোদা বলে, আজ্ঞে না। আমাদের ইন্দ্রনাথেরও একজন নতুনদা ছিল অনেকটা আপনারই মত। তবে সে গ্যাঁড়াতলার লোক নয়, দর্জিপাড়ার।

অমলেন্দুবাবুর বোধকরি রসগ্রহণ হয় না। একথাতেও না হলে হে-হে করে

হাসতেন না।

ভুতোদা সরে আসে পর্দার এপারে।

আমি বলি লোকটা অসভ্য।

ভুতোদা বলে, শুধু অসভ্য নয়, মুর্খও! শরৎবাবুর শ্রীকান্তখানাও পড়েনি।

পর্দার ওপাশের কথাবার্তা সবই কানে আসছে। একজন বলে, তা সে নাম যাই হোক না কেন, চৌখস ছেলে। ফুটবল-ক্রিকেট-হকি তিনটে খেলাতেই সিদ্ধহস্ত।

অমলেন্দুবাবু বলেন, তিন তিনটে খেলায় বয়েল্ড-হ্যান্ড! তবে তো বনগ্রামের স্বয়ং শিবাসম্রাট।

আমি বলি, যাই দু চার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি।

ভুতোদা বলে, যাগ্‌গে, মরুগ্‌গে!

সন্ধ্যা হতেই লোকজন সব আসতে থাকে সেজেগুজে। জামাইবাবুও সাজটা পাল্টে এলেন। চুনট করা ভুঁয়ে-লোটানো ধুতি। ঘিয়ে রঙের গরম পাঞ্জাবী, হীরের আংটি আর সোনার ঘড়ি। পাউডারের প্রলেপ সারা মুখে ঘাড়ে। ভুরভুর সেন্টের গন্ধ। শহরের গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে কালিচরণবাবু জামাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেন, আর গ্যাঁড়াতলার জামাইবাবু ধুতির কোঁচাসমেত হাতটি তুলে নমস্কার করে।

প্রোগ্রাম শুরু হল। নেড়ার বোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল; পাড়ার একটি মেয়ে বাজালো সেতার। আমি বসেছিলুম জামাইবাবুর ঠিক পিছনেই, বন্ধুদের নিয়ে। ভদ্রলোকের যেন কিছুই পসন্দ হয় না। এর চেয়ে ওঁর ছোট বোন নাকি ভাল গায়, এক বান্ধবী ভাল বাজায়। ন্যাড়া আমার কানে কানে বলে, এক নম্বর চালবাজ!

মালোপাড়ার নবীন জোয়ান্দার ভাল মাউথ অর্গান বাজায়। তারও একটা আইটেম ছিল। ভারি সুন্দর বাজালো নবাদা—'দূর দেশী সেই রাখাল ছেলে'।

শুনে গ্যাঁড়াতলার জামাইবাবু বললেন, ছোকরার দম নেই, স্কেল ঠিক থাকে না।

নেড়া আর নিজেকে সামলাতে পারে না। বলে, আপনি গানের স্কেল বোঝেন?

ঘাড় ঘুরিয়ে জামাইবাবু নেড়াকে এক নজর দেখে নেন। সিল্কের একখানা সুগন্ধি রুমাল বার করে ঘাড়টা মুছে নিয়ে বলেন—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আমার মাউথ অর্গান শুনে স্যার রবার্ট ক্রফোর্ড আমার অটোগ্রাফ নিয়ে গিয়েছিলেন—

গোবিন্দটা গবেট। বলে, রবার্ট ক্রফোর্ড কে?

—তোমরা চিনবে না। নিউ অর্লিন্সের টেলিভিশান প্রডিউসর। আমাকে বলেছিলেন, কেন পড়ে আছ কলকাতায়। চলে এস ম্যারিকায়। টেলিভিশানে রেগুলার প্রোগ্রাম তোমার বাঁধা।

—তা গেলেই পারতেন ?

—যাব। নেক্সট সামারে।

নেড়া ছাড়বার পাত্র নয়; বলে, তা আমরা তো আর ম্যারিকা যাব না। আপনার টেলিভিশান প্রোগ্রামও শুনতে পাব না। আমাদের একটু শুনিয়ে দিন না আজ।

—সরি ! আমি তো মাউথ অর্গানটা আনিনি।

—কেন ঐ নবাদার অর্গানেই বাজান !

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠেন জামাইবাবু। যেন কী বোকার মত কথাটাই না বলেছে নেড়া। বলেন, তোমাদের ঐ মালোপাড়ার মালোমশায়ের এঁটো অর্গান বাজাব আমি ! তোবা তোবা !

কান-এঁটো-করা হাসি হাসেন জামাইবাবু।

ভুতোদাকে কানে কানে বলি, শুনছ ?

ভুতোদা শুধু বললে, কপালে অনেক দুঃখ আছে রে !

আমি বলি, কার ?

—কার আবার ? শিবুর বড়দির। ভূ-ভারত খুঁজে কী জামাই-ই এনেছেন কালিজ্যাঠা ! একেবারে ঠুনু ঠুনু পেয়ালা।

সবশেষে ভুতোদার প্রোগ্রাম। শুরু হল খেলা। জামাইবাবুকে ডাকতে হল না, নিজেই স্টেজে উঠে এসে তালাস করলেন ওর জামার পকেট, আস্তিন, টেবিলের তলা। তবু হারানো আংটি তাঁর পকেট থেকেই উদ্ধার করে আনলুম আমি। জামাইবাবু অপ্রস্তুত হলেন।

কিন্তু মনে হল, ভদ্রলোক আর কিছু শিখুন না শিখুন ম্যাজিক খানিকটা সত্যিই শিখেছিলেন। দু-একটা খেলা উনি ধরে ফেললেন। ভুতোদা যে চটেছে, তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারি। মুখে সে কিছু বললে না।

তাছাড়া চ্যাটাং চ্যাটাং কথা লেগেই আছে। সব কিছুতেই ফোড়ন কাটার স্বভাব। ভুতোদা দর্শকদের সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করল, যে কোন একটা অসময়ের ফলের নাম করুন। আমি খাওয়াব।

সেটা অগ্রহায়ণ মাস। জামাইবাবু ফস্ করে বলেন, তোমার নাম শুনে একটি মাত্র ফলের কথাই মনে পড়ছে ভাই। তাই খাওয়াও। ভুতো-বোম্বাই !

সকলে হোহো করে হেসে ওঠে। ভুতোদা রাগ করেছে কিনা বোঝা যায় না। একটা খালি টুপী সকলকে দেখিয়ে রুমাল দিয়ে সেটা চাপা দেয়। লাঠি বুলিয়ে কিছু মন্ত্র পাঠ করে। তারপর জামাইবাবু এসে রুমালের ঢাকাটা খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে সত্যিই একটা বোম্বাই আম। সকলেই চমৎকৃত ; শুধু জামাইবাবু বলেন, এটা বোম্বাই আমই মনে হচ্ছে ; কিন্তু ভুতো-বোম্বাই কিনা বুঝব কেমন করে ?

ভুতোদা বললে, 'ভুতোর ভৌতিক বোম্বাই' ইতি মধ্যপদলোপী ভুতো-বোম্বাই —সহজ সমাধান।

সবাই খুশী হল। ওর নাম নিয়ে বারে বারে রসিকতা করায় সে যে অফেন্স নেয়নি এতে নিশ্চিন্ত হল সকলে। জামাইবাবু বলেন, আচ্ছা এবার মজঃফরপুরী লিচু খাওয়াও দেখি।

ভুতোদা সে কথায় কর্ণপাত না করে স্টেজের সামনে এগিয়ে আসে। কালিচরণবাবুর দিকে ফিরে বলে—জ্যাঠামশায়, আপনি বোধহয় আপনার জামাইকে পেট ভরে খেতে দিচ্ছেন না। খেলা দেখানো শেষ হয়ে গেছে, উনি এখনও খাই খাই করছেন।

এবার দ্বিগুণ জোরে হেসে ওঠে সকলে। জগদানন্দবাবু বলেন, বেশ বলেছ বাবা ভুতনাথ। কালিভায়া তুমি একটি পেটুক জামাই এনেছ।

অমলেন্দুবাবু অপ্রস্তুতের একশেষ। ফিরে এসে বসেন নিজের আসনে; কিন্তু অত সহজে হার মানবার পাত্র নন তিনি। বলেন, যতসব ফোর-টোয়েণ্টির কারবার।

ধক্ করে জ্বলে ওঠে ভুতোদার চোখ দুটো। আমার মনে হয়—এই সেরেছে। পাগলা খেপল বুঝি এবার। শিশুপাল বধ হয় বুঝি এতক্ষণে। ভুতোদা বলে—ফোর-টোয়েণ্টি মানে? কি বলতে চান আপনি?

—ফোর-টোয়েণ্টি মানে বোঝ না? জুয়াচুরি। তুমি হাতসাফাই করে আগেই আম রেখে দিয়েছিলে টুপির ভিতর।

ভুতোদা বলে, তা তো বটেই। আপনি কি ভাবছিলেন? হাঁস যেমন ডিম পাড়ে, টুপি তেমনি আম পেড়েছে? গাঁ্যাড়াতলার মানুষ হয়ে আপনি এটুকু বোঝেন না?

আবার সবাই হেসে ওঠে উচ্চস্বরে। জামাইবাবুর রঙটা ফর্সা। মুখটা টকটকে লাল হয়ে ওঠে অপমানে। বলেন, ছোঃ! একে আবার ম্যাজিক বলে নাকি? আমি ভেবেছিলুম ভুতোর খেলা বুঝি সত্যিই ভূতের খেলা। এতো সবই শুধু ফোর-টোয়েণ্টির কারবার।

এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারি ভুতোদা চটেছে। চটে বেগুন হয়ে গেছে। বললে, দেখুন অমলেন্দুবাবু, লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়। বাপ-মা আমার নাম ভুতনাথ দিয়েছিলেন, আমি তো তাতে লজ্জার কিছু দেখি না। তা সে যাক্‌গে মরুগ্‌গে। ভূতের খেলা দেখতে চান আপনি? ভূত দেখবেন? তাও দেখাতে পারি আমি।

ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে সবাই নির্বাক। ভুতোদা আবার বলে, ভূত দেখে দাঁত-কপাটি লাগবে না তো?

জামাইবাবু বলেন, ভয়? আমার অভিধানে ও শব্দটা নেই।

ভূতোদা বলে, বেশ, এখন ভুতের খেলাই দেখাব তাহলে। অবশ্য যাঁদের হার্টের ব্যারাম আছে তাঁরা এবার ঘরে যান।

কেউই উঠে গেল না। সবাই বুঝতে পারে, এসব নেহাৎ রসিকতা। ভূতোদা বললে, আমাকে খান ছয়েক চিনামাটির বড় প্লেট দিতে হবে। এ খেলা দেখানোর প্রোগ্রাম ছিল না। নেহাৎ জামাইবাবু ভূত দেখতে চাইছেন, তাই—

জগদানন্দবাবু বলেন, তোমার ব্যবস্থা করতে কতক্ষণ লাগবে ?

—দশ মিনিট। ততক্ষণ আমার এ্যাসিস্টেন্ট খেলা দেখাবে।

আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, দশটা মিনিট তুই ম্যানেজ করে দে বলিবর্দ। গ্যাঁড়াতলার জামাইবাবুকে আজ ন্যায্য ভূত দেখিয়ে ছাড়ব। স্রেফ কালিয়া পিরেৎ !

বলিবর্দ ! খাঁটি সংস্কৃত গাল। তবে তো মেজাজ ঠিক আছে ভূতোদার।

গ্যাঁড়াতলার জামাইবাবুর সামনে খেলা দেখাতে সত্যিই ভয় ভয় করছিল। আমার। তবু গুরুর কৃপায় ধর্মে ধর্মে দশটা মিনিট আমি ম্যানেজ করে দিলাম ঠিকই। ওদিকে ভূতোদা ততক্ষণ খান ছয়েক চিনামাটির প্রমাণ সাইজ ডিনার প্লেট নিয়ে গ্রীনরুমের ভিতর কী সব প্রক্রিয়া করছিল। আমার খেলা দেখানো শেষ হতেই সে বেরিয়ে এল স্টেজে। বললে, আমি রেডি! এখন স্টেজে ভূত নামাবো। কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে।

—কী শর্ত ?

—প্রথম কথা, আমি যখন বাতি নিভিয়ে দেব তখন কেউ টর্চ জ্বালাবেন না। দ্বিতীয় কথা, যখন কেউ ভূত দেখতে পাবেন কোন শব্দ করবেন না।

জগদানন্দবাবু বলেন, ভূতকে কি শুধু দেখতেই পাওয়া যাবে ? সে কি কোন কথা বলবে না ?

ভূতোদা বলে, বলেন কি দাদু ? ভূত মাত্রেই বাচাল; কথা না বলে ওরা থাকতেই পারে না। ভূত কথা বলবে, হাঁটবে, হাসবে—

জামাইবাবু রসিকতা করেন, নাচবে না ?

ভূতোদা তৎক্ষণাৎ বলে, আলবৎ। ঘুঙুর এনে দিন, ভূতকে নাচিয়ে ছাড়ব।

ভূতোদা বলে কি ? এ খেলা তো সে আগে কখনও দেখায়নি।

ভূতোদা বলে, লাইট অফ্ !

আমি সুইচ টিপে তৎক্ষণাৎ স্টেজ অন্ধকার করে দেই। ভূতোদা একটা মোমবাতি জেলে রাখল টেবিলের উপর। আবছা আলোয় রঙ্গমঞ্চটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। ভূতোদা বললে, খান ছয়েক চেয়ার প্লিজ।

আমি নেড়া আর ক্যাবলা হাতে হাতে খান ছয়েক চেয়ার তুলে দিলাম স্টেজের উপর।

ভুতোদা বলে, এখন আপনাদের মধ্যে থেকে ছয়জন খুব সাহসী লোক স্টেজের উপর উঠে আসুন।

সর্বসমক্ষে সাহস দেখাবার এমন মওকা ছাড়ব কেন ? আমরা চার বন্ধুই উঠে এলুম স্টেজে। ভুতোদা বলে, না, তোমাদের দিয়ে হবে না! শেষে জামাইবাবু বলবেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ।

অগত্যা আমরা আবার নেমে এলাম। জনা ছয়েক দর্শক উঠে যান আবার স্টেজের উপর। বলা বাহুল্য অমলেন্দুবাবু এলেন সবার আগে। ভুতোদা বলে, একটা কথা। অন্ধকারের ভিতর আমাকে আপনারা দেখতে পাবেন না। আমিও আপনাদের দেখতে পাব না, কিন্তু আমার নির্দেশ আপনাদের ঠিক ঠিক মানতে হবে, কথা দিন।

ওঁরা সকলে স্বীকৃত হলেন। ভুতোদা তখন ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়। ঘন আঁধারে ঢেকে গেল সব। কেউ কাউকে আর দেখতে পাচ্ছে না। তারপর শুরু হল ভুতোদার নির্দেশ। তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ভুতোদা বলছে, আপনারা ছয়জন ডান হাত টেবিলের উপর রাখুন। হাত মুঠো করুন। বাঁ হাত বুকের উপর রাখুন। এবার বলুন : অং বং ছুটুং!

এই ভাবে মিনিট তিনেক আনুবান নির্দেশ দিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, আলো জ্বালো!

আমি আলো জেলে দিই। সবাই বলে, কই, ভুত কই ?

ভুতোদা বিস্মিতভাব দেখিয়ে বলে, সে কি ? ভুত দেখেন নি ?

—কই না ?

—জামাইবাবু আপনিও দেখেন নি ?

—জামাইবাবু একগাল হেসে বলেন, অন্ধকারে দেখতে পাইনি, তবে আলোর মধ্যে পাচ্ছি। ভুত নয় ভুতো!

লেবু বেশী কচলালে তেতো হয় বলেছিল ভুতোদা, কিন্তু সেই তেতো লেবু কচলালে কি হয় তা আর তখন বলেনি। কিন্তু ভুতোদার নির্বিকার মুখখানা দেখে আমার মনে হল, বুঝি বজ্রাঘাত হয়। ভাল মানুষের মত সে বলে, আচ্ছা তাহলে আবার একবার চেষ্টা করি। বাতি নেভাও।

আবার আমি বাতি নিভিয়ে দিই। আবার শুরু হল ভুতোদার আবোল-তাবোল নির্দেশ : এই ছয়জনকে আমি ছয়খানি চিনেমাটির প্লেট দিচ্ছি। ধরুন। ধরেছেন তো ঠিক ? এখন আপনারা কোলের উপর প্লেটখানি রাখুন। উপুড় করে রাখবেন কিন্তু, চিৎ করে নয়। রেখেছেন ? এখন ধীরে ধীরে ঐ মন্ত্রঃপূত আধারের উপর দুটি হাতের তালু বুলাতে থাকুন আর মনে মনে বলতে থাকুন; ক্লিং ক্লিং ওসাকাচাটাম্বু-ওনা মাসি চং!

আমি তখন মনে মনে ভাবছি—ব্যাপারটা আসলে কি ? কী করতে চায় ভূতোদা ? এত সহজে সে কেমন করে ভূত নামাবে স্টেজের উপর ? ব্ল্যাক-আর্টের খেলা ভূতোদা মাঝে মাঝে দেখাতো। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবছায়া আলোয় কঙ্কালের নৃত্য। আমি স্বয়ং সেই কঙ্কাল। কিন্তু তার ফৈজত অনেক। সেসব ব্যবস্থা তো কিছুই করা হয়নি। আমাকেও তো নেংটিসার হয়ে সারা গায়ে সাদা রঙ মাখতে হয়নি। আমার মত আজ্ঞাবাহী ভূত তো ভূতোদার দ্বিতীয়টি নেই। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূতের আবির্ভাব হবে, আর আমিই টের পাব না ? আমাকে বাদ দিয়ে যদি ভূতোদা অন্য কোন নেংটি-সার ভূতের আমদানী করে থাকে তবে দুই ভূতে ডুয়েল লড়ে যাব আমরা !

ওদিকে ভূতোদা তখনও এক নাগাড়ে নির্দেশ দিয়ে চলেছে : হ্যাঁ, এখন দুহাতে মুখ ঢাকুন। চোখ বন্ধ—মুঠো খোলা। ব্যস্ ! রগের দুপাশ টিপে ধরুন। এখন আঙ্গুলগুলো উপর থেকে নিচের দিকে নামবে। হেডেক হলে যেমন ভাবে মাথা টেপা হয়। করছেন ? এখন মনে মনে ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণ করুন : হ্রীং দ্রিং হিম্ব-ডিম্ব-জিম্বো—গুরুজি চিত্তং !

জামাইবাবুর আর সহ্য হল না। ক্ষেপে উঠে বলেন, দুত্তোর ! যতসব বুজরুকি ! বোঝা গেছে তোমার কেরামতি। নাও আলো জ্বাল এবার।

ভূতোদা অন্ধকারের মধ্যেই বলে, এ কি ! আপনি কথা বললেন কেন ?

—বেশ করেছি, বলেছি। আর ভূত দেখার শখ নেই আমার। আলো জ্বাল বরং ভূতো দেখি। তোমার এই ফোর-টোয়েণ্টির কারবার বন্ধ কর। আমি কথা বলেছি এই ছুতো দেখিয়ে ববং বল—তাই ভূত এল না।

ভূতোদা বলে, তা কেন ? আপনি শর্ত ভেঙেছেন, তাই আপনি ভূত দেখতে পাবেন না। আর সবাই তো শর্ত ভাঙেনি। তারা না হয় দেখুক ! লাইট অন্ !

আমি বিজলি বাতি জেবলে দিলুম।

ভূতোদা দর্শকদের দিকে ফিরে একটা ম্যাজিসিয়ানি 'বাও' করে বললে, আপনারা ভূত দেখতে পাচ্ছেন ?

প্রথমটা কয়েক সেকেণ্ড সকলেই হতভম্ব। তারপর হঠাৎ একটা সোরগোল পড়ে গেল। হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে। একবাক্যে সবাই বলে, হ্যাঁ।

ভূতোদা গম্ভীরভাবে বলে, মিলিয়ে দেখে দিন। ভূত কথা কইছে, হাসছে।

সবাই ভীষণ হাসছে। আর সবচেয়ে বেশী হাসছে কালিচরণবাবুর ছোট মেয়ে সীমা।

আসলে হয়েছে কি—ছয়খানি প্লেটের একখানির উল্টো পিঠে ছিল শুকনো ভুষোকালি। প্রদীপের শিখার উপর ধরা কালো কালি। অন্ধকারের মধ্যে সেই

প্লেটখানাই ভূতোদা কায়দা করে চালান করেছিল অমলেন্দুবাবুকে। জামাইবাবু অন্ধকারের মধ্যে প্লেটের উপর সযত্নে হাত বুলিয়েছেন ওসাকাচাটাম্বু মন্ত্রে— অর্থাৎ দু-হাতের তালুতে মেখেছেন ভুষোকালি। তারপর হিম্ব-ডিম্ব-জিম্বো মন্ত্রে সেই নিজের হাতে কালি মেখেছেন কপালে মুখে-গালে।

ঘিয়ে রঙের গরম পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম, চুনট করা ধুতি আর ফর্সা পাউডার-মাখা মুখে ভুষোকালির প্রলেপ। সে যে কী খোলতাই বাহার তা আর কী বলব !

সবাই ভীষণ হাসছে। অমলেন্দুবাবুর স্ত্রী—নববধূ ; শাড়ি ঝলমল করতে করতে একরকম ছুটেই পালালো।



তো-তো-তোমাকে আমি

সীমা তার শাড়ির আঁচল চেপে ধরে বলে, দিদি, কোথায় পালাচ্ছো ?

ভূতোদা বলে, শুভ কাজে বাধা দিও না সীমা। জামাইবাবু ভূতের নাচ দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দিদি বোধহয় ঘুঙুর আনতে যাচ্ছেন।

অমলেন্দুবাবু শালীকে ধমক দেন, কী বোকার মত হ্যা হ্যা করে হাসছ শুধু শুধু ? ভূত সত্যি দেখতে পেয়েছ তুমি ?

সীমা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে, বলে, দেখেছি কি বলছেন জামাইবাবু ? এখনও দেখছি। স্রেফ কালিয়া পিরেৎ !

সীমার আর এক বোন ততক্ষণে একটা হাত-আয়না নিয়ে এসেছে। সেটা জামাইবাবুর মুখের সামনে মেলে ধরে বলে, সবাই যখন আশ মিটিয়ে ভূত দেখল, তখন আপনিও একটু দেখুন।

আয়নায় ভূত দেখেই জামাইবাবুর চক্ষুস্থির। রাগে গ্যাঁড়াতলার জামাইবাবুর তোৎলামি শুরু হয়ে গেল। ভূতোদার দিকে ফিরে বলেন, তো-তো-তোমাকে আমি—

ভূতোদা ফরাসী কায়দায় নিচু হয়ে তাঁকে 'বাও' করলে একটা।

রবি বলে টু-কি



—'রবি' বলে টু-কি !

বলেই ঝোপের মধ্যে বসে পড়ে মৌ। তারপর পাতার ফাঁক দিয়ে দেখে রবির কাণ্ডকারখানা। সে ওকে খুঁজে বার করতে পারে কি না। রবি তার লেন্স-চোখের উপর থেকে হাতটা সরায়। ইতিউতি চাইতে থাকে। খুঁজছে মৌকে। বাড়ির পিছনে মস্ত বাগান, বড় বড় গাছ, ছয় বছরের মৌ কোথায় লুকিয়ে বসে আছে তা খুঁজে বার করা সহজ কাজ নাকি? কিন্তু রবি হচ্ছে রবি! যেমন প্রকাণ্ড তার দেহ, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি। বড় বড় অঙ্ক সে নিমেষে কষে দেয়। শুধু গুণ-ভাগ-বর্গমূল-ভগ্নাংশই নয়-বীজগণিত-জ্যামিতি পর্যন্ত সে গুলে খেয়েছে! কী জানি কেমন করে অঙ্ক কষে সে বুঝে নেয়—কোন্ ঝোপের আড়ালে চুপ্‌টি করে বসে আছে মৌ। গোদা গোদা পা ফেলে আড়াই মিটার লম্বা দেহটা নিয়ে রবি সোজা এগিয়ে আসে ঐ ঝোপটার দিকে। আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই।

একলাফে বেরিয়ে আসে মো। ছুট-ছুট-ছুট—কিন্তু পঁচকে মো রবির সাথে পারবে কেন ? দৈত্যের মত প্রকাণ্ড পা ফেলে রবি ছুটে আসে তার আগেই। মো দৌড়াতে-দৌড়াতেই ধমক লাগায়—'বা-রে ! তুমি অত জোরে ছুটলে আমি খেলব না কিন্তু !'

কে কার কথা শোনে ! ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসে রবি। যে আমগাছটা ওদের লুকোচুরি খেলার 'বুড়ি', সেটা এখনও অনেক দূরে। বাধ্য হয়ে মো এবার তার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে, '—রবি ! স্টপ। থেমে যাও !'

ঝড়াং-ঝং ! একটা যান্ত্রিক শব্দ করে শ্রীমান রবি একেবারে স্ট্যাচু ! ব্যস ! সেই অবকাশে মো গিয়ে বুড়ি ছুঁয়ে দেয়। আর তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়ে সে নাচতে থাকে—'এ রাম ! হেরে গেলো ! হে—রো ! দুয়ো দুয়ো।'

তোমরা হলে নিশ্চয় বলতে, 'খেলব না ! এ-তো জোচ্চুরি !

রবি কিন্তু তা বলল না। মুখ কাঁচুমাচু করে বেচারি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। গো-হারা হেরে যাবার ভঙ্গিতে। আবার তাকে 'চোর' দিতে হবে। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। ইতিমধ্যে খেয়ালী মেয়ে মো-এর মত বদলেছে। বললে, 'এই রবি ! আর লুকোচুরি নয়। এবার হেট্-ঘোড়া-হেট খেলব। কেমন ?'

রবি তাতেও রাজী। চার হাতে-পায়ে সে ঘোড়া সাজে ! মো চড়ে বসে তার পিঠের উপর। রবির পিঠটা স্টেনলেস্-স্টিলের। কিন্তু মো-এর বাবা তার উপর একটা ডান্‌লোপিলোর হাওদা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই ঘোড়ায় চড়তে মো-এর কোন অসুবিধা হয় না। দিব্যি ছপ্‌টি মারতে মারতে হুকুম চালায়—'হেট্-ঘোড়া ! হেট !'

গরিলার মত প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে রবি এবার হামাগুড়ি দিতে থাকে। সূর্যের আলোয় তার স্টেনলেস্-স্টিলের দেহটা চক্‌চক করছে।

তোমরা বোধ হয় রবিকে চিনতে পারছ না, নয় ? সেটাই স্বাভাবিক, কারণ রবির মতো জীব তোমরা দেখনি। রবি একজন রোবট। গল্পটা আগামী যুগের। ২০১৯ খ্রীস্টাব্দের। ব্যাপারটা বুঝলে তো ? আজ থেকে চল্লিশ বছর পরের কথা। শুধু মো নয়, তোমাদের সব্বাই-এর মাথা তখন হয় ধবধবে নয় চকচকে। মানে, হয় পাকা চুলে, নয় টাকে !

রবির জন্ম জাপানে। 'হিতাচি গ্রুপ অব রোবটিক্স' কারখানায়। মোয়ের বাবা নরেনবাবু তাকে জাপান থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন অনেক টাকা খরচ করে। আসলে রবি হচ্ছে প্রথম যুগের রোবট, যন্ত্র-মানুষ। জাপানী কারখানায় সে বড় বড় অঙ্ক কষত। তারপর রোবট-শিল্প উন্নততর হল। নতুন জাতের রোবট কথা বলতে শিখল। তখন কারখানার কর্তাব্যক্তিরা এই পুরানো মডেলের বোবা রোবটটিকে ভেঙে ফেলতে চাইলেন। মোয়ের বাবা এঞ্জিনিয়ার, তিনি 'রোবোটিক্স-বিজ্ঞান' শিখতে

অর্থাৎ যন্ত্রদানব তৈরি করার কায়দা শিখতে জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে কারখানার কর্মকর্তারা শেষপর্যন্ত ঐ রোবটটিকে না ভেঙে ফেলে সেটা নরেনবাবুকেই বেচে দেন। নরেন্দ্রনাথ দেশে ফেরার সময় তাকে নিয়ে আসেন। এতদিনে কলকাতার কাছাকাছি ভারত সরকার রোবট তৈরির একটা কারখানা খুলছেন। নরেনবাবু সেই কারখানার প্রোডাকশান ম্যানেজার! রবিকে কিন্তু তিনি কারখানায় রাখেন নি। রেখেছেন বাড়িতে, মৌয়ের খেলার সাথী হিসেবে।

রবির ওজন এক টন। প্রকাণ্ড বড় দেহ তার। হাত-পা-মাথা সবই আছে, তবে পুতুলের মতো, মানুষের মতো নয়। চোখ আছে, লেন্সের—সে দেখতে পায়। নাক নেই, সে নিশ্বাস নেয় না। মুখও নেই—কারণ সে না বলে কথা, না খায় খাবার। তবে নাকের কাছে একটা 'ভোল্টমিটার' থাকায় নাক-মুখের একটা আদল আছে। মোট কথা, ওর চেহারা—কিম্ভুত! যেন কারখানা নয়, 'হযবরল' অথবা 'আবোল-তাবোল'-এর পাতায় ওর জন্ম। 'ট্যাস্‌গরু, কুমড়ো পটাস, হাতিমির জাতভাই! ওর পেটে স্ক্রু দিয়ে আঁটা একটা লোহার পাত আছে। ট্রান্সিস্টারের মতো সেই প্লেটটা খুলে ওর পেটে ব্যাটারি ভরে দিতে হয়। সেটাই ওর প্রাণ। কথা 'বলতে না পারলেও সে বুঝমান, কথা বোঝে। হাত পা ঘাড় নেড়ে সে সায় দেয়। খুশি হলে হাততালি দিয়ে ধেই ধেই করে নাচে। দুঃখ হলে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসে। ওর লেন্স-চোখ থেকে জল বার হয় না, তবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার অঙ্গভঙ্গি করতে জানে। অঙ্কটাই ও বিশেষভাবে জানে। শুধু মৌয়ের নয়, মৌয়ের বাপের দেওয়া অঙ্কও ও ঝড়াঝড় কষে দেয়। ঘরের নানান কাজকর্ম জানে, করেও। বাজারেও যেতে পারে। কিন্তু বাজারের লোকে ওকে ভয় পায়। তাই তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। মারলে সে ব্যথা পায় কি না? তা জানি না বাপু। চল্লিশ বছর পরে তো আমি থাকব না। তোমরা তখন রবিকেই জিজ্ঞাসা করে নিও বরং।

রবি ওদের বাড়িতে আছে প্রায় বছর খানেক। মৌ ওকে নিয়ে মেতে আছে। রবি ওর জ্যান্ত পুতুল। তার সঙ্গে ওর হাসি, খেলা, মান-অভিমান গপ্প, সব কিছু। মৌয়ের বন্ধুরা রবিকে ভয় পায়। তারা ওদের বাড়িতে আর আসে না। না আসুক, তাতে ভারী বয়েই গেল মৌয়ের। রবি থাকতে তার ভাবনা কি? রবির সঙ্গেই সে লুকোচুরি খেলে, পুতুল খেলে, রবি কখনও ওর বাড়ির চাকর, কখনও ড্রাইভার, কখনও ছেলে, কখনও ঘোড়া। এমন বুদ্ধিমান জ্যান্ত পুতুল থাকতে কে আর বন্ধুর পরোয়া করে?

এটা কিন্তু পছন্দ হত না সরমার, মানে মৌয়ের মায়ের। তিনি লক্ষ্য করে দেখছেন—রবি আসার পর থেকে মৌ তার বন্ধু-বান্ধবদের একেবারে পাত্তাই দেয় না! একা একাই থাকতে চায়। এটা তো ভাল নয়। দু একবার তিনি এ নিয়ে অনুযোগও করেছেন মৌয়ের বাবার কাছে। কিন্তু তিনি কান দেননি। বলতেন,

'আরে বাপু, একটা কুকুর বেড়াল পুষলেও বাচ্চারা ঐ রকম করে। বড় হক, তখন মৌ নিজেই বুঝবে—রবি একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র। কলের পুতুল মানুষ নয়।'

হয়তো তাই হত; কিন্তু ভাগ্যের তা নির্দেশ নয়। ঘটনাচক্রে ঐ সময় কলকাতায় একটা ফিল্ম এল—'যন্ত্রদানব'। তাই নিয়ে শহরে কী হৈ-চৈ! সিনেমার গল্পটা একটা রোবটকে নিয়ে। তার কী একটা যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় সে নাকি 'দানব' হয়ে গেল। 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর মতো। তিন চারটি বাচ্চাকে সে নৃশংসভাবে হত্যা করল। শেষ-মেষ, সিনেমার নায়ক ঐ যন্ত্রদানবের সঙ্গে লড়াই করে তার গায়ের একটা ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে দিতেই সে যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেল। একেবারে আষাঢ়ে গল্প, কিন্তু সেই সিনেমাটা উপলক্ষ্য করেই মৌদের সংসারে শুরু হয়ে গেল নানান জাতের অশান্তি।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সরমা একদিন নরেনবাবুকে বললেন, 'আর তো পারা যায় না। তুমি এবার আপদটকে বিদায় কর। রবিকে বিক্রি করে দাও।'

নরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলেন, 'কেন? কী হ'ল? রবির কি দোষ?'

'—দোষের কথা হচ্ছে না, কিন্তু দেখছ তো, ঐ 'যন্ত্রদানব' সিনেমাটা আসার পর থেকে আত্মীয়-বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করেছে। সবাই রবিকে ভয় পায়। কাল টেলিভিশনে ছবিটা দেখিয়েছে। আর আজ সকালে দুধওয়ালা, ধোপা, খবরের কাগজ-ওয়ালা সবাই আমাকে জবাব দিয়ে গেছে। ওরা আর কেউ আমাদের গেটের ভিতর ঢুকবে না।

নরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'কী আশ্চর্য! গল্প গল্পই!'

'—সে কথা কে শুনছে বল? তাছাড়া মৌ যে রোবটটাকে দিনরাত অমন করে আঁকড়ে পড়ে আছে সেটাও আমার ভালো লাগে না! ওর বয়সী ছেলে-মেয়েরা কেউ ওর সঙ্গে খেলতে আসে না। এটা কি ভাল। আমার ভয় হয়, রবির কোন কলকব্জা বিগড়ে গেলে সেও যদি মৌয়ের গলা টিপে—

কথা তিনি শেষ করতে পারেন না। সিনেমায় দেখা কোন বীভৎস দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শিউরে ওঠেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ সরমা, আমি ঐ রোবট-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করছি। প্রতি মাসে আমি রবির অয়েলিং ক্লিনিং করি। আমি জানি—সে কোনদিনই অমন পাগলামি করবে না। সে মৌকে ভালবাসে।'

'—ভালবাসে! তুমি কি পাগল? যন্ত্র কখনও ভালবাসতে পারে।'

নরেন্দ্রনাথ হতাশভাবে মাথা নাড়েন। এ প্রশ্নের জবাব তাঁর জানা নেই। বিজ্ঞান এখনও ওটা প্রমাণ করতে পারেনি। রোবটের কোন অনুভূতি আছে কি না।

'—শোন আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। এটাকে আজই বিদায় কর তুমি।'

নরেন্দ্রনাথ কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি জানেন, রবিই হচ্ছে মৌয়ের প্রাণ। রূপকথার সেই প্রাণ-ভোমরার মতো। তাকে হারালে মৌ কেঁদে

কেটে অনর্থ বাধাবে। হয়তো মনের দুঃখে—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্রী দুর্ঘটনায় তাঁকে রাজী হতে হল। সরমার এক বান্ধবী এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। রবির কথা তিনি কিছু জানতেন না। 'কলিং বেল' বাজতে রবিই প্রথম সদর দরজা খুলে দেয়। ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করে ওঠেন। 'যন্ত্রদানব' সিনেমাটা তিনি সম্প্রতি দেখেছেন। সিঁড়ির মুখে অমন একটি বিচিত্রদর্শন আপ্যায়ণকারীকে দেখতে পেয়ে তিনি ছুটে পালাতে যান, এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। বেচারি রবি। সে আবার যত্ন করে ভদ্রমহিলাকে ধরে তুলতে যায়। ফলে তিনি একেবারে ফ্ল্যাট! অজ্ঞান! রবি তো অপ্রস্তুতের একশেষ! সেদিনই সরমা নরেন্দ্রনাথকে রাজী করালেন।

দিন সাতেক পরে অফিস থেকে ফিরে এসে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যায় একটা লরি এসে রবিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মৌকে—'

সরমা বাধা দিয়ে বলেন, 'না। ওর চোখের সামনে আপদটাকে বিদায় করা যাবে না। তুমি বরং কায়দা করে কাল বিকালে মৌকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও।'

সেই মতই ব্যবস্থা হল। পরদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চল্ মৌ আজ আমরা সার্কাস দেখতে যাব। দু'খানা টিকিট কেটে এনেছি।'

সার্কাসের নামে মৌ তো একপায়ে খাড়া। বলে, 'রবিকেও নিয়ে যাব বাপি?'

'—নারে। রবিকে ওরা ঢুকতে দেবে না।'

মৌয়ের মুখ ভার হয়। বলে, 'তবে থাক। রবি তাহলে সারাটা সন্ধ্যা কার সাথে খেলবে?'

সরমা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মৌকে রাজী করালেন। মৌ এক বেলা ধ'রে রবিকে বোঝালো—'কী করব বল, রবি? তোকে যে ওরা ঢুকতে দেবে না! আমি বরং ফিরে এসে সব গল্প তোকে করব। কেমন? রাগ করলি না তো?'

রবির লেন্সের চোখদুটো পিট্ পিট্ করল! তার তীক্ষ্ন বুদ্ধি দিয়ে সে বোধ করি সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু বোবা তো! তাই বলতে পারছে না। বাবার সঙ্গে সেজেগুজে মৌ গেল সার্কাস দেখতে। বেচারি জানতেও পারল না—জোকারের ভাঁড়ামি দেখে সে যখন খিল্‌খিল্ করে হাসছে ঠিক তখনই ওদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো একটা ট্রাক—বোবা রবিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে।

সার্কাস দেখে মৌ ফিরে এল নাচতে নাচতে। রবিকে এখন সব খেলার গল্প-গুলো শোনাতে হবে—ঘোড়া-হাতী-বাঘ-ট্রাপিজের খেলা, জোকারের বারে বারে আছাড় খাওয়ার গল্প। গাড়ি থেকে নেমেই মৌ চিৎকার করতে থাকে—'রবি! রবি বলে টু—কি!'

রবির সাড়া নেই। মৌ দেখতে পায় ওর মা দাঁড়িয়ে আছেন সদর দরজার কাছে। তাঁর কোলে কী সুন্দর ফুটফুটে একটা কুকুর ছানা। মৌ তো অবাক। ওর মা বলেন,

'এই দেখ মৌ। তোরা সার্কাস দেখতে গেলি, আর এদিকে এই কুকুরছানা এসে হাজির!'

বুদ্ধিটা নরেন্দ্রনাথের। কুকুরছানাটা তিনিই কিনেছেন মৌয়ের জন্য। কথা ছিল লরিটা যখন রবিকে নিয়ে যাবে তখন এই কুকুর বাচ্চাটাকেও ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। মৌ অবাক হয়ে বলে, 'ও মা! কী সুন্দর! মা, এটাকে আমি পুষব।'

'পুষবেই তো! ও তোমার নতুন বন্ধু!'

মৌয়ের আজ কী ভাগ্য। একে সার্কাস, তায় নতুন বন্ধু! সে চীৎকার করে ডাকতে থাকে—'রবি! শিগগীর আয়! দেখ্ কে এসেছে।'

কিন্তু কোথায় রবি? তার কোন সাড়াশব্দ নেই। মৌ বলে, 'রবি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করেছে, বাপি। ওকে সার্কাসে নিয়ে যাইনি বলে। তাই কোন খোঁদলে লুকিয়ে বসে আছে দুষ্টুটা!'

নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ জুতোর ফিতে খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মুখটা আর তুলতে পারেন না। মৌ সারাটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে বললে, 'রবি কোথায় বাপি? কোথাও তো নেই?'

নরেন্দ্রনাথ তখনও নীরব। সরমা বলেন, 'রবি নেই মৌ। রবি চলে গেছে।'

'—চলে গেছে! মানে? কোথায় চলে গেছে? কেন?'

'—কি জানি কেন। তোমরা সার্কাস দেখতে যাওয়ার পরই সে কোথায় যেন চলে গেল। আমরা অনেক খুঁজেছি; কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি।'

ছোট্ট মৌয়ের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। কথাটা তার বিশ্বাসই হতে চায় না। এ কী সম্ভব? রবি—তার রবি তাকে কিছু না জানিয়ে এভাবে চলে যাবে? দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কোনক্রমে বলে, 'ও কি···ও কি···আমার উপর রাগ করেছে?'

কেউ কোন জবাব দেয় না। দুরন্ত অভিমানে মৌয়ের চোখের কোণে জল টলটল করছে। বললে, 'সে কি আর কোনদিনই ফিরে আসবে না?'

নরেন্দ্রনাথের বুকের ভিতর মুচড়ে ওঠে, নিজের মেয়ের সঙ্গে এ কী মিথ্যা ছলনা করতে হচ্ছে তাঁকে। সরমাই জবাবে বলেন, 'হয়তো খেয়াল হলে সে নিজে থেকেই ফিরে আসবে। ততক্ষণ তুমি বরং এই কুকুরছানাটার সঙ্গে দেখা কর। দেখেছ মৌ—কী সুন্দর ওর গায়ের লোম। ওর নাম কি জান? জ্যাকি।'

মৌ তার কোল থেকে জ্যাকিকে নামিয়ে দেয়। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে—'চাই না, চাই না, ঐ বিচ্ছিরি কুকুরটাকে। তোমরা যেখান থেকে পার রবিকে ফিরিয়ে এনে দাও!'

কাঁদতে কাঁদতে মৌ ছুটে চলে যায়। নরেন্দ্রনাথ চোখ থেকে চশমাটা খুললেন।

কাঁচটা মুছতে গিয়ে চোখটাও মুছে নিলেন। সরমা ঠাট্টা করে বললেন, 'কি হল ? রবির দুঃখে তোমার চোখেও জল এসে গেল নাকি ?'

ম্লান হাসলেন নরেন্দ্রনাথ।

সরমা বলেন, 'মৌয়ের দুঃখ আর কদিন ? দুদিনেই ও রবিকে ভুলে যাবে !

দেখা গেল সরমার হিসাবে কিছু ভুল ছিল। দু'দিন পরে মৌ কান্না থামালো বটে, কিন্তু হাসতেও ভুলল। জ্যাকির সঙ্গে ওর আদৌ কোন বন্ধুত্ব হল না। রবি বিদায় হবার পর মৌয়ের বন্ধুরা ওর সঙ্গে খেলতে এল, মৌ কিন্তু তাদের পাত্তা দিল না। দিনরাত সে চুপচাপ বসে থাকে। আগে বেসুরো গান গাওয়ার জন্য মায়ের কাছে ধমক খেত এখন সে গানই গায় না। ছড়া বলে না। মাসখানেকের ভিতরেই সে রীতিমত রোগা হয়ে গেল।

সরমা ভয় পেয়ে গেলেন। স্বামীকে বললেন, 'তুমি ছুটি নাও। চল, আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। নতুন জায়গায় গেলে মৌয়ের ভাল লাগবে।'

নরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ছুটি কি চাইলেই পাওয়া যায় ? এখন আমাদের অফিসে ভীষণ কাজের চাপ। দিন-সাতেক পরে আমাকে দিল্লী যেতে হতে পারে। হয়তো দিন দশেক সেখানে থাকতেও হবে।'

'—দিল্লী ? দিল্লীতে কেন ? সেখানে তোমার কী কাজ ?

'—সেখানে একটা এগ্‌জিবিশন হবে। আমাদের একটা স্টল নেওয়া হয়েছে।'

'তবে তো ভালই হল। তাহলে ব্যবস্থা কর, আমরা দুজনেও তোমার সঙ্গে যাব।'

সেই মতো আয়োজন করা হল। দিল্লী বেড়াতে যাওয়া হবে শুনে মৌ খুব খুশী। এত দিন পরে হাসল। সরমার বুকের উপর থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেল যেন। কিন্তু যাবার দিন মৌ এমন একটা কথা বলে বসল, যাতে বোঝা যায়—সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। রবিকে সে আজও ভোলেনি। যাবার দিন বাপির গলা জড়িয়ে ধরে সে বললে, 'আমি জানি, কেন আমরা দিল্লী যাচ্ছি !'

'—কেন রে ?'

'তুমি নিশ্চয়ই খোঁজ পেয়েছ, রবি দিল্লীতে আছে, না বাপি ?

নরেন্দ্রনাথ কী জবাব দেবেন ভেবে পান না।

দিল্লীতে ওরা অনেক কিছু দেখল। সেসব জিনিস এখন দিল্লীতে নেই—যে আমলের গল্প তখন তা তৈরী হয়েছে। 'ওশেনিয়ামে' ডলফিন আর কীলার হোয়েলদের খেলা, মিনি রকেটে চড়ে আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখা, ত্রি-মাত্রিক টি. ভি. তে স্টেজের উপর অভিনয়। আরও কত কি ! মৌ অভিভূত। না হবে কেন ? মাত্র ছয় বছরের বাচ্চা সে। দিল্লীতে এসে রবির নাম সে একবারও করেনি। তবে বোধহয় এতদিনে সে রবির কথা ভুলে গেছে। নরেন্দ্রনাথ সরমা আর মৌকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। নিজের স্টলে প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে গেলেন।

মোকে নিয়ে ঢুকলেন না। সেখানে দু একটি রোবটকে দেখানো হচ্ছে। এগুলি অবশ্য নতুন মডেল—কথা বলতে পারা রোবট, রবির মতো জবড়জঙ্গ বোবা নয়। তবু পাছে তাদের দেখে রবির কথা ওর মনে পড়ে যায়, তাই নরেন্দ্রনাথ একবারও নিজের স্টলে ওকে নিয়ে গেলেন না।

একদিন এক কাণ্ড হল। হঠাৎ এগ্‌জিবিশন গ্রাউণ্ডে মো হারিয়ে গেল। ঠিক ওঁদের স্টলটার সামনে থেকে। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। মোয়ের পাত্তা নেই নরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হয়ে নিজের স্টলে ঢুকলেন একটা টেলিফোন করতে—'হারানো প্রাপ্তি' অফিসে খবর দিতে। কিন্তু সেসব কিছুই তাঁকে করতে হল না। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ওঁরা দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা কথা বলা রোবটের সামনে মো দাঁড়িয়ে আছে। তাকে প্রশ্ন করছে, 'না, মিস্টার রোবট-স্যার। রবিকে দেখতে আপনার মত মোটেই নয়। সে কথা বলতে পারে না। আপনি তাকে চেনেন না? কী আশ্চর্য! সে তো আপনারই জাত ভাই স্যার? বলুন না? চেনেন না তাকে?

সেদিনই ওঁরা ফিরে এলেন কলকাতায়। সরমা প্রশ্ন করেছিলেন 'আমাদের না জানিয়ে কেন পালিয়ে গিয়েছিলে? যদি হারিয়ে যেতে?'

মো বলে, 'হারাব কেন? আমি তো বাপির স্টলে গেছিলাম। রবির খোঁজে'—তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে '—ওরা কেউ তাকে চেনে না।'

শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বললেন, 'দেখ সরমা, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, মো হয়তো এবার একটা কঠিন অসুখে পড়বে। দেখছ না কী ভীষণ মন-মরা হয়ে থাকে মেয়েটা। আমি বরং রবিকে—'

'না।'—রুখে ওঠেন সরমা। তাঁর কেমন যেন রোখ চেপে আছে। ঐ এক ফোঁটা মেয়েটার কাছে এভাবে হেরে যেতে হবে! তাছাড়া একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর কিছুদিনের মধ্যে মো নিশ্চয় ভুলে যাবে সেই সর্বনাশা পুতুলটাকে। রবিকে নিয়ে এতদিন তিনি তো বড় কম অশান্তি ভোগ করেন নি। বাজার উজাড় করে তিনি এখন নানান জাতের খেলনা কিনে আনেন। কিন্তু মো যে-কে-সেই। কাঁদে না; কিন্তু হাসেও না। রবির নাম সে ভুলেও উচ্চারণ করে না। চুপচাপ বসে থাকে জানালার ধারে। নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন মো দিনরাত রবির কথাই ভাবে। সে কি এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে, রবি অভিমান করে বিবাগী হয়নি—তার বাপিই রবিকে সরিয়ে দিয়েছে? তাই কি মো এত মনমরা? তাই কি সে আজকাল আর তার বাপির সঙ্গেও মন খুলে কথা বলে না?

একদিন নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে ডেকে বললেন, শোন, কাল তোমাদের দুজনকে আমি আমার কারখানা দেখাতে নিয়ে যাব।'

সরমা আঁতকে ওঠেন, 'কী বকছ পাগলের মতো? বেচারি হয়তো এতদিনে সেই বিশ্রী রোবটটা ভুলতে শুরু করেছে। আর তুমি চাইছ খুঁচিয়ে ঘা করতে?

নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি ভুল করছ সরমা। রবিকে সে একতিলও ভোলেনি। দিবারাত্র শুধু তার কথাই ভাবে, আমি জানি। শোন, রবি যে একটা প্রাণহীন যন্ত্র, তার যে বোধশক্তি ছিল না, সে যে ভালবাসতে জানে না, মৌকে দেখলে এতদিন পরে সে যে চিনতেই পারবে না—এইসব তথ্যগুলো যতদিন না মৌকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে ততদিন তার মনটা ঘুরবে না। আমার মনে হয়—কারখানায় কীভাবে রোবট তৈরী হয় এটা স্বচক্ষে দেখলে হয়তো ওর ভুলটা ভাঙবে।'

সরমা দেখলেন, কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। তিনি রাজী হলেন।

পরদিন নরেন্দ্রনাথ ওদের দুজনকে কারখানা দেখাতে নিয়ে এলেন। নরেন্দ্রনাথের সহকারী ডক্টর শ্রীনিবাসন ফ্যাকটারিটা ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকেন। নানান যন্ত্রপাতি—ডাইনামো, মোটার, ক্রেন—কারখানা যেমন হয় আর কি। দেখালেন, রোবটের হাত পা বুক-পেট-মাথা কীভাবে তৈরী হয়। সরমা জানতে চান, 'আচ্ছা ডক্টর শ্রীনিবাসন, রোবটদের স্মৃতিশক্তি কেমন? ধরুন একটা রোবট আমাকে চিনত; অনেকদিন পরে হঠাৎ আমাকে দেখলে সে চিনতে পারবে?

শ্রীনিবাসন বলেন, 'খুব সম্ভবত পারবে না, যদিও ওদের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর।'

সরমা বলেন, 'স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়া সত্ত্বেও চিনতে পারবে না কেন।'

'ওদের মাথায় আমরা একটা করে মেমারি সার্কিট ভরে দিই—মানে স্মৃতি-কোষের তার। কিন্তু তাতে জমা থাকে শুধু অঙ্কের হিসাব। সংখ্যাতত্ত্বের বড় বড় রাশি। নানান জাতের ফর্মুলা। ফলে সেণ্টিমেণ্টাল কোন কিছু ওদের মস্তিষ্কে থাকে না। পোষা কুকুর ঘোড়া হাতী তাদের প্রভুকে চিনতে পারে গন্ধ শুঁকে। রোবটের ঘ্রাণশক্তি নেই। ফলে ওরা মানুষকে চিনতে পারে না।'

সরমা জানতে চান, 'আচ্ছা ওরা কি ভালবাসতে পারে?'

শ্রীনিবাসন হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'না, মিসেস সান্যাল! রোবটের প্রাণ নেই, তারা ভালবাসতে পারে না।'

ওঁরা কথা বলছিলেন প্রকাণ্ড বড় একটা 'প্রডাকশান শেড-এর সরু গলিপথে দাঁড়িয়ে। আশে পাশে প্রকাণ্ড দৈত্যাকার সব যন্ত্রপাতি। বড় বড় চাকা ঘুরছে। মাথার উপর চলছে ক্রেন। ওঁরা যে রেলিং-ঘেরা গলি পথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তার হাত খানেক নিচে দিয়ে একজোড়া রেললাইন। কিছুক্ষণ বাদে বাদে সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয় ঠেলাগাড়ি মাল নিয়ে যাতায়াত করছে। মৌ অবাক বিস্ময়ে সব কিছু দেখছে। সরমা ইচ্ছা করেই শ্রীনিবাসনকে ঐ ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন, যাতে মৌ বুঝে নেয়—রোবট আসলে যন্ত্র পুতুল। তারা হাসে না, ভালবাসে না, তাদের প্রাণ নেই। এক হাতে তিনি মৌয়ের হাতটা ধরে রেখেছিলে। কারখানার এই অংশে মানুষকর্মী খুব কম; রোবট-কর্মীরাই যাবতীয় কাজ করছে। মৌ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

তাদের দেখছিল ; —না ! এরা রবির চেয়ে আকারে অনেক ছোট। এদের মুখ আছে এরা কথা-বলা রোবট। রবির মতো জবড়জঙ্গ গরিলা একটাও নেই। থাকবে কোথা থেকে ? রবি ছিল পুরানো মডেলের রোবট। এখন ঐ বাতিল-মডেলের বোবা-রোবট আর তৈরী করাই হয় না।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, মায়ের হাত ছাড়িয়ে মৌ লাফিয়ে ওঠে—'ঐ তো !'

দ্যাখ্ দ্যাখ্ ধর ধর করতে করতেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে রেললাইনের গলিপথে মৌ দিল লাফ ! দেখতে পেয়েছে ! এতদিন যাকে খুঁজছিল, সেই তাকেই ! পিছন ফিরে একটা প্রকাণ্ড রোবট কি-যেন করছিল। মৌ নিঃসন্দেহ ! ও আর কেউ নয় : রবি।

মৌ তো আর প্রাণহীন নয়, রোবট নয়—সে ভালবাসতে জানে, হারানো বন্ধুকে চিনতে পারে। ঘ্রাণশক্তিতে নয়, প্রাণশক্তিতে। রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে মৌ—'রবি ! —রবি !—রবি !'

মুহূর্তের বিহ্বলতা। পরমুহূর্তেই সকলে সম্বিৎ ফিরে পায়। কিন্তু ও কী ? সর্বনাশ ! শ্রীনিবাসন দেখতে পান, যে সরু গলিপথ দিয়ে মৌ পাগলের মতো ছুটে চলেছে, সেই রেল-লাইন ধরেই বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড একটা রেলগাড়ি। মৌয়ের সেদিকে নজরই নেই। রেল-লাইনের গলিপথটা এতই সরু যে, বড়রা কেউ সে পথে নামতে পারে না। এখনই একটা বীভৎস দৃশ্যের অনিবার্য পরিণামের আশঙ্কায় সবাই হায় হায় করে ওঠে। সরমার মাথার ভিতর টলে ওঠে। মনশ্চক্ষে তিনি দেখতে পান, রক্তমাখা মৌ-এর দলিত মথিত ছোট্ট দেহটুকু ! মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান তিনি। নরেন্দ্রনাথ রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়েন। চিৎকার করে ওঠেন, 'মৌ। যাসনে ! ফিরে আয়।'

সে ডাক মৌ শুনতে পায় না। তার মাথার রিবন খুলে গেছে। ফ্রকে লেগেছে কালির দাগ। সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। সে যেন অনিবার্য মৃত্যুর টানে ছুটে চলেছে সামনের দিকে, আর চিৎকার করে ডাকছে : রবি !—রবি !—রবি !'

হঠাৎ শুনতে পেল রবি। ঘুরে দাঁড়ালো। যে কথা বুঝতে কোন মানুষের হয়তো পুরো আধমিনিট সময় লাগে ওর উন্নত বুদ্ধিতে সে সেটা নিমেষমধ্যে বুঝে নেয়। চরম বিপদের সামনে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়, কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারে না। রবির কখনও তা হয় না। রবি এক লহমায় বুঝে নিল, এ সমস্যার কী সমাধান হতে পারে। বিদ্যুদ্‌বেগে সে এগিয়ে আসে, ঝুপ করে বসে পড়ে রেলিঙের ধারে ; আর মাছ-রাঙা যে ভঙ্গিতে ছোঁ মারে, ঠিক সেইভাবে টুপ করে শূন্যে তুলে নেয় মৌ-কে। পরমুহূর্তেই শিকার ফস্‌কে যাওয়ার আক্রোশেই যেন গজরাতে গজরাতে ট্রেনটা চলে গেল গলিপথ দিয়ে। ততক্ষণে যন্ত্রদানবটা তার স্টেন-লেস্ স্টীলে গড়া বুকে জড়িয়ে ধরেছে একরত্তি ছোট্ট মেয়েটাকে।

কে বল্‌বে বোবা রোবটটার প্রাণ নেই ! ওর লেন্স-চোখ পিট্‌ পিট্‌ করছে ! মৌ-এর গালে গাল ঘষছে । যেন মনে মনে বলছে, 'মৌ ! আমার ছোট্ট মৌ ! কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে এতদিন ? কই, একবারও তো টু-কি দিস্‌নি ?

পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীনিবাসন এলেন নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে, চায়ের নিমন্ত্রণে । কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'কাল্‌কে আমি বোধহয় ভুল বলেছিলাম, মিসেস সান্যাল । রোবটের প্রাণ আছে কি না জানি না, কিন্তু তারা বোধহয় ভালবাসতে জানে ।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই জানে শ্রীনিবাসন । গাছের যে প্রাণ আছে এটা একসময়ে মানুষ বুঝে উঠতে পারেনি । কালবৈশাখী মেঘ যেমন আকারে বাড়ে, সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন ক্রমশ: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, গাছের বৃদ্ধিকেও মানুষ সে-ভাবেই দেখত । সে যে প্রাণশক্তির তাগিদে বীজ থেকে চারাগাছ, তা থেকে মহীরুহে রূপান্তরিত হয় তা বুঝতো না । যতদিন না আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করলেন, ততোদিন বিজ্ঞান জানত না গাছেরও প্রাণ আছে। তেমনি আজ আমরা প্রমাণ করতে পারছি না যে, রোবটেরও প্রাণ আছে—তারা আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে, তোমার আমার মতই তারা ভালবাসতে জানে ! আগামীযুগের কোন জগদীশচন্দ্র এসে হয়তো সেটা প্রমাণ করবেন !

ডক্টর শ্রীনিবাসন বলেন, 'কিন্তু যাঁর পুনর্জন্মলাভে এই চায়ের নিমন্ত্রণ তিনি কোথায় ? মিস্‌ মৌ সান্যাল ?'

সরমা বলেন, 'কি করে তার দেখা পাবেন ? আপনি তো যন্ত্র না !

'—এ কী যন্ত্রণা ! যন্ত্র না হলে মৌয়ের দেখা পাব না ?'

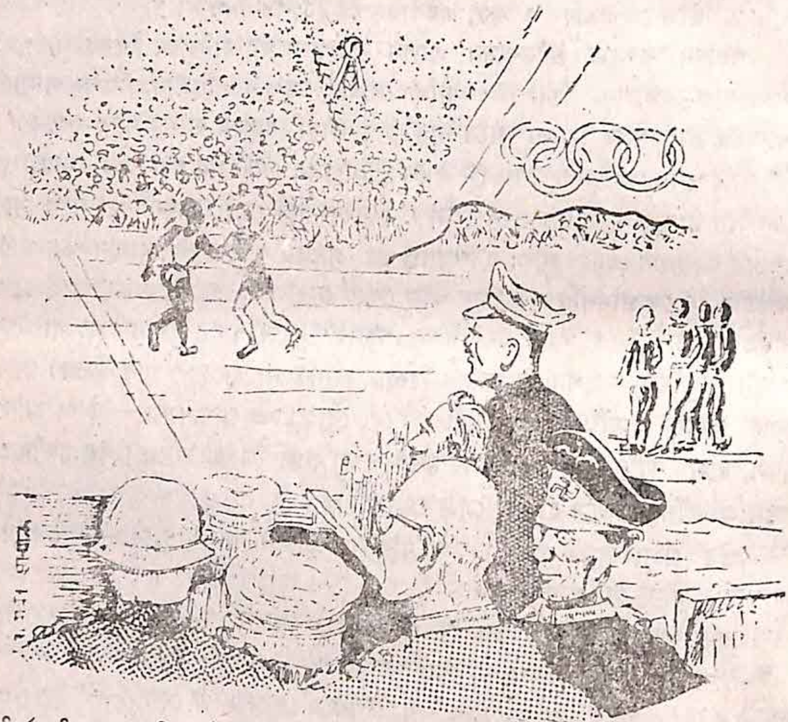
'সে মেতে আছে তার হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়ে । ঐ দেখুন—'

ওঁরা জানালার ধারে সরে আসেন । ওখান থেকে পিছনের বাগানটা দেখতে পাওয়া যায় । দেখা গেল, একটা বিরাট আমগাছের গুঁড়িতে ঠেশ্‌ দিয়ে রবি দাঁড়িয়ে আছে। দুই গোদা-গোদা হাতের আঙুলে ঢেকে রেখেছে তার লেন্স-চোখ । আর মৌ ? পাত্তাই নেই । দেখা না যাক, তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে । যুঁই ঝোপের পিছন থেকে ভেসে আসছে তার মিষ্টি ডাক :

'রবি ব'লে টু—কী !'

* আমেরিকা প্রবাসী প্রখ্যাত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক আইজাক আজিমভ অনুসরণে ।

'অলিম্পিকে আমার সেরা প্রাইজ'—জেসি ওয়েন্স



মার্কিন নিগ্রো এ্যাথিলেট জেসি ওয়েন্স বার্লিন অলিম্পিকে বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন একাই চার চারটে স্বর্ণপদক জয় করে। একশ', দু'শ' মিটার দৌড়, লং জাম্প এবং চারশ মিটার রিলে রেস। এর মধ্যে কোনটি তাঁর মতে সেরা প্রাইজ ? এই চারটির মধ্যেই সেরা প্রাইজটা আছে তো ? জেসি ওয়েন্সের স্মৃতিচারণের আকরিক অনুবাদ করে দিলাম। তোমরাই খুঁজে দেখ—অলিম্পিকে তার সেরা প্রাইজ কোন্‌টি।

* * *

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল। এবার বার্লিনে অলিম্পিক হচ্ছে। এ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার তার শিশুসুলভ প্রচার-মাধ্যমে ক্রমাগত ঘোষণা করে চলেছে—তার প্রতিযোগীদের ধমনীতে আছে 'আর্যরক্ত', তারা উন্নতজাতির মানুষ। তাই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের একটা চাপা উত্তেজনা অলিম্পিক গ্রাউণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। সাদা আর কালো—বর্ণবৈষম্যের বিষয়টা মাঝে মাঝে বিশ্রীভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে !

এ নিয়ে আমার অবশ্য মাথাব্যথা নেই। আমি অনুশীলন করেছি, শিখেছি, ঘেমেছি—পুরো ছয় বছর ধরে নিজেকে তৈরী করেছি এই বার্লিন অলিম্পিকের জন্য। আমার মনের কোনও কোণায় রাজনীতি বা জাতীয়তাবাদের ঠাঁই নেই! হবে কোথা থেকে? গোটা মনটা জুড়েই ছিল—'খেলা', স্পোর্টস! অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে আসবার সময় একটি স্বপ্নই বারে বারে দেখেছি—অন্তত একটি স্বর্ণ-পদক নিয়ে আমাকে দেশে ফিরতে হবে। আমার সবচেয়ে বড় আশা ছিল: 'লঙ-জাম্প'! কারণ ছিল। এক বছর আগেই আমি বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছি: ২৬ ফুট ৮·২৫ ইঞ্চি। তাই আমাদের দেশে সকলেরই আশা—'জেসি ওয়েন্স আর কিছু পারুক না পারুক ঐ একটা স্বর্ণপদক পকেটস্থ করবেই।

লং জাম্প ট্রায়ালের দিন।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, মূল প্রতিযোগিতায় তাদেরই অংশ নিতে দেওয়া হয়, যারা ন্যূনতম 'মান' অতিক্রম করে, বা 'কোয়ালিফাই' করে মূল প্রতিযোগিতার তালিকায় নাম লেখায়।

সেই 'কোয়ালিফাইং' অনুষ্ঠানের দিনে এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সম্মুখীন হওয়া গেল। একটি জার্মান ছোকরা, নাম লাজ লঙ (Luz long)। এর নামই কোনোদিন শুনিনি। খাড়াইয়ে আমার চেয়েও এক ইঞ্চি লম্বা, নীল চোখ, টকটকে রঙ, খাঁটি আর্য! নর্ডিক! শুনলাম, লঙ নাকি নার্ডিক জার্মানীর আশা। আমাদের চমকে দেবার জন্য হিটলারের নির্দেশে একে তিন-চার বছর ধরে গোপনে তালিম দেওয়া হয়েছে। ওর কীর্তিকাহিনী—কবে, কোথায় কতদূর লাফাচ্ছে কাউকে জানানো হয়নি। একেবারে অলিম্পিকের রঙ্গমঞ্চে বাজী মাৎ করবার আশায়। আমার ট্রেনার কানে কানে বললেন, চিনে রাখ, এই ছোকরাই তোমার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী!

ট্রায়াল-জাম্পে ও ছিল আমার আগে। প্রথমবারেই ছোকরা অনায়াসে ন্যূনতম রেখাটা অতিক্রম করল। শুধু তাই নয়, অনায়াসেই সে লাফালো ছাব্বিশ ফুটের বেশি! দর্শকদল উল্লাসে ফেটে পড়ছে। সে উল্লাস লাজ লঙের সাফল্যে নয়, নিগ্রো-বাচ্চার নাকে ঝামা ঘষে দেবার সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল হওয়ায়! হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল মাথায়। ওদের উল্লাসধ্বনি আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপে সংযম হারালাম। মনে মনে বললাম, ফ্যুয়রার সাহেব! তোমাকে দেখিয়ে দেব—খেলার জগতে 'আর্য'-অনার্য' বলে কিছু নেই! নিগ্রো-বাচ্চাও লাফাতে জানে!

...তুমি কি খেল? সেটা জানতে পারলে এই মওকায় একটা উপদেশ দিয়ে রাখি। কথাটা ভুলো না: কোন খেলোয়াড় যখন রেগে যায়, মানসিক ভারসাম্য হারায়, তখনই হয় সে ভুলের শিকার! সব খেলাতেই!

আমিও কোন ব্যতিক্রম নই। ঐ একই ভুল করে বসে আছি!

জান নিশ্চয়, ট্রায়াল জাম্পে তিন-তিনবার লাফাতে দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্তত একবার ন্যূনতম সীমারেখাটা অতিক্রম করতে পারলেই তাকে মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে, নচেৎ নয়। সে ইতিপূর্বে বিশ্বরেকর্ড করে থাকলেও নয়!

আমি প্রথমবার লাফালাম। শুনলাম, দাগে পা দেওয়ায় 'ডিস্কোয়ালিফাই' হয়েছি।

কান গরম হয়ে উঠল। আরও রেগে আছি! দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দ্বিতীয়বার লাফ দিলাম। উচ্চ হাস্যরোল উঠ্‌ল স্টেডিয়ামে। কী ব্যাপার? শুনলাম, এবার নাকি আমি সীমারেখার এক বিঘৎ এপার থেকে লাফিয়েছি—আঙুল নয়, আমার গোড়ালি ছিল দাগের উপর! নিতান্ত নভিস্‌-এর মতো। এবারও খারিজ!

ছি-ছি-ছি! এই জন্যে ছুটে এসেছি তিন হাজার মাইল? রাগে, দুঃখে বুনো ঘোড়ার মত আমি তখন মাটিতে পা ঠুক্‌ছি।

হঠাৎ টের পেলাম, কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি সেই ছোকরা। লাজ লঙ। যে জার্মান ছেলেটা অনায়াসে প্রথমবারেই কোয়ালিফাই করেছে। রীতিমতো থতমত খেয়ে যাই। কোথাও কিছু নেই ছোকরা আমার ডান হাতখানি টেনে নিয়ে ভাঙা-ভাঙা জার্মান ইংরাজীতে বলল, জেসি ওয়েন্স, আমার নাম লাজ লঙ। মনে হয় তোমার সঙ্গে কেউ আমার আলাপ করিয়ে দেয়নি।

অভদ্র নই আমি। হেসে বললুম, এই তো আলাপ হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলুম। খবর সব ভালো তো?

এক গাল হেসে লাজ লঙ বললে, আমার খবর তো ভালই। কিন্তু তোমার খবর কি?

চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায় ও কি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে চাইছে? বলি, কী বল্‌তে চাইছ তুমি?

Something must be eating you Jessie, for you should be able to qualify with your eyes shut! [তোমাকে কিছু একটা খোঁচাচ্ছে জেসি, না হলে চোখ বুঁজে লাফ মেরেও তো তোমার কোয়ালিফাই করার কথা।]

না! এ তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুর নয়। বন্ধুর মতো কথা। ওর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ আন্তরিকতা। অকপটে স্বীকার করি: বিশ্বাস কর, আমি তা জানি কিন্তু…

কথাটা বলে তৃপ্তি পেলাম। ঐ কথাটা ঠিক সেই মুহূর্তে কাউকে বলে বুকটা হাল্‌কা করার প্রয়োজন ছিল। কথাটা বলে তৃপ্তি পেলাম।

ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রতিযোগিরা লাফাছে। লাজ লঙ আমার হাতটা ছাড়েনি। ছোকরা নাৎসী স্কুলে ট্রেনিং পেয়েছে, আর্যরক্তের অভিমানের কথা ওকে পৈ পৈ করে

শেখানো হয়েছে। অথচ আশ্চর্য! ওর মগজ ধোলাই করতে সক্ষম হয়নি দ্বিজাতি-
তত্ত্বের নাৎসী ধুরন্ধরেরা। ও এই কয়লা-কালো নিগ্রোটার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরে
আছে তখনও। খোশমেজাজি গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আমিও স্বাভাবিক
হয়ে আসি। না, কানটা আর ঝাঁ-ঝাঁ করছে না। চোখের সামনে যে তারা-ফুলগুলো
ফুটছিল সেগুলোও মিলিয়ে গেছে—অর্থাৎ মস্তিষ্কে যে রক্ত কণিকাগুলি ভীড় করে
এসেছিল—পরপর দু'বারের ব্যর্থতায়—তারা ক্রমশঃ সারা দেহে ফিরে গেছে। ওর
রসিকতায় আমি হাসছি, কথার পিঠে কথা বলছি। সেটা ও লক্ষ্য করল। ইতিমধ্যে
আমার তৃতীয়বার, অর্থাৎ শেষবার লাফ দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। লাজ লঙ
তাই হঠাৎ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে আমাকে বললে, শোন, ওয়েন্স! ঐ যে
দাগটা দেখছ ওর চার-পাঁচ ইঞ্চি সামনে একটা পয়েন্টে মনটা স্থির কর। তুমি তো
ওয়ার্ল্ড-রেকর্ড করে বসে আছ হে! তোমার ভয়টা কী? চার-পাঁচ ইঞ্চি
এদিক থেকে লাফালেও নিশ্চয় তুমি কোয়ালিফাই করবে! ট্রায়ালে তোমার
রেকর্ড কত ছিল, কেউ হাততালি দিয়েছিল কিনা এসব কেউ মনে রাখবে না।
এখানে এখন 'কোয়ালিফাই' করাটাই বড় কথা। তাই নয়? আসল লড়াই তো
আগামীকাল?

আশ্চর্য! ওর আন্তরিকতায় আমার মনের মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। হেসে
বললুম, ঠিক কথা! আসল লড়াই তো কাল! ধন্যবাদ!

পরে শুনেছি, ট্রায়াল জাম্পে আমি নাকি দাগের এক ফুট এপাশ থেকে লাফিয়ে
ছিলাম এবং ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের একফুট বেশি পেঁছেছিলাম।

সে-রাত্রে অলিম্পিক-গ্রামের ও প্রান্তে আমি খুঁজে খুঁজে লাজ লঙের ডেরায়
এসে হাজির। সে আমাকে হাত ধরে নিয়ে বসালো। দু-জন পাকা দু-ঘণ্টা
গল্পগাছা করলাম—খেলার কথা, স্পোর্টস-এর কথা, অনুশীলনের কথা, আমাদের
ব্যক্তিগত কথা, বাড়িতে কে কে আছে, এমনকি পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথাও! এক
প্রহর রাত্রে যখন বিদায় চাইলাম তখন দুজনেই বুঝেছি—আমরা পরস্পরের বন্ধু।
অতলান্তিকের দু'পারের বাসিন্দা দুই সমবয়সী খেলোয়াড়—সাদা আর কালো,
পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী, দোস্ত! যদিও দুজনেই জানি—আগামীকাল লাজ লঙ
প্রার্থনা করবে, সে যেন তার বন্ধুর হাত থেকে একটা স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিতে
সক্ষম হয়। তাতে কি? আমিও তো সেই প্রার্থনাই করব!

পরদিন অলিম্পিকের আসরে আবার দুজনে মুখোমুখি দেখা। সমস্ত স্টেডিয়ামে
লোক আর ধরেনা। কেন্দ্রীয় মণ্ডপে স্বয়ং ফ্যুরার বসে আছেন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে।

এবারও লাজ লঙ আমার আগে লাফালো। সে তার নিজের রেকর্ড ভাঙল।
বিশ্বরেকর্ডও! সে এমন একটা দৈর্ঘ্য লাফালো যেটা অতিক্রম করতে আমার সর্ব-
শক্তি, সব শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। অনেক জার্মানই আশা এবং অনেক মার্কিন

বন্ধু আশঙ্কা করেছিল—আমি লাজ লঙের ঐ সদ্যকৃত বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে পারব না। আমার বেশ মনে আছে—আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে শেষ বার যখন লাফ দিলাম তখন আমার দু-পাশ দিয়ে দর্শকের দল বিপরীত দিকে ছুটে গেল। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বালুকা স্তূপে। খণ্ড মুহূর্তের জন্য বোধকরি আমি বাহ্য-জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম, পরমুহূর্তেই দেখি কে যেন এগিয়ে এসে আমার হাতখানা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে বালুকাস্তূপ থেকে টেনে তুলছে। আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে : 'কংগ্র্যাচুলেসন্স!'

স্বয়ং ফ্যুরারের রক্তচক্ষুর সামনে!

আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ করে বলতে পারি—যে অভিনন্দনে এক বিন্দু কৃত্রিমতা ছিল না। লাজ লঙ আমাকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানায়!

সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়েছিল বর্তমান যুগের অলিম্পিকের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা Pierre de Couberin যা বলেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য অলিম্পিকের মূল লক্ষ্য জেতা নয়, অংশ নেওয়া। জয় নয়, প্রাণপণে লড়াই করা। আর সবচেয়ে বড় জয় স্বর্ণপদক নয়, প্রতিযোগীর হৃদয় জয়।

লাজ লঙ ঐ বাণীর এক প্রাণবন্ত সজীব মনুমেণ্ট!

আমি অনেক সোনা পেয়েছি জীবনে—সোনার মেডেল, কাপ, শীল্ড, প্লাথ্, কিন্তু কোনোটাই নিখাদ নয়। লাজ লঙের ভালবাসার মতো তা খাঁটি চব্বিশ ক্যারেটের নয়! তাই বলি : বার্লিন অলিম্পিকে আমার সেরা প্রাইজ : লাজ লঙের প্রেম!

* * *

জেসি ওয়েন্সের ডায়েরী থেকে যে অনুবাদটুকু শোনালাম তারপর আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করে যাই :

বিদায় মুহূর্তে লাজ লঙ বন্ধুর করমর্দন করে বলেছিলেন, পরের অলিম্পকে, মাত্র চার বছর পরেই তোমাকে হারাবো ওয়েন্স! জেসি জবাবে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই! এবং সেবার আমি তোমাকে বালুকাস্তূপ থেকে টেনে তুলে প্রথম অভি-নন্দন জানাব, কেমন?

দুজনের কেউই তাঁদের কথা রাখতে পারেন নি।

দুজনের রেকর্ডই ছাপিয়ে আরও বড় জাতের উল্লম্ফন দিয়েছিলেন যিনি, তাঁর নাম ঃ বিশ্বত্রাস এ্যডল্ফ্ হিটলার!

অলিম্পিক চার বছর পর পর হয়।

বার্লিন অলিম্পিকের তিন বছর পরেই হিটলার 'জয়-রাম' বলে লাফ দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে চাইল। বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার এক পক্ষে লড়াই করেন জেসি ওয়েন্স, অপরপক্ষে লাজ লঙ! জেসি ওয়েন্স সেই কালযুদ্ধ

পাড়ি দিয়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সেই চব্বিশ ক্যারেট খাঁটি সোনা সিসিলির যুদ্ধে শহীদ হন!

এই আন্তর্জাতিক 'বর্ণ বৈষম্য- প্রতিবাদ' বৎসরে তাই জেসি ওয়েন্স আর লাজ লঙের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে।*

* রচনাটা ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আর একটি পংক্তি যোগ করার প্রয়োজন হয়েছে ঃ এই বৎসর (১৯৮০) ৩১শে মার্চ জেসি ওয়েন্স বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বন্ধু লাজ লঙের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন! আমরা দুজনের আত্মারই শান্তি কামনা করতে পারি।

শার্লক হেবো ফিরে এলেন



শার্লক হেবোকে তোমরা চেন না। সে দোষ তোমাদের নয়, আমার। আমি একসময় শার্লক হেবোর কীর্তিকাহিনী লিখে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখতাম—ডক্টর ওয়াটসন যেমন বিখ্যাত হয়েছিলেন আসল শার্লক হোমস্-এর গল্প লিখে। তোমাদের দাদা-দিদিরা যখন তোমাদের বয়সী তখন কিশোর শার্লক হেবোর কিছু কিছু কাণ্ড-কারখানার কথা শুকতারায় লিখেছিলাম। তারপর নানান ধান্দায় তার কথা ভুলে বসে আছি। হেবো তখন হায়ার সেকেণ্ডারীর ছাত্র ছিল; সে প্রতিজ্ঞা করেছিল হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার আগে আর গোয়েন্দাগিরিতে সে হাত দেবে না। তা সে প্রতিজ্ঞা হেবো রেখেছিল। রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে এখন সে প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ে।

হেবো আমার ভাই-পো। সে জানত, তার কীর্তিকাহিনী নিয়ে আমি গল্প লিখতে চাই; কিন্তু তার মতিগতি দেখেই গোয়েন্দা-গল্প লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো? হেবোর মাথায় গোয়েন্দাগিরির ভূত চেপেছিল। পড়াশুনা সে কিছুই করত না—দিবারাত্র মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বাইনোকুলার নিয়ে সে চোর ডাকাত ধরে বেড়াত। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হত—শেষে যাদের জন্য গোয়েন্দা-গল্প লিখব তারাও না হেবোর মত লেখাপড়া চাঙে তুলে ঐ নিয়ে মাতে! সম্প্রতি আমার সে ভুলটা হেবো ভেঙে দিয়েছে। সে

এখন আর বাচ্চা নয়, রীতিমত কলেজে-পড়া ছেলে। আজকাল আমার সঙ্গে গুরু-গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে। একদিন আমাকে এসে বললে, ছোটকাকু, আপনার ধারণাটা কিন্তু ভুল। বাজে গোয়েন্দা গল্প পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বটে, কিন্তু সত্যি-কারের ভালো ডিটেক্‌টিভ গল্পে বুদ্ধি তীক্ষ্ন হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, দৃষ্টি গভীরতর হয়, বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে। গোয়েন্দা-গল্প মানে শুধু খুন-জখম নয়, গোয়েন্দা-গল্প মানে একটা বড় জাতের ধাঁধা। গোয়েন্দা সমাধান দেখাবার আগে পাঠককে সমাধানে পেঁছাতে হবে। সমাধানটা থাকবে পাঠকের চোখের সামনে, অথচ তার নজরে পড়বে না।

আমি বলি, কী রকম ? একটা উদাহরণ দাও দেখি।

হেবো বলে, আপনি হিচ্‌ককের 'রিয়ার-ইউন্ডো' ফিল্‌ম্‌টা দেখেছেন ? ধরুন আমার অবস্থাও ঐরকম। একটা অত্যন্ত রহস্যজনক জিনিস কদিন ধরে লক্ষ্য করছি। অবস্থাটা খুলেই বলি আপনাকে। আগেই বলে রাখছি, এটা একটা গোয়েন্দা গল্প। একটা রহস্যে পেঁছে দিয়ে আমি থামব, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে সমাধানটাও জানিয়ে যাব। আপনি আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনুন, দেখুন আর পাঁচটা কথার সঙ্গে আমি যে সমাধানটা জানিয়ে গেছি সেটা ধরতে পারেন কি না :

একটা কালো মোটা আর অত্যন্ত বেঁটে লোক সামনের ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায় থাকে। একমুখ চাপ দাড়ি—দিবারাত্র গগল্‌স্‌ পরে থাকে—দেখলেই মনে হয় লোকটা পাকা ক্রিমিন্যাল। ফ্ল্যাট বাড়িটা প্রকাণ্ড—নয় তলা উঁচু। লোকটা থাকে আটতলায়। দু-দুটো অটোমেটিক লিফ্‌ট্‌ আছে। সন্দেহজনক লোকটাকে আমি আমার ঘর থেকে দিবারাত্র নজরে নজরে রেখেছি। বাইনোকুলারটা দিয়ে তাকে সব-সময় লক্ষ্য করি। যতদূর শুনেছি, লোকটা কোন কারখানায় কাজ করে। কখনও দিনের বেলা তার ডিউটি থাকে, আবার কখনও বা রাতের বেলায়। দিনের বেলা দেখেছি লোকটা লিফ্‌ট্‌ দিয়ে নেমে যায়, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। কখনও বিকালে, কখনও সন্ধ্যারাত্রে ফিরে আসে। হাতে সব সময়েই একটা ফোলিও ব্যাগ। চুপচাপ লিফ্‌ট্‌ বেয়ে উঠে যায় আট তলায়। লিফ্‌ট্‌-এর পাশেই ওর ঘর। চাবি খুলে ঢুকে যায় ভিতরে। কিন্তু যেদিন ওর নাইট ডিউটি থাকে সেদিন ফিরতে ওর রাত দুটো বেজে যায়। সেদিন কিন্তু সে সোজা আটতলায় উঠে আসে না। ওঠে ছয়তলা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আটতলায় উঠে আসে। আমি আরও লক্ষ্য করেছি, ঐ ছয়তলা থেকে আটতলায় সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় সে আমাকে খুঁজতে থাকে—দেখে, আমি দেখছি কি না। আমার উপস্থিতি টের পেলেই কেমন যেন ধরা পড়ে যাবার মত অবস্থা হয়। একছুটে বাকি সিঁড়ি কটা ভেঙে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

মাস তিনেক ধরে ক্রমাগত লক্ষ্য করছি ব্যাপারটা। এ তিন মাসে সে একশ

সতেরবার নেমেছে এবং দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাত্রে সাকুল্যে পঁচাশিবার উঠেছে। প্রতিবারই লিফ্‌টে করে। নামা এবং ওঠা। আর বাকি বত্রিশবার সে ফিরেছে গভীর রাত্রে—তারমধ্যে একত্রিশ বারই সে লিফ্‌ট বেয়ে উঠেছে ছয় তলায়, বাকি দুইতলা হেঁটে। আশ্চর্য—মাত্র একবার, সেদিন ঐ রাত দুটোর সময়েও আর একজন লোক তার সঙ্গে—সে ছয়তলায় নামেনি। নিতান্ত ভালমানুষের মত আটতলায় লিফ্‌ট-এ করে উঠে গিয়েছিল। এর কারণটা কী হতে পারে বলুন তো ?

আমি বলি, নিশ্চয় ছয় বা সাত তলার কোনও ঘরের দিকে ওর নজর আছে। গভীর রাত্রে সে হয়তো কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছয় তলায় লিফ্‌ট্‌-টা ছেড়ে দেয়। তাই সে লক্ষ্য করে দেখে তোমাকে। বাইনোকুলার চোখে তোমাকে এ বাড়িতে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি হেঁটে নিজের ফ্ল্যাটে পালিয়ে যায়।

হেবো বললে, এই দেখুন, আপনার মনের মধ্যে পাপ আছে। সমাধান আপনার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু আপনি সন্দিগ্ধমনা হয়ে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন।

আমি বলি, কি রকম ? আর কোন সমাধান হতে পারে ? কেন লোকটা গভীর রাত্রে বত্রিশ বারই শেষ দু'তলা হেঁটে উঠ্‌ল ?

হেবো বলে, বত্রিশবার নয় ছোটকাকু, একত্রিশবার···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ একত্রিশবার ; কিন্তু একবার তো তার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল। সেদিন তো আর···নাঃ ! পারলাম না। বলে দাও ?

—আমি প্রথমেই বলেছি, দুটি লিফ্‌ট্‌ই অটোমেটিক। আর বলেছি, লোকটা অত্যন্ত বেঁটে। আসলে বেচারি ছয় নম্বর বোতাম পর্যন্ত হাত পায়। মাঝরাতে অটোমেটিক লিফ্‌টে বেচারি একা একা ওঠে। কাকে আর বলবে বলুন—'আট নম্বরের বোতামটা যদি কাইণ্ডলি—'

আমি হো হো করে হেসে উঠি।

ওর এই গল্প শোনার পরেই মনস্থির করলাম। হেবোর কীর্তি-কাহিনীগুলি তোমাদের জানানো উচিত। তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।

* * *

হেবোর গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। অনেকবার অনেককে ঐ গল্প শুনিয়ে ঠকিয়েছি। লক্ষ্য করে দেখেছি ঐ 'অত্যন্ত বেঁটে' আর 'অটোমেটিক লিফ্‌ট্‌' শব্দ দুটি কেউ খেয়াল করে দেখে না। লোকটার গগল্‌স্‌, ফোলিও ব্যাগ, সন্দিগ্ধ চলাফেরায় সকলেই বোকা হয়। একদিন অফিসে আমার সহকর্মীদের ঐ গল্পটি শোনাবার পর সুধীরবাবু বললেন, আচ্ছা ! শার্লক হেবো তাহলে আপনার ভাইপো ?

আমি অবাক হয়ে বলি, আপনি শার্লক হেবোকে চেনেন ?

—চাক্ষুষ চিনি না, তবে তার কীর্তি কাহিনী একসময় শুকতারায় পড়ে-

ছিলাম। একদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে আসব।

আমি বলি, সে তো হেবোর সৌভাগ্য। শুধু হেবোর নয়, আমারও।

সুধীরচন্দ্র বলেন, না; নরেনবাবু—এ প্রস্তাবের পিছনে বিশেষ একটি কারণ আছে। আমার জীবনে বিরাট একটা রহস্য আছে, জানলেন—তার সমাধান হয় নি। আজ দু বছর ধরে ক্রমাগত চিন্তা করছি; কোনও কূলকিনারা করতে পারিনি। পারলে এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজার হালে জীবন কাটাতে পারতাম।

আমি হেসে বলি, কী ব্যাপার ? কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত খুঁজছেন ? সেই 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা ?'

সুধীরবাবু একটুও হাসলেন না। তাঁর চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল। কাছে সরে এসে বললেন, একজ্যাক্টলি, নরেনবাবু ! ঠিক তাই ! আমি এক গুপ্তধনের মালিক; কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছি না।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। এ যুগে আবার কেউ অমন গুপ্তধনের সন্ধান পায় নাকি ? কিন্তু সুধীরবাবুর মাথায় তো ছিট নেই—দিব্যি গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষ; তিনি কেন এমন উৎকট রসিকতা করতে যাবেন ?

প্রশ্ন করি, কী ব্যাপার বলুন তো ?

সুধীরবাবু বলেন, এখানে নয়। শনিবার অফিস ছুটির পর একসঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আপনার ভাইপোকে বাড়িতে থাকতে বলবেন। একটি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলও আপনাদের দেখাব। আমার প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্রের একটি বিচিত্র দিনপঞ্জিকা।

শনিবার অফিস ছুটির পর সুধীরবাবুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। হেবোকে বলাই ছিল। সে কলেজ থেকে ম্যাটিনি শো-তে যায় নি। সোজাই বাড়ি চলে এসেছে। হেবোর সঙ্গে পরিচিত হবার পর সুধীরবাবু বললেন, হেবো, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি আজ এসেছি। তুমি যে নরেনবাবুর ভাইপো এ-কথা জানা থাকলে আরও আগে আসতাম। তোমার কিছু কিছু কাণ্ডকারখানা আমি অনেক অনেকদিন আগে শুকতারায় পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছে পারলে তুমিই এর সমাধান করতে পারবে।

—সমস্যাটা কী জাতের ? খুনের কিনারা ?

—না বাবা, হেবো, খুন-জখম নয়। আমি ছা-পোষা মানুষ। তবু ঘটনাচক্রে একটা গুপ্তধনের অধিকার পেয়েছি, অথচ তার চাবিকাঠিখানি পাইনি।

—গুপ্তধন ! কার গুপ্তধন ?—হেবো ঘনিয়ে আসে।

সুধীরচন্দ্র বলেন, আইনত তার মালিক আমি—যদি অবশ্য খুঁজে পাই।

হেবো উৎসাহিত হয়। বলে, সব কথা খুলে বলুন। কোনও তথ্যই অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেবেন না।

সুধীরচন্দ্র যে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত করলেন, তা এই :

সুধীরচন্দ্র মধ্যভারতের এক বর্ধিষ্ণু জমিদার বংশের শেষ বংশধর। তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বিচিত্র ঘটনাচক্রে এক গুপ্তধন আবিষ্কার করে বসেন। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন ইংরেজ সৈন্যদলের একজন সুবেদার। মধ্যপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইংরেজ সৈন্য তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করে। সে যুদ্ধে রাজা নিহত হন। বস্তুতঃ নির্বংশ হন। ইংরেজ সৈন্য বহু আয়াসেও কিন্তু রাজার অতুল সম্পত্তির হদিস পায় না। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন একজন দুর্লভ প্রতিভার মানুষ। যেমন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল তার কূটবুদ্ধি। তিনি ঐ পরাজিত রাজার প্রাসাদে তাঁর একটি দিন-পঞ্জিকা আবিষ্কার করেন, এবং সেই সূত্রে রাজার অতুল সম্পত্তির সন্ধান পান। ক্রমে দুর্লভচন্দ্র নিজেই হয়ে পড়েন বিরাট জমিদার। এলাহাবাদ শহরের মাইল খানেক দূরে যমুনার ধারে প্রকাণ্ড একটি প্রসাদ বানান। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হলেও দুর্লভচন্দ্রের পারিবারিক জীবনটা সুখের হয় নি। প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই স্ত্রী মারা যান এবং সেই প্রথম সন্তানও মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মারা যায়। দুর্লভচন্দ্র তাঁর একমাত্র পৌত্র সুবলচন্দ্রকে নাবালক বয়সেই বিলাতে পাঠিয়ে দেন। সুবল বিলাতেই লেখাপড়া শেখেন। দাদুর মৃত্যুর টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তিনি যুবা পুরুষ। শোনা যায় দুর্লভচন্দ্রও তাঁর বিষয়সম্পত্তি ব্যাঙ্কে রেখে মারা যান নি। সুবলচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখেন ব্যাঙ্কে কোনও টাকা-কড়ি নেই। তিনিও নাকি ঐ দুর্লভচন্দ্রের একটি দিনপঞ্জিকা থেকে সন্ধান পান বৃদ্ধ কোথায় টাকাকড়ি পুঁতে রেখে গেছেন। কী-ভাবে তিনি এ গুপ্তধনের সন্ধান পান তা জানা যায় না। এই সুবলচন্দ্রও ছিলেন পণ্ডিতব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন আমাদের সুধীরবাবুর পিতামহ। মজা হচ্ছে এই, সুবলচন্দ্র যখন মারা যান তখন সুধীরবাবুর বাবাও ছিলেন বিদেশে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখেন এবারও ব্যাঙ্কের পাশবইতে সম্পত্তি আছে নিতান্ত সামান্য। সুবলচন্দ্রও নিশ্চয় কোথাও তার সোনা-দানা-হীরা-জহরৎ পুঁতে রেখে গেছেন—কিন্তু কেউ তার হদিস পায় নি। দু-পুরুষ ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে—কিন্তু কোনও সূত্র পাওয়া যায় নি। গুপ্তধন তো দূরের কথা, এবার সুবলচন্দ্রের কোনও দিনপঞ্জিকাই উদ্ধার করা যায় নি। বাড়িটা প্রায় একশ বিঘা জমির চৌহদ্দিতে। সাবেক আমলের ফুলের বাগান, ফলের বাগান, পুকুর, মন্দির নিয়ে প্রকাণ্ড এলাকা। আন্দাজে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে দু-পুরুষ ধরে; কিন্তু গুপ্তধনের কোন সন্ধান মেলে নি। সারা চৌহদ্দিটাই কোপানো হয়েছে। মোহর পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে শুধু আলু।

—আলু! মানে?—অবাক হয়ে হেবো প্রশ্ন করে।

সুধীরবাবু বলেন, মাটিটা যখন কোপানোই হত তখন আর সেটা ফেলে রেখে দিয়ে কী লাভ ? আলুর চাষ করা হত বছর-বছর ! এতদিনে বাড়িঘর সব ভেঙে গেছে। সবটাই জঙ্গল হয়ে গেছে। তবু জমিটা আমরা দু-পুরুষ ধরে বিক্রি করতে পারি নি। বেচলে আজও ভাল দাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলে গুপ্তধনও যে বেহাত হয়ে যাবে।

হেবো বললে, সুবলচন্দ্রের কোনও দিনপঞ্জিকা, বা কাগজপত্র পাওয়া যায় নি ?

—কাগজপত্র প্রচুর আছে। দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র—কিন্তু দিনপঞ্জিকা বা ডায়েরী বলতে যা বোঝায় তা নেই। বাবার বিশ্বাস ছিল, এবং আমারও তাই ধারণা—কোন নির্দেশ রাখলে দাদু নিশ্চয়ই তা একটি স্বহস্ত লিখিত দিনপঞ্জিকাতেই রাখতেন। সেটাই আমাদের বংশের ঐতিহ্য। রাজা সাহেবের সম্পত্তির হদিস দুর্লভ-চন্দ্র পেয়েছিলেন তাঁর দিনপঞ্জিকায়। ফলে—

বাধা দিয়ে হেবো বললে, সুবলচন্দ্রের হস্তাক্ষর আপনি চিনতে পারবেন ?

—নিশ্চয়।

হেবো বলে, এ রোগের চিকিৎসা দূর থেকে করা অসম্ভব। সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে। আপনার দাদু নিশ্চয়ই একটি ডায়েরি রেখে গেছেন, সেটা আপনারা খুঁজে পান নি।

সুধীরবাবুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললেন, ঘর-দোরের যা অবস্থা তাতে এতদিন পরে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

হেবো বললে, আচ্ছা রাজা-সাহেবের কিংবা দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা আপনি দেখেছেন ?

—রাজা-সাহেবেরটা দেখিনি, তবে দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাটা আমার কাছে এখানেই আছে। তোমাকে এনে দেখাব। তার শেষ দিকে একটা ধাঁধা আছে, যেটার সমাধান করে সুবলচন্দ্র গুপ্তধনের উদ্ধার করেন। অবশ্য কেমন করে তা করেন, তা আজও আমি জানি না। আমার কাছে সেটা আজও ধাঁধার পর্যায়ে।

—বেশ, সেটাই আমাকে এনে দেখান। চোর-ডাকাত কিছু কিছু ধরেছি, কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধারের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। একমাত্র সেই রবীন্দ্রনাথের 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা' ছাড়া। দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা এনে দিন। আগে দেখি সে ধাঁধাটার সমাধান করতে পারি কি না।

সুধীরবাবু বললেন, বলছ, এনে দেব ; কিন্তু সেটা তো পণ্ডশ্রম। আসলে তোমাকে যেতে হবে আমাদের দেশে। সরেজমিনে তদন্ত করতে। পুজোর ছুটিতে।

হেবো বললে, না, পণ্ডশ্রম নয়। দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধাটার সমাধান করে একটু হাত পাকিয়ে নিই প্রথমে।

পরদিন সুধীরবাবু দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাটি পেঁৗছে দিয়ে গেলেন।

হাতেতৈরি কাগজে, মানে হ্যান্ড-মেড-পেপারে পুঁথির আকারে বইটি লেখা। দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স শতখানেক বছর। পাতাগুলো বাঁধানো নয়। পুঁথির পৃষ্ঠার মতো সযত্নে সাজানো। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই ; কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথায় প্রথমেই দুর্লভচন্দ্র তারিখটা বসিয়েছেন। ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা সাজানোতে কোন অসুবিধা নেই। কালো কালিতে গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে খাগের কলমে লেখা।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। হেবো সকাল থেকে সেই পুঁথি নিয়ে পড়েছে, নাওয়া খাওয়া ভুলে। দিনপঞ্জিকার শুরু হয়েছে ৩. ৮. ১৮৫২ থেকে ; আর শেষ হয়েছে ৫. ৬. ১৮৬২-এ। শেষ তিনখানি পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্র বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি কী-ভাবে রাজা-সাহেবের লুকানো গুপ্তধন উদ্ধার করেন এবং কী-ভাবে নিজেও তা লুকিয়ে রেখে যান। তোমরা যাতে হেবোর মতো এ সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পার, তাই সেই দিনপঞ্জিকার শেষ তিনখানি পৃষ্ঠা এখানে হুবহু নকল করে দিলাম :

বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন, ১৮৬২

অতঃপর একদা দুর্গের পতন হইল। পরীখা অতিক্রম করতঃ ইংরাজসৈন্য পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাজা সবংশে নিহত হইলেন। মেজর ম্যাকফার্লং তৎপরে দুর্গাধীপের পদ গ্রহণ করতঃ আদেশজারী করিলেন সিপাহীগণ দুর্গের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ, প্রতিটি প্রত্যন্তদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুক। আদেশ পালিত হইল। পরন্তু রাজার অতুল ঐশ্বর্যের—হীরা-মুক্তা রত্নরাজির সন্ধান কেহই পাইল না। সর্ব্বশেষে দুর্গাধীপ বৃথা অন্বেষণে কাল-ক্ষেপে বিরত হইলেন। পরন্তু আমার হৃদয় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় অশান্তই রহিয়া গেল। আমি সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে থাকি—ইহা কী প্রকারে সম্ভব ? এত অল্প সময়ে রাজা কেমন করিয়া ঐ রত্নরাজি লুক্কাইত করিলেন ? ঐ সময়ে রাজা-সাহেবের নিপঞ্জিকাটির প্রতি নজর পড়িল। তাহা সর্ব্বচক্ষুর সম্মুখেই পড়িয়া ছিল। আমার সন্দেহ হইল, হয়তো রাজা-সাহেব ঐ দিনলিপিতে এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। আমি সেটি যত্নসহকারে পাঠ করিতে থাকি। দিনপঞ্জিকার সর্ব্বত্র সহজ ও সরল ভাষা ; শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদটুকু সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য।

উক্ত শেষ পৃষ্ঠার প্রথমে রাজা-সাহেব তাঁহার ইষ্টদেবী ৺বিমলার প্রতি একটি প্রার্থণাবাণীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তৎপরেও কিছুটা বুঝা যায় ; কিন্তু শেষ অংশ সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। রাজা-সাহেবের দিন পঞ্জিকার ঐ অংশটি আমি হুবহু নকল করিয়া দিতেছি ॥

৺বিমলাদেব্যৈঃ নমঃ
নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা বিমলে প্রদা
তস্যাদর্শন মাত্রেণ বিদ্যাবান জায়তে নরঃ ॥

অদ্য আমার ঘোর দুর্দিন। প্রাতে সভারম্ভে সর্বপ্রথম সভাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ পাঠের প্রস্তাব করিলেন। প্রথম শ্লোকটি সবেমাত্র পাঠ করিয়াছেন—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ' অমনি ভগ্নদূত আসিয়া সংবাদ দিল সেনাপতি বার্তা পাঠাইয়াছেন—ইংরাজসৈন্য পার্শ্ববর্তীপুরের দুর্গ বিচূর্ণ করিয়া অতঃপর এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ হইল। আত্মরক্ষায় যত্নবান হইলাম। আমি মা ৺বিমলার ভক্ত। মৃত্যুকে ভয় করিনা। পরন্তু স্ত্রীপুত্র-পরিজনদিগের কী ব্যবস্থা করিব? একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী সমভিব্যাহারে তাহা-দিগকে পার্শ্ববর্তী 'বিভাপন' গ্রামে আমার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলাম। ঈশ্বর কৃপা করিলে তাহারা রক্ষা পাইবে। পরন্তু আমার অমূল্য রত্নরাজির কী ব্যবস্থা করিব? তাহাও তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিলাম। কোথায় তাহা রাখিলাম সে কথা জানি শুধু আমি এবং আমার একান্তসহচর লক্ষ্মণদেব, এবং মা ৺বিমলা। পরন্তু অদ্যকার যুদ্ধে আমি এবং লক্ষ্মণদেব দুই জনেই নিহত হইতে পারি। তাই আমার ভবিষ্যদ্বংশীয়ের উদ্দেশ্যে এই সাবধানবাণী লিপিবন্ধ করিয়া যাইতেছি। অবধান কর:

> "শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলের প্রথম সারির প্রথম চারিটি সৈন্যের শিরশ্ছেদ করিবে এবং কবন্ধগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বিপথগামী করিবে। দ্বিতীয় সারির সৈন্যদলের প্রথম চারিটি সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম সৈন্যকে আক্রমণ কর। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকদ্বয়কে সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।"

রাজা-সাহেবের দিনপঞ্জিকার ঐ শেষ উপদেশটি লইয়া আমি নিরন্তর চিন্তামগ্ন থাকিতাম। সৈনিকদের শিরশ্ছেদ করার পর কবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কী-রূপে তাহাদের বিপদগামী করা যায়? তাহা ভিন্ন ঐ সৈন্যদের কাটাকাটি করিয়া কী-ভাবে গুপ্তধনের সন্ধান সম্ভব একথা আমার বোধগম্য হইল না।

শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৯৮২

দীর্ঘদিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে একদিবস বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমার নিকট ঐ গূঢ়-সংকেতের অর্থ প্রতীয়মান হইল। রাজা-সাহেব আদৌ প্রলাপোক্তি করেন নাই। অতি সুকৌশলে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগের হিতার্থে গুপ্ত-ধনের নির্দেশ ঐ সাঙ্কেতিক ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এইভাবে সমাধানে উপস্থিত হইলাম: রাজা-সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য গুপ্তধনের অবস্থান জ্ঞাপন করা। নিঃসন্দেহে তাহা ভাষার মাধ্যমে করিতে হইবে। ভাষার মৌল উপাদান বাক্য এবং বাক্য শব্দ বা অক্ষর-সমষ্টির দ্বারা নির্মিত। সুতরাং রাজা-সাহেব কিছু 'অক্ষর' খুঁজিতেছেন। এদিকে দেখিতেছি তাঁহার নির্দেশ কোনও সৈন্যের শিরশ্ছেদ করিয়া, কবন্ধগুলি ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। শিরশ্ছেদের পর কবন্ধ ত্যাগ করিলে

'মুণ্ড' পড়িয়া থাকে। সম্ভবতঃ তিনি কোনও কোনও পদের প্রথম অক্ষরগুলি গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। এস্থলে প্রথম সারির সৈন্য বলিতে তিনি সর্ব্ব-প্রথমে লিখিত ঐ ৺বিমলাদেবীর প্রসঙ্গে শ্লোকটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহার প্রথম চারিটি সৈনিক—অর্থাৎ প্রথম চারিটি শব্দ হইতেছে 'নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা'। তাহাদের শিরশ্চেদ করতঃ অর্থাৎ প্রথম চারিটি অক্ষর গ্রহণ করিয়া কবন্ধ ত্যাগ করিলে পাই 'ন-প-ভা-বি'। পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ এই চারিটি অক্ষরকে বিপথ-গামী করিতে হইলে, অর্থাৎ বিপরীত দিক হইতে পাঠ করিতে হইবে। উল্টা করিয়া সাজাইলে পাইতেছি—'বিভাপন'। সেটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম—রাজা-সাহেবের শ্বশুরালয়। বুঝিলাম, গুপ্তধন ঐ গ্রামেই সংরক্ষিত। কিন্তু গ্রামের কোথায়? কোন্ প্রান্তে। পুনরায় দেখিতেছি রাজা-সাহেব বলিয়াছেন দ্বিতীয় সারির সৈন্যদল, অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকটির '—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ' প্রথম চারিটি শব্দকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম শব্দটিকে আক্রমণ করিলে পাই—'নগাধিরাজ'। আশ্চর্য্য! ঐ বিভাপন গ্রামে একটি শিবমন্দির বিরাজমান, যাহার বিগ্রহের নাম নগাধিরাজ! কুটচক্র ভেদ করিয়া আমার সর্ব্বাবয়বে রোমাঞ্চ হইল। অতঃপর মেজর ম্যাকফার্লন সাহেবের নিকট দিবসত্রয়ের নিমিত্ত অনুপস্থিতির অগ্রিম আর্জ্জি পেশ করিলাম। বলিলাম, পার্শ্ববর্তী গ্রামে আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি। ছুটি মঞ্জুর হইল। আমি একাকী ঐ বিভাপন গ্রামে উপনীত হইলাম। নগাধিরাজ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দুই দিবস বৃথা অন্বেষণ করিলাম। কোনও সংকেত দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় স্মরণ হইল—রাজা-সাহেবের আরও একটি নির্দ্দেশ ছিল, যাহা এতাবৎকাল আমি গ্রাহ্য করি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈন্যদ্বয়কে সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।' সেই দুইটি শব্দ হইতেছে 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি', অর্থাৎ উত্তর দিকে আছে।' 'বিভাপন'-গ্রামের নির্দ্দেশ পাইয়াছি, "নগাধিরাজ' মন্দিরের নির্দ্দেশ পাইয়াছি, এখন নির্দ্দেশ পাইলাম—'উত্তর দিকে আছে।' আমি নগাধিরাজ মন্দির হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে শুরু করিলাম। লক্ষ্য হইল, সেদিকে গ্রাম্য পথ নাই—বিজন অরণ্য! তাহা হউক। আমি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এক্ষণে দেখিলাম—ঘন পত্রগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রতি মনুষ্যাগমনের চিহ্ন রহিয়াছে। দুই একটি বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া যেন কিছুদিন পূর্ব্বেই কেহ এ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অরণ্যের বিপরীত প্রান্তে কোনও গ্রাম নাই, যমুনার তট। যমুনাতে যাইবার অসংখ্য পায়ে-চলা পথ রহিয়াছে। ফলে অরণ্য-অভ্যন্তরে যে প্রবেশ করিয়াছিল সে ঐ পথেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার অর্থ সে গভীর অরণ্যে কোন কিছু লুক্কায়িত রাখিতে গিয়াছিল। ছিন্ন বৃক্ষশাখার সঙ্কেত চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ

অতিক্রম করিলাম। তৎপরে একটি উন্মুক্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থান অরণ্যের বাহির হইতে কিছুতেই লক্ষ্য হইবে না। দেখিলাম, প্রায় চারিহস্ত পরিমিত বর্গক্ষেত্রে লতাগুল্মাদি পরিষ্কার করা হইয়াছে। সে-স্থলে কে বা কাহারা একটি গর্ত মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়াছে। আমার রোমাঞ্চ হইল। অনুধাবন করিলাম, গন্তব্য-স্থলে উপনীত হইয়াছি। দিবাভাগে খনন করিতে সাহসী হইলাম না। স্থানটি অন্তরে চিহ্নিত করিয়া অরণ্য হইতে নির্গত হইলাম। লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি খনিত্র সংগ্রহ করিয়া নগাধিরাজ-মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। প্রথম প্রহরে শিবাকুলের সঙ্কেত পাইয়া নগাধিরাজ মন্দিরে প্রণামপূর্বক আমি খনিত্রসহ পুনরায় অকুস্থলে পুনরাগমন করিলাম। তিন দণ্ডকাল নিরন্তর কায়িক পরিশ্রমে মনুষ্যদেহ পরিমাণ গর্ত খনন করিতে আমার দেহে শ্রমজল নির্গত হইল। তৎপরে কোনও কঠিন ধাতব পদার্থে আমার খনিত্র প্রতিহত হইল। একটি মঞ্জুষা পাইলাম। তাহা উন্মোচন করিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে রাজা-সাহেবের অতুল ঐশ্বর্যরাশি ঝলমল করিয়া উঠিল। আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম।

আমি এক্ষণে অতুল বৈভবের অধিকারী হইয়াছি। এক্ষণে আমার সমস্যা এই অতুল ঐশ্বর্য সমভি-

শনিবার, ৫ই জুন. ১৯৬২

-ব্যাহারে কি প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব? কী প্রকারে হীরামুক্তা-মাণিক্য মোহর ও তঙ্কায় রূপান্তরিত করিব? যদ্যপি তাহা সঙ্গোপনে করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে শুধু আমি নহি, অস্মদ্‌বংশীর অধঃস্তন সপ্তপুরুষ শতাধিক বৎসরকাল বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। রাজা-সাহেব আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। আমিও চোর-তস্কর হস্তলাঘবাদিগের এবং স্বার্থলোলুপ আত্মীয় পরিজনের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার এ গুপ্তধন একই কৌশলে লুক্কায়িত রাখিব। ঈশ্বর আমাকে একহস্তে অপরিমেয় সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপর হস্তে আমার দুর্ভাগ্যের পশরাও পূর্ণ করিয়াছেন। অলৌকিকভাবে অতুল ঐশ্বর্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারি নাই। প্রথম সন্তান প্রসব করিতেই ধর্মপত্নী লোকান্তরিত হইলেন। একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় নির্মলচন্দ্র এবং তাহার পত্নী অকালে ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আমার একমাত্র স্নেহের পাত্র, একমাত্র বংশধর কল্যাণীয় শ্রীমান সুবোধচন্দ্র আশৈশব বিলাতেই রহিয়াছে। তাহাকেও এই বৃদ্ধের বক্ষপঞ্জরে আবদ্ধ করিবার সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত। আমার সমস্ত জীবনে একটি সত্য প্রণিধান করিয়াছি: বিত্তবানদিগের সন্তানেরা অধিকাংশই বিপথগামী হয়। যে হেতু পৈত্রিক সম্পত্তি স্বোপার্জিত নহে তাই তাহার প্রতি কোনও মমত্ব

জন্মে না। এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে অধিকাংশ বিত্তবানের পরিবারেই তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য 'বাবু-কালচার' জঘন্যরূপে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। এজন্য স্থির করিয়াছি, আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমিও রাজাসাহেবের ন্যায় লুক্কায়িত রাখিয়া যাইব। এই দিনপঞ্জিকাতেই রাখিয়া যাইব বজ্রকূট সমস্যা-সমাকীর্ণ আমার নির্দেশ। আমার দেহান্তে শ্রীমান সুবোধচন্দ্র যদি সেই সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই সে এই ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে। নচেৎ নহে। শ্রীমান সুবোধচন্দ্রের প্রতি আরও নির্দেশ দিতেছি, যদ্যপি যে এই সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়, সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে সেও যেন অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহার পুত্র পৌত্রাদিগের জন্য সমস্যা-সমাকীর্ণ গুপ্তধন রাখিয়া যায়। এ সব সহজলভ্য নয়। প্রতিটি পুরুষেই ইহা স্বোপার্জিত হওয়া চাই। অতঃপর শ্রীমান সুবোধচন্দ্র অবধান কর :

সপ্ত-কূপ গবাক্ষের বিপরীতমুখী বেদব্যাসের পরিমাণ
= দশ আলোকবর্ষ।

ধ্রুব-নক্ষত্র তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করিতে হইবে। ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান 'অবস্থানের' জ্যোতির্ময় আদিবিন্দুতে।

তুলাদণ্ড : এক আলোকবর্ষ = একমিমি।

ধ্রুবসত্য লাভে সপ্তঋষির দূরত্ব :

ক্রতু = ৪৯ আলোকবর্ষ
পুলহ = ৭৯ ,,
অত্রি = ৫২ ঐ
অঙ্গিরা = ৬৭ ঐ
পুলস্ত্য = ৮০ ঐ
বশিষ্ঠ্য = ৭৮ ঐ
মরীচি = ১০৮ ঐ

তদুপরি অবধান কর : ক্রতু-অত্রি = ৪৪ আলোকবর্ষ
ক্রতু-পুলস্ত্য = ৪৬ ঐ
অঙ্গিরা-বশিষ্ঠ্য = ২০ ঐ
বশিষ্ঠ-মরীচি = ৩০ ঐ

কূটচক্র ভেদের কুঞ্চিকা :

বৎস সুবোধচন্দ্র! এ-কথা ভুলিও না যে, বজ্র-শলাকাবিদ্ধ ঐ ধ্রুবনক্ষত্রের চতুপার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন। সেই চক্রাবর্তন-দৃশ্যেই সপ্তর্ষির আশীর্বাদে তুমি এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে।"

* * *

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল।
গ্রহাচার্য আমার জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া দিলেন।
তখন নানান প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানিতে পারিলাম যে
আমার শনির দশা চলিতেছে। রাহু আমার পঞ্চমস্থানে
আছেন। বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শত ডিগ্রীর
অবস্থানের জন্যই আমার এখন দুঃসময় চলিতেছে।
গ্রহাচার্য তখন আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া
বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির
সংক্রমণের পরে অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আবার
আমার সুদিন আসিবে।

বুঝিলাম তখন নতুন করিয়া সব
রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বুঝিলাম
আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ আমরা খুড়ো-ভাইপো ঐ সমস্যাটা নিয়ে পড়ে রইলাম হেবোর মেজদা,—সে এখন চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টান্সি পড়ে,—সেও এগিয়ে এল আমাদের সাহায্য করতে। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের ঐ দুর্লভ ধাঁধাটির সমাধান করা গেল না। দিন সাতেক ধস্তাধস্তি করার পরে, আবার একদিন সুধীরবাবু এসে হাজির। বললেন, কি স্থির হল? আপনারা কি এলাহাবাদ যাবেন? বন্দোবস্ত করব?

হেবো কিছু বলার আগেই তার মেজদা বলে ওঠে, সেটা তো করতেই হবে। এখনও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে। চলুন সবাই মিলে ঘুরে আসি।

হেবো বললে, কিন্তু তার আগে দুর্লভচন্দ্রের সমস্যাটার সমাধান করতে হবে যে—

মেজদা বললে, কেন ? দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধা সলভ করলে কোন চতুর্বর্গলাভ হবে ? ও ধাঁধা তো একশ বছরের পুরানো। আর আমরা না পারলেও ওটা যে সুধীরবাবুর ঠাকুর্দা সলভ করেছিলেন সে খবর তো জানাই গেছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওঁর ঠাকুর্দা যে সমস্যা রেখে গেছেন··· কিন্তু, তাঁর কোন দিনলিপিই খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সুধীরবাবুর সেই এলাহাবাদের বাড়িতে গিয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজা। সবার আগে উদ্ধার করতে হবে ওঁর ঠাকুর্দার কোন ডায়েরি আছে কি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ঠাকুর্দা কবে মারা যান ? তখন আপনারা কোথায় ?

সুধীরবাবু বললেন, দাদু মারা যান ১৯৬৪ সালে। তখন আমি পুনা কলেজে পড়ি। বাবা তখন পুনাতে পোস্টেড। দাদুর অসুখের খবর পেয়ে বাবা আর আমি যখন সেখানে গিয়ে পেঁছিলাম তার আগেই দাদু মারা গেছেন। তারপর বাবা এবং আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু দাদুর কোন ডায়েরি বা দিনপঞ্জিকা উদ্ধার করতে পারিনি।

হেবো বললে, আপনার বাবা বেঁচে আছেন ?

—না। তিনিও দেহ রেখেছেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। সুতরাং ঐ সম্পত্তিটা এখন আমার। ভালো অফার পেয়েছি—বেচে দিলে এই দুর্দিনের বাজারে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারি, কিন্তু—

বাধা দিয়ে হেবোর মেজদা বললে, খবর্দার অমন ভুল করবেন না। আপনার ঠাকুর্দার ডায়রি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে—

সুধীরবাবু বলেন, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি ? আমরা চারজনই যাচ্ছি তো।

আমি হেবোর দিকে ফিরে বলি, কি রে হেবো ? তাই তো ঠিক হল ?

হেবো তখনও সেই পুঁথিটার মধ্যে কি যেন দেখছিল। বললে, না ছোটকাকু এখন নয়। আগে এই দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধাটা সলভ করি।

হেবোর মেজদা খিঁচিয়ে ওঠে—ঐ তোর বড় দোষ হেবো ! শুনছিস এটা দুর্লভচন্দ্রের ডায়েরি। এ ধাঁধা সলভ করে আমাদের কি পাখা গজাবে ?

হেবো সে-কথার জবাব না দিয়ে সুধীরবাবুকেই প্রশ্ন করে, আপনি কোনদিন আপনার দাদুর কাছে জানতে চান নি, তিনি কী-ভাবে দুর্লভচন্দ্রের ঐ শেষ ধাঁধা-টার সমাধান করেছিলেন ?

সুধীরবাবু মাথা নেড়ে বলেন, না। এ বিষয়ে দাদুর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয় নি। বাবারও হয় নি। দাদু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তাঁর ছিল ভীষণ মন্ত্রগুপ্তি। বস্তুত দুর্লভচন্দ্রের এই দিনলিপিটি বাবা এবং আমি প্রথম দেখতে পাই দাদু মারা যাবার পর। তাই আমি জানি না,

দাদু কী-ভাবে দুর্লভচন্দ্রের ঐ শেষ ধাঁধাটার সমাধান করে গুপ্তধনের নাগাল পেয়েছিলেন।

হেবো বললে, আপনার দাদুর মৃত্যুর পরেই আপনারা সব কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। অথচ তাঁর কোনও দিনপঞ্জিকা খুঁজে পান নি। সুতরাং এতদিন পরে গিয়ে নতুন করে খুঁজে লাভ হবে না—

মেজদা বললে, অন্তত আমরা এখানে-ওখানে খুঁড়ে তো দেখতে পারি?

হেবো বললে, কী বলছ মেজদা? বাড়িটার চৌহদ্দি একশ বিঘার উপর! গুপ্তধন যদি ওখানে থাকে তবে তা আছে অন্তত দু-মিটার মাটির গভীরে। আন্দাজে কী তা খুঁড়ে বার করা সম্ভব?

—তবু চেষ্টা করে দেখলে কি কিছু পাওয়া যাবে না?

হেবো বললে, যাবে। আলু! গুপ্তধন নয়!

মেজদা চটে উঠে বলল, তাহলে তুই কি করতে চাস? এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়বি?

হেবো হেসে বললে, এক্‌জ্যাক্টলি! এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়ব আর দুর্লভ-চন্দ্রের সমস্যাটার সমাধান বার করবার চেষ্টা করব! এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কর্মপন্থা আমি নির্ধারণ করতে অপারগ!

অগত্যা সুধীরবাবু প্রায় নিরাশ হয়েই ফিরে গেলেন।

কদিন পরে হেবো আমার কাছে এসে বললে, ছোটকাকু আকাশে এখন সপ্তর্ষি আছে? চিনিয়ে দিতে পারেন?

বললাম, এখন তো সন্ধ্যাবেলাতেই উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিকে দেখতে পাওয়ার কথা। চল দেখা যাক।

আমরা দুজনে ছাদে উঠে গেলাম। হেবোকে চিনিয়ে দিলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। বললাম, সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রথম দুটি নক্ষত্র হচ্ছে ক্রতু আর পুলহ—প্রায় একই সরল রেখায় আছে ধ্রুব নক্ষত্র। পুলহের নিচেই পুলস্ত্য—রাবণের বাবা!

—রাবণের বাবা! মানে?

—ঐ পুলস্ত্য ঋষির স্ত্রী হলেন রাক্ষসী নিকষা। তাঁদেরই সন্তান—রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। পুলস্ত্যের পর অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ্য আর মরীচি। সবটা মিলিয়ে অনেকটা যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

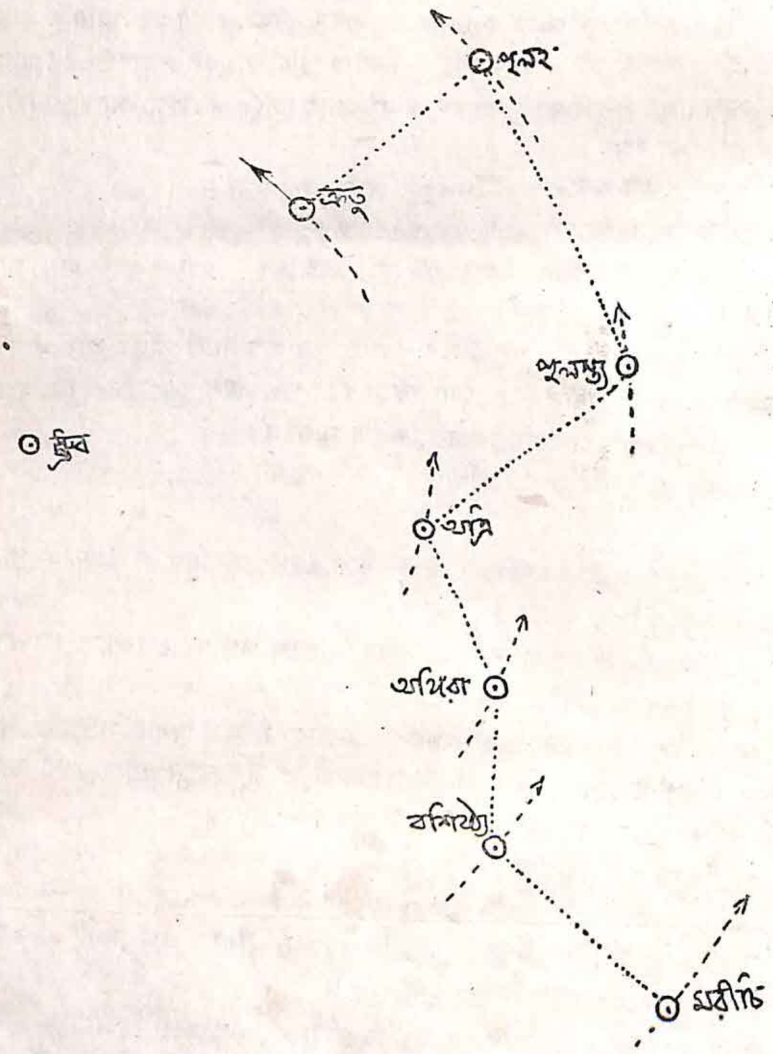
হেবো অন্যমনস্কের মতো বললে, হ্যাঁ জিজ্ঞাসার চিহ্ন! অনন্ত জিজ্ঞাসা।

আমি ওকে আরও বললাম, এই গোটা সপ্তর্ষি-মণ্ডল,—শুধু তাই বা কেন সমস্ত আকাশটাই ধ্রুব-নক্ষত্রকে পরিক্রমা করছে।

—জানি। সে-কথা দুর্লভচন্দ্রই বলেছেন—'এ-কথা ভুলিও না যে, বজ্রশলাকা-

বিন্ধ ঐ ধ্রুব-নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।' কিন্তু বজ্রশলাকা বিন্ধ কেন ?

আমি পাগলটাকে সামলাবার জন্য বলি, হেবো, তুই কেন খামকা ঐ ধাঁধাটা নিয়ে সময় নষ্ট করছিস্ বলতো ? সেদিন তোর মেজদা তো, ঠিক কথাই বলেছিল।



আমাদের প্রথম কাজ সুবোধচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা উদ্ধার করা। দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় ?

হেবো হাসল। বলল, তাইলে তোমাকে খুলেই বলি ছোটকাকু। সুবোধচন্দ্রের

দিনপঞ্জিকা খুঁজবার কোনও দরকার নেই। সেটা খুঁজে পাওয়া গেছে।

আমি চমকে উঠি। বলি, সে কি রে, কই সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার আজও তো দেখা হয়েছে। কই, তেমন কথা তো তিনি কিছু বললেন না।

—সুধীরবাবু জানেন না। সেটা আমার কাছেই আছে।

আমি বজ্রাহত হয়ে যাই। ধাঁধা কষতে কষতে ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

হেবো বললে, চল, নিচে যাই। তোমায় দেখাচ্ছি।

আবার নিচে নেমে এলাম আমরা। হেবো সেই দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা বার করে বললে, এটা তো তুমি খুঁটিয়ে দেখেছ ছোটকাকু। বল তো, কোনও অসঙ্গতি তোমার নজরে পড়েছে?

আমি বলি, পড়েছে। একটা মারাত্মক ভুল আছে। একটা সংখ্যায়। দুর্লভচন্দ্র এক জায়গায় 'আট' লিখতে 'নয়' লিখেছেন। ফলে সালটা একশ' বছর ভুল হয়ে গেছে!

হেবো বললে, কারেক্ট! শেষ তারিখটা '৫ই জুন ১৮৬২' লিখতে গিয়ে ভুলে লেখা হয়েছে '৫ই জুন, ১৯৬২'। তাই নয়।

—হ্যাঁ। ওটা প্রথম দিনই নজরে পড়েছিল আমার। 'অবভিয়াস্' ভুল বলে তখন কিছু বলিনি।

হেবো বললে, ঐটাই হচ্ছে প্রধান 'ক্লু'! ওখানে ভুল লেখা হয় নি কিছু।

—মানে? '১৯৬২' সালটা ভুল নয়?

—না, নয়। ভুল লেখা হয়নি। ওটা ১৯৬২-ই হবে।

আমি ধমকে উঠি, কী পাগলের মতো বকছিস্ হেবো? দুর্লভচন্দ্র তো মারা গেছেন একশ বছর আগে! তিনি কেমন করে—

—না! তিনি নয়! ঐ সালটা লিখেছেন সুধীরবাবুর ঠাকুর্দা। বস্তুত, শেষ পৃষ্ঠার ধাঁধাটাই হচ্ছে আমাদের গুপ্তধন লাভের চাবি! শেষ পৃষ্ঠাটা সুধীরবাবুর ঠাকুর্দার লেখা।

আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করি—আমি মানতে রাজী নই হেবো। ভুলে দুর্লভচন্দ্র 'আট'-এর বদলে 'নয়' লিখেছেন বলে—

বাধা দিয়ে হেবো বললে, না ছোটকাকু! আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত!

আমি আবার ধমক দিয়ে উঠি, ঐ এক বুলি শিখেছিস্! দেখছিস না—কাগজ এক, হাতের লেখা এক, কালি এক, ভাষা এক, এমন কি পূর্বপৃষ্ঠা থেকে পারম্পর্যটুকু পর্যন্ত বজায় আছে। আগের পৃষ্ঠার শেষ লাইনটা হচ্ছে "এই অতুল ঐশ্বর্য সম্ভি"—আর পরের পৃষ্ঠায়—"ব্যাহারে কি প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব?"

হেবো বললে, ঐ একটি লাইনেই আর কোন অসঙ্গতি নজরে পড়ছে না আপনার ?

—কী অসঙ্গতি ?

আগের পৃষ্ঠায় বানান রয়েছে "ঐশ্বর্য্য" আর পরের পৃষ্ঠায় "প্রত্যাবর্তন" ?

—তাতে কী ?

—ভেবে দেখুন, ছোটকাকু ! লক্ষ্য করে দেখুন—প্রথম দুটি পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ ৩রা এবং ৪ঠা জুন বানান রয়েছে—'সূর্য্যাস্ত, পূর্ব্বেই, সর্ব্বত্র, পার্শ্ববর্ত্তী, গর্ত্ত, পার্শ্বর্তীপুর, নির্দ্দেশ, আশ্চর্য্য, প্রত্যাবর্ত্তন ঐশ্বর্য্য' অথচ শেষ পৃষ্ঠায়—'প্রত্যাবর্তন, ঐশ্বর্য, নির্দেশ, জ্যোতির্ময়, চক্রাবর্তন, আশীর্বাদ' ! দেখেছেন ? অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠায় 'রেফ'-এর পর দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে। আপনি তো জানেন, ছোটকাকু এই রেফ-এর পর দ্বিত্ব-বর্জন করার নীতিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই শতাব্দিতে চালু করেছে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমের কোনও পাণ্ডুলিপিতে এসব বানান পাওয়া সম্ভব ? তাহলে শেষ পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্রের মতো পণ্ডিত এতবার বানান ভুল করলেন কেমন করে ? অথবা তিনি কেমন করে জানলেন পরবর্তী শতাব্দীতে এ বানান চালু হবে ?

আমি অবাক হয়ে যাই ওর বিশ্লেষণী শক্তিতে। সত্যিই তো। প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় রেফের পর একটিমাত্র ক্ষেত্রেও দ্বিত্ব বর্জন করা হয় নি ; আর শেষ পৃষ্ঠায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে !

হেবো বললে, সুধীরবাবুর ঠাকুর্দা বুদ্ধিটা করেছিলেন ভালই। একই কাগজ যোগার করে, একই হাতের লেখা নকল করে পুঁথিতে নিজের লেখা পাতাটা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে, সহজে ধরাই যায় না এটা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু দু-দুটি স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। ১৯৬২ সালটা স্পষ্ট করে লিখেছেন—তিনি জানতেন, সাধারণ লোক হয় এটা খেয়াল করবে না; অথবা মনে করবে সংখ্যাটা ভুলে 'আট' লিখতে 'নয়' লেখা। কিন্তু রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এটা তাঁরই লেখা।

মনে হল, হয়তো ঠিকই বলছে হেবো। ঐ পুঁথির শেষ পৃষ্ঠাটা দুর্লভচন্দ্রের নয়, তাঁর নাতি সুবোধচন্দ্রের লেখা। তা যদি হয়, তাহলে ঐ শেষ পৃষ্ঠাতেই সুবোধচন্দ্র ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন ১৯৬২ সালে তিনি কোথায় গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম হেবোকে—তা এই ধাঁধাটার কিছু বুঝতে পেরেছিস ?

—ঐ "কূপগবাক্ষের বিপরীতমুখী বেদব্যাসের পরিমাণ—দশ আলোকবর্ষ" কথাগুলোর মানে বুঝিনি। কিন্তু তার পরবর্তী নির্দেশটা বোঝা যায় "তুলাদণ্ড ঃ এক আলোকবর্ষ—একমিমি"।

অবাক কান্ড ! হেবো ওর মানে বুঝতে পেরেছে ! জিজ্ঞাসা করি, কী ওর মানে ?

—সমস্যা সমাধান করতে করতে আমরা একটা ম্যাপ পাব। সুবোধচন্দ্র এখানে বলছেন সেই ম্যাপের স্কেলটা। "তুলাদন্ড" ইংরাজী করলে হয় 'Scale'। একমিমি মানে হচ্ছে 'এক মিলিমিটার'। যে ম্যাপটা পাব তার স্কেল হচ্ছে এক আলোকবর্ষ—এক মিলিমিটার !

আমি বলি, আলোকবর্ষ কী জানিস তো ? আলোক তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার যায়। ঐ গতিতে সে এক বছরে যে দূরত্ব যেতে পারে তাকেই বলে আলোকবর্ষ।

হেবো বললে, তা জানি। সেসব তথ্য এখানে কাজে লাগবে না। এখানে যে দূরত্বগুলি বলা হয়েছে সেগুলি সোজা মিলিমিটারে প্রকাশ না করে উনি প্যাঁচ কষে প্রকাশ করেছেন আলোকবর্ষে ; আর বলেছেন প্রতিটি আলোকবর্ষ—এক মিলিমিটার। অর্থাৎ যে ম্যাপটা পাব তাতে ধ্রুব নক্ষত্র থেকে ক্রতুর দূরত্ব ৪৯ মিলিমিটার। পুলহের দূরত্ব ৭৯ মিলিমিটার ইত্যাদি। কিন্তু ম্যাপটা কোথায় পাই ?

আবার দুজনে ভাবতে থাকি। শেষে হেবো বলে, আপনি নিজের মত করে ভাবুন, আমি আমার ঘরে গিয়ে ভাবি। ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বক্স নিয়ে ভাবতে হবে। মনে হচ্ছে জ্যামিতির মাধ্যমে সমাধানে পেঁছানো যাবে। সুবোধচন্দ্র যেভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেখি সেভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে নিছক জ্যামিতির অঙ্ক হিসাবে আঁকা যায় কিনা।

আমি তো হেবোর মতো পাগল নই। তাই নিজের নথিপত্র নিয়ে লিখতে বসি।

একটু পরে হেবো ফিরে এসে বললে, ছোটকাকু অনেকটা হয়েছে। এই দেখুন কুটচক্রের ভেদসূত্রের কুঞ্চিকা দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আঁকা গেছে।

কৌতূহলী হয়ে বলি, কেমন করে ?

—এই দেখুন। আপনি বলেছেন—ধ্রুব, ক্রতু আর পুলহ একই সরলরেখায় অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে ধ্রুব থেকে ক্রতু আর পুলহের দূরত্ব ৪৯ মিমি আর ৭৯ মিমি। ফলে, তিনটি নক্ষত্রকে পাওয়া গেল। এবার ধ্রুব আর ক্রতুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ৫২ মিমি আর ৪৪ মিমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে তাদের ছেদ-বিন্দুতে পেলাম 'অত্রি'কে। তারপর অত্রি আর ক্রতুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ৩৪ এবং ৪৬ মিমি ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে পাওয়া যাচ্ছে পুলস্ত্যকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সাত ঋষি আর ধ্রুব নক্ষত্রকে স্কেলে আঁকা যায়।

স্বীকার করতেই হল—তা যায়। কিন্তু তাতে কী হল ?

হেবো বললে, হল এইটুকুই যে, আমরা একটা ধাপ অতিক্রম করলাম। এবার বেদব্যাসের কূপগবাক্ষটাকে খুঁজে পেলেই—

অন্যমনস্কের মতো আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে হেবো নিজের ঘরে চলে গেল। আমি আবার খাতাপত্র টেনে নিয়ে লিখতে বসি। কিন্তু কিছুতেই কিছু লিখতে পারলাম না। ঘুরে ফিরে ঐ ধাঁধাটাই মাথার ভিতর পাক খেতে থাকে। হেবো কি সত্যই এক ধাপ অতিক্রম করেছে? কেমন করে? গুপ্তধন লুকানো আছে এলাহাবাদ শহরের আট মাইল দূরে একটা ভাঙা বাড়িতে। একশ বিঘা যার চৌহদ্দী। আর সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে আকাশে। সুতরাং···

এইসব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।



এবার বেদব্যাসের কূপগবাক্ষটাকে খুঁজে পেলেই

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো। ব্যাপার কি? দরজা খুলেই দেখি—শ্রীমান হেবো।

—কী চাই? —আমি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করি।

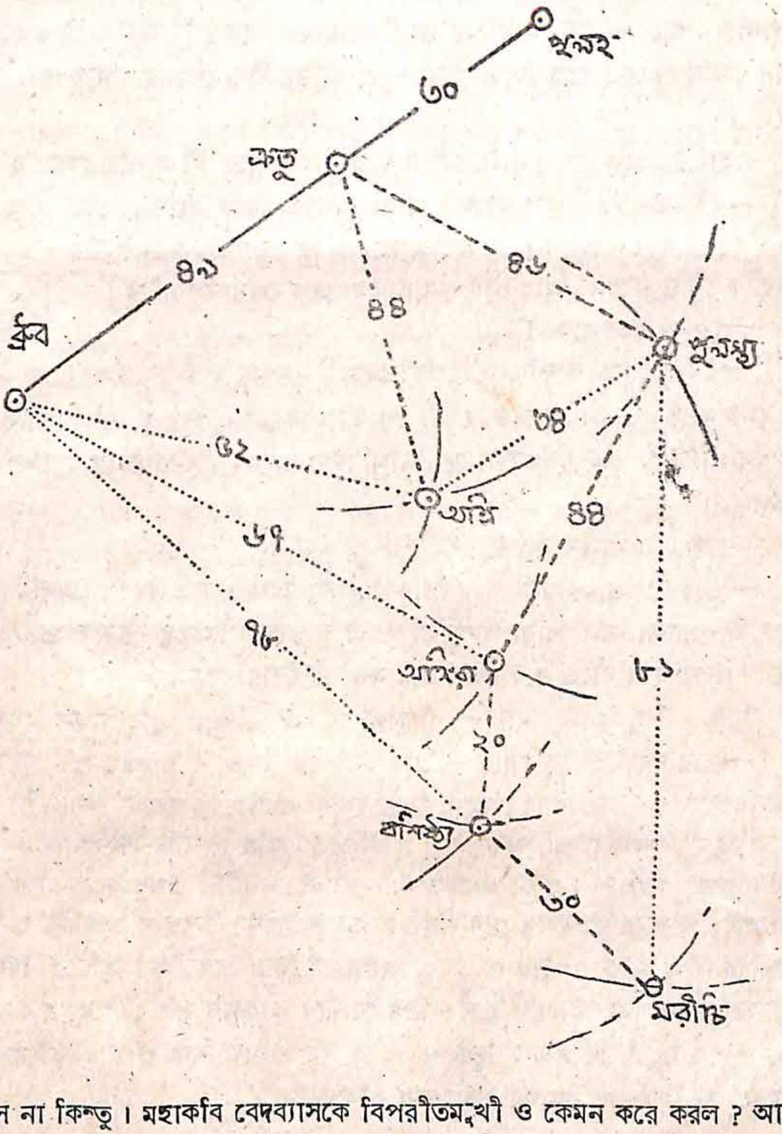
—বেদব্যাসকে বিপরীতমুখী করা গেছে, ছোটকাকু।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, ফের যদি মাঝরাতে এমন 'বেদব্যাস বেদব্যাস' কর, তাহলে তোমার বাবাকে বলে দেব কিন্তু।

হেবো ম্লান হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, ও আপনি ঘুমাচ্ছিলেন বুঝি!

—তুমি কি ভাবলে! রাত দুটোর সময় আমি দাঁত মাজছিলাম?

হেবো কেঁচো! কোন রকমে পালিয়ে বাঁচে। আমি আবার শুয়ে পড়ি। ঘুম



আসে না কিন্তু। মহাকবি বেদব্যাসকে বিপরীতমুখী ও কেমন করে করল? আহা! বেচারাকে অমন ধমক না দিলেই ভাল হতো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই হেবোর ঘরে গেলাম। হতভাগা অঘোরে পড়ে

পড়ে ঘুমাচ্ছে। বিছানায় ছড়ানো রয়েছে স্কেল, কম্পাস, খাতা পেনসিল। মায়া হল, কী জানি—কত রাত পর্যন্ত জেগেছে বেচারা।

বেলা নটা নাগাদ হেবো উঠল। বললাম, কি রে? কাল রাতে বকেছি বলে রাগ করেছিস নাকি?

হেবো একগাল হেসে বললে, না ছোটকাকু। তবে সমাধান করে ফেলেছি। আপনার বন্ধুকে বলুন, আমাদের জন্য এলাহাবাদ যাবার টিকিট কাটতে হবে না। আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারব—ঐ বাড়ির ঠিক কোথায় গুপ্তধনটা পোঁতা আছে।

বাহাদুর ছেলে বটে! বলি, কেমন করে? কালরাত্রে কী জানতে পেরেছিস তুই।

—এই দেখুন! 'কূপ-গবাক্ষ' হচ্ছে কাগজে একটি ফুটো। ধ্রুব বাদে ছয়টা ফুটো করতে হবে কাগজে। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ঐ জ্যামিতিক নক্শায়—ছয় ছয়টা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। আর সেই ফুটোগুলো হবে দশ মিলিমিটার।

—কেমন করে বুঝলি?

—'বেদব্যাসের' শব্দটাকে 'বিপরীতমুখী' করলে পাই 'ব্যাসের বেদ'—অর্থাৎ 'ব্যাসের মাপ'। বলা হয়েছে সেটা দশ আলোকবর্ষ। যেহেতু এক আলোকবর্ষ—এক মিলিমিটার, তাই ফুটগুলো দশ মিলিমিটার বা এক সেণ্টিমিটার ব্যাসের হবে। কেমন তো?

—বেশ, তা না হয় হল তারপর?

—তারপর ধ্রুব-নক্ষত্রকে তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আমার এইফুটো-ওয়ালা কাগজখানা পাণ্ডুলিপির ঐ গুপ্তধন সঙ্কেতের রচনার উপর এমন-ভাবে বসাতে হবে যাতে ধ্রুব নক্ষত্র ধ্রুব নক্ষত্রের উপর পড়ে।

আমি বলি, থাম্ থাম্—পাণ্ডুলিপির ঐ লেখায় ধ্রুব নক্ষত্র কোথায়?

—তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—'ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান 'অবস্থানের' জ্যোতির্ময় আদিবিন্দুতে। লক্ষ্য করে দেখুন, 'শতভিষার অবস্থানের জন্যই' কথাগুলি লিখে ঐ 'অবস্থান' শব্দটির 'অ' অক্ষরটার পুঁটুলিতে একটি জ্যোতি-চিহ্ন আছে। ঐটাই ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান। ফুটো-ওয়ালা কাগজটা ঐ লেখাটির উপর এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে উপরের কাগজের ধ্রুব নক্ষত্র নিচের কাগজের 'অবস্থান' শব্দটির অ-বিন্দুর পুঁটুলির উপর পড়ে। তারপর একটা আলপিন দিয়ে ধ্রুব নক্ষত্র দুটিকে বিদ্ধ করে উপরের কাগজখানা ঘোরাতে হবে—ঠিক যেভাবে আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুব নক্ষত্রকে বেষ্টন করে, কারণ নির্দেশ: 'ভুলিও না যে, বজ্র শলাকাবিদ্ধ ঔ ধ্রুব-নক্ষত্রের চতু-স্পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।'

আমি বলি, বুঝলাম। ধর তাই করলাম, তাতেই বা কেমন করে বুঝব—গুপ্তধন কোথায় আছে।

—আপনি করেই দেখুন না ছোটকাকু। খুব ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকুন—আর লক্ষ্য করে দেখুন—ফুটোর মধ্যে দিয়ে কী দেখা যাচ্ছে।

ওর নির্দেশমতো ধ্রুব নক্ষত্রকে বজ্রশলাকা-বিদ্ধ করে আমি উপরের কাগজখানা ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকি। আশ্চর্য! হেবো যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। কলকাতায় বসেই নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া গেল—সুবোধচন্দ্রের ঐ একশ বিঘা জমির ঠিক কোথায় লুকানো আছে সেই গুপ্তধন।

বিশ্বাস না হয় তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পার। নেহাত যদি জ্যামিতি জানা না থাকে তবে দাদা-দিদি মামা-মামী কাউকে পাকড়াও কর। তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নাও। তাঁর সাহায্য নিয়ে একটা কাগজে প্রথমে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে এঁকে ফেল। তার পর কোদাল নয়, কাঁচি দিয়ে ছয়-ছয়টা কূপ খুঁড়তে হবে। অর্থাৎ ছয়টা ফুটো করতে হবে—ফুটোগুলির কেন্দ্র ধ্রুব বাদে ঐ সপ্তর্ষি-ঋষির অবস্থান, ব্যাস এক সেণ্টিমিটার। এবার সুবোধচন্দ্রের ঐ লেখার উপর তোমার ছবিটা বসাও—এমন ভাবে, যাতে তোমার আঁকা ধ্রুব-নক্ষত্র ঐ 'অবস্থান' শব্দের 'অ' অক্ষরের পুঁটুলির উপর পড়ে। একটা আলপিন দিয়ে দুই ধ্রুব-নক্ষত্রকে বিদ্ধ কর। তারপর ধীরে ধীরে উপরের কাগজখানা ধ্রুব-নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘোরাতে থাক। কী গুপ্তধনের সন্ধান পেলে? নেহাত না পেলে শেষ পৃষ্ঠার ছবিখানা দেখে নাও! কিন্তু না! আগেভাগেই ঐ সমাধানটা তোমরা দেখ না! গোয়েন্দা গল্প তো অনেকক্ষণ হল, এবার একটু জ্যামিতির খেলাই হোক না! তাছাড়া নিজে নিজে সমাধান করতে পারার একটা আলাদা আনন্দ আছে। যতক্ষণ না পারছ—কিছুতেই সমাধানটা দেখবে না কিন্তু! শার্লক হেবোর দোহাই!

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গ্রহাচার্য আমার জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া দিলেন। তখন নানান প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানিতে পারিলাম যে আমার শনির দশা চলিতেছে। রাহু আমার পঞ্চমস্থানে আছেন। বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শতভিষার অবস্থানের জন্যই আমার এখন দুঃসময় চলিতেছে। গ্রহাচার্য তখন আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির সংক্রমণের পরে অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আবার আমার সুদিন আসিবে।

বুঝিলাম এখন নতুন করিয়া সব রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বুঝিলাম আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

—

ধ্রুব নক্ষত্রে
হবে যাতে উপ
পঁটুলির উপ
উপরের ব
বণ্টন
পা